সূচীপত্র—১৩৬৫-৬৬

অথাতঃ শব্দজিজ্ঞাসা	শ্রীঅনীরচন্দ্র মজুমদার	৮৫
অনুশাসনহীনতা	ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	১০৪
আদর্শ গ্রাম	শ্রীঅমীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৪
আলোচনা		১, ১৭, ৩৩, ৪৯, ৬৫, ৮১, ৯৭, ১১৩, ১২৯, ১৪৫, ১৬১, ১৭৭
ইটালীদেশের শিক্ষাব্যবস্থা	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	৯৩
ইতিহাসের পাঠক্রম নির্ণয়ের সমস্যা	" দিলীপকুমার বিশ্বাস ও তারাপদ চক্রবর্তী	১৩
ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশন	" বিপাশী	১১৯
কদমতলা স্কুল	" যোগেশচন্দ্র বাগল	৭, ২১
খাদ্য ও শিক্ষাসমস্যা	" লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৬৯, ১৭৯
গুরুদক্ষিণা	" বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৫১
ছাত্রদের প্রতি	" হারাধন রক্ষিত	১০৯
জাতিপুঞ্জের কেন্দ্রীয় কার্যালয়	" শেখর ঘোষ	১৫৫
জীবন চর্চায় কাব্যের স্থান	" বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৬৭
টোলের শিক্ষাপদ্ধতি	" নীরদেন্দু সান্যাল	১৩
দীক্ষান্ত ভাষণ		১৮৩
পরিদর্শক ও পরিদর্শন	" গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৮৮
পারিজাত	" হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৪৮
পিছিয়ে পড়া শিশু	" মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০৭
পুরস্কার বিতরণী	" প্রিয়রঞ্জন সেন	৮৩
পুস্তিকা সমালোচনা	" প্রিয়রঞ্জন সেন	১২৮, ১৯২
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা	" সুশীলকুমার দাসগুপ্ত	৪২
প্রাণের শিক্ষা	" বকুলবালা সেন	১০৪
প্রকৃত শিক্ষাই প্রাণের কাজ	" হারাধন রক্ষিত	১৬৫
প্রকৃতি পাঠ	" মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	৩১, ৩৭
শিক্ষণশিক্ষার্থীর যোজনাচর্চা	" সুধীরচন্দ্র রায়	৬০
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পায়খানা ও বিদ্যালয়ের ব্যবহার	" লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	৪৩
শিশুর আসন	" নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯
শিশুর শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব	" সুধীরঞ্জন দাস	৪
শিশুশিক্ষার দু'চার কথা	" রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯০
শিক্ষার পরিবর্তন	" গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১৭৬
শিক্ষাসংকট	" যোগেশচন্দ্র বাগল	১৪৭
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ	" হারাধন রক্ষিত	১৩৮
শিক্ষা, কারুশিল্প দর্শন ও সুইডিস্ ব্লয়েড	" লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৩১
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থতার হেতু	" নীরদেন্দু সান্যাল	১১৬
শিক্ষার মাধ্যম	" প্রিয়রঞ্জন সেন	১১৭
শ্রদ্ধাঞ্জলি	" হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৭৩
সেই শিক্ষা		৫৫
সকলন		৪৮
সাহিত্য-কর্মশালা		২৩
সৃজনাত্মক শিক্ষা	" বীরেশ্বর চক্রবর্তী	৭৫
স্মৃতি তর্পন	" রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী	৪০

—ডায়াপেপ্‌সিন্—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

সূচী

আলোচনা ১

শিশুর শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব ৪
[শ্রীসুধীরঞ্জন দাস]

কদমতলা স্কুল ২৭৬
[শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল]

টোলের শিক্ষাপদ্ধতি ১৩
[শ্রীনীহারেন্দু দত্তরায়]

ইতিহাসের পাঠ-ক্রম নির্ণয়ের সমস্যা ১৩
[শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও
শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী]

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিল্পের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

P 30574

UTTA
RIVERS

শিক্ষা

য দ্বি কল্যাণকৃৎকশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

পুনরাগমন

বিগত কার্তিক মাসে 'শিক্ষা' ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সপ্তদশ বর্ষ পর্যন্ত তাহাকে পরিচালন করিতে পারা যাইবে কিনা এই সংশয়ের মধ্যে দিন কাটিতেছিল। এমন সময়ে সমাধানে একটা হইয়া গেল। ষোল বৎসর যে আপনার পথ করিয়া লইয়াছে সে আপনার পথেই চলিতে চায়, বিরাম চায় না। সে থামিতে চায় না তাহাকে জোর করিয়া না থামাইয়া বরং তাহার চলার পথ একটু সুগম করিয়া দেওয়াই দরকার। আমরা তাই আবার শিক্ষার নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা আমাদের পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি।

আহ্বান

আমাদের পত্রিকা একান্তভাবে শিক্ষা বিষয়ের সমস্যার আলোচনার জন্য। স্বাধীন ভারতের সর্বত্র আজ পরিকল্পনার কথা লোকের মুখে, চিন্তাশীলের লেখার মধ্যে, কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শুনা যাইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে দেশের উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি করিবে, লোকের আর্থিক অবস্থা কতটা উন্নত হইবে, এই এই প্রয়োজনগুলির কতখানি সফলতা হইবে এখনই সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধেও অল্প বিস্তর চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে সকল উন্নতির মূলে তাহাকেও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আজকের দিনে দেশে শিক্ষকতা সম্বন্ধে দুটি কথা। আবার বড় বড় পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সর্বাধিসাধক বিদ্যালয় চালু হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের একান্ত অভাব। পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, সেই ব্যবস্থার কোথায় অভাব কোথায় তাহার ব্যর্থতা, কি করিয়া তাহাকে সফলতামণ্ডিত করা যায় সেই সবই আজ ভাবিবার কথা।

চিন্তাশীল লেখকদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে, আগ্রহবান পাঠকপাঠিকার কাছে 'শিক্ষা' আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আপনাদের সকলের লেখার মধ্য দিয়া বর্তমানে ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রের, শিক্ষাব্রতীর ও শিক্ষানুরাগীদের পরিচয় হইবে। "শিক্ষার" প্রকাশ সফলতামণ্ডিত হইবে। পত্রিকাখানি আবার আগের মত তাহার স্বল্প সাধ্যের মধ্যে সমাজের শুভ করিবে এই আকাঙ্খায় আমরা সকলের সহযোগিতা আহ্বান করিতেছি।

আয়তন বনাম মূল্য

শুভকর্মে অনেক বাধা। শিক্ষার পরিচালনায়ও ছোট বড় নানা বাধা দেখা দিয়াছে। সর্বত্র কাগজ দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ছাপাই খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় তিন ফর্মা কাগজ মাসিক ৩৷০ টাকায় বা মাসে ।/০ আনা হারে দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চাঁদার হার বৃদ্ধি করা এই মুহূর্তে সম্ভব কিনা, সমীচীন কিনা ভাবিবার কথা। আমরা অবশেষে স্থির করিয়াছি মূল্য না বাড়াইয়া পত্রিকার কলেবর একটু ক্ষীণ করা হইবে। বর্তমান বর্গ কাগজের আয়তন লঘু করা হইল বলিয়া আমরা আশা করি পাঠকপাঠিকার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

অর্থসাহায্য কমিশন ও কলেজ-ব্যবস্থা

গ্র্যাণ্টস্ কমিশন স্থির করিয়াছেন কলেজগুলির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। অন্যথা পঠন-পাঠনা কখনই আদর্শ অনুযায়ী চলিতে পারে না। অন্য অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছাত্রছাত্রীর চরিত্র গঠনের, ভবিষ্যৎ জীবনের রূপায়নের জন্য একান্ত আবশ্যক তাহা অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা বিশ্বালয়ে বা মহা বিশ্বালয়ে কি করিয়া সম্ভব? শিক্ষক সেখানে তো X Y Z রূপেই থাকিয়া যান। প্রাণ হইতে প্রাণ সৃষ্টি কি করিয়া করিবেন? সময় কোথায়? পরিবেশ কোথায়?

সেদিক হইতে গ্র্যাণ্টস্ কমিশনের এই স্থির নির্দেশ আমরা খুবই সমীচীন মনে করি। সরকারি কলেজগুলিতে কোন অসুবিধার কথাও নাই। তবে বেসরকারি কলেজদের কিছু পরিমাণে কষ্ট হইবার কথা। কিন্তু রাজ্যসরকার সচেষ্ট হইলে সেই অসুবিধাও দূর করা কষ্টকর হইবে না। যদিও এজন্য ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। আর কাগজ দেখিয়া মনে আবার ছাত্র-আন্দোলন প্রভৃতির যে ভয় জাগে তাহা যেন সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করা হয়। ছাত্র-আন্দোলন শিক্ষায়তনের পরিবেশ এমন ঘোলা করিয়া তোলে যে তাহার মধ্যে শিক্ষাদান ও গ্রহণের নির্মল বাতাস কোন প্রকারেই বহিতে পারে না।

বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসব

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতন আশ্রমের আম্রকুঞ্জ মনোরম পরিবেশে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাত পাখীর কলগুঞ্জনের সঙ্গেই দর্শনার্থী নরনারী উৎসব-ক্ষেত্রে সমাগত হয়। সামান্য আয়োজনে রমণীয় করিয়া সাজানো, যাহা নাকি শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য, সভাস্থলটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্নাতক ছাত্র-ছাত্রী পণ্ডিত নেহরুর হাত হইতে ছাত্রিম পাতা গ্রহণ করিল। ডিপ্লোমা ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট অন্যত্র দেওয়া হয়। কবির কল্পনার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকে তাহার প্রাঙ্গণে আহ্বান করিয়াছে—স্নাতকদের নাম তাহার সাক্ষ্য দেয়।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ভাষণে স্নাতকদের ও উপস্থিত সকলকে সেই কথাই মনে করাইয়া দেন। বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আছে, কিন্তু বিশ্বভারতীর একটু স্বাতন্ত্র্য আছে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত ইহা যেন গতানুগতিক পথে না চলে। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ

আছে, কিন্তু ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে যেন সেই সংসর্গের বিনময় ফল না ছড়ায়। বিশ্বভারতীর মাঠের তাহার জীবনের প্রস্তুতির দময়টা, এখানে শিক্ষক তাঁহার শ্রেষ্ঠ জিনিস দান করিবেন, শিষ্য বিনয়ে শ্রদ্ধায় তাহা গ্রহণ করিবে। এই আদানপ্রদানের মধ্যে অহঙ্কার ও বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা ও অবিনয় থাকিবে না। শিক্ষক দরদ ও প্রাণঢালা ভালবাসা লইয়া আসিবেন, ছাত্র আনিবে বিনীত জিজ্ঞাসা, সশ্রদ্ধ বিচার ও অকুণ্ঠ ভক্তি। তবেই না দান ও গ্রহণ সুন্দর হইয়া বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য

বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতের জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থলে নূতন উপাচার্য নির্বাচন করার প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিশ্বভারতীর নিয়মানুযায়ী নির্বাচনের কিছু বিলম্ব আছে। অন্তর্বর্তী কালে কাজ পরিচালনা করিবার জন্য বর্তমান অর্থসচিব শ্রীযুক্ত কিতিশপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়কে নির্বাচিত করা হইয়াছে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় অর্থসচিবের পদে যেমন তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, আশা করা যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ কর্মকুশলতার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়া বিশ্বভারতীর এক বিশেষ ক্ষণে তাহাকে গুরুদেবের আদর্শের পথে পরিচালনা করিয়া লইবেন।

মেয়েদের শিক্ষা

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিগত মে মাসে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, যাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা দুর্গাবাই দেশমুখ, সম্প্রতি তাহার কার্য শেষ হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে আরও অনেক দিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষাকে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পুরুষ ও নারীর শিক্ষার মধ্যে বর্তমান ব্যবধান যত শীঘ্র সম্ভব দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই কমিটি মনে করেন, মেয়েদের শিক্ষা-সমস্যাগুলির বিচার ও সমাধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গড়িয়া তোলা দরকার। এই কাজের জন্য স্বতন্ত্র অর্থসংস্থান থাকিবে এবং শিক্ষাদপ্তরে যুক্ত-সচিব পদের একজন কর্মচারীর উপর ইহার ভার থাকিবে। রাজ্যসরকারগুলিতেও জয়েন্ট ডিরেক্টার পদে একজন মহিলা থাকিবেন যিনি বিশেষভাবে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি দেখা-শোনা করিবেন। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থের অতিরিক্ত আরও দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থসাহায্য কমিশনও যেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাকি সময়টাতে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কমপক্ষে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেন।

বে-সরকারি মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সাহায্য ও সুযোগ দিতে হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এগার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সের মেয়েদের শিক্ষার হার ঐ বয়সের ছেলেদের অন্তত অর্ধেক করিবার জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে আর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে এই ব্যবধান ঘুচিয়া যাওয়া চাই।

শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যালঘুতা, ট্রেনিংএর অভাব প্রভৃতির বিচার প্রসঙ্গে কমিটি দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র শিক্ষকদের তুলনায় শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে শতকরা মোট ১৬.৮, মধ্য শিক্ষার পর্যায়ে ১৭.৭ আর কলেজ পর্যায়ে শতকরা ১৯। বেশি বলার দরকার নাই স্ত্রীশিক্ষার দিকে এখন পর্যন্ত যাহা করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে আজও যে বলিতে হয় কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ তাহা কি আশ্চর্য নয়?

প্রতিবেশী বিহারের কৃতিত্ব

বিহার সরকার স্থির করিয়াছেন যে সাতটি এলাকায়, প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া ব্লক থাকিবে—৬ হইতে এগারো বৎসরের বালকবালিকার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে শিশুদের মধ্যাহ্নের আহারেরও ব্যবস্থা থাকিবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়ে সহায়তা করিবেন। ক্রমে যাহাতে ৬ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক বালিকাদেরও এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে।

শিশুর শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব

নিখিল ভারত ব্রাহ্মসম্মিলনী পাটনা অধিবেশনে

সভাপতির ভাষণ হইতে

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

শিশুটির সুকুমার মনটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পড়ায় তার হৃদয়ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়ে ওঠে বিদ্যার বীজ গ্রহণের জন্যে। মুক্ত আকাশের তলায় তৃণাচ্ছাদিত ধরিত্রীর বুকে প্রকৃতির বিচিত্র শোভার মধ্যে শিশুর জীবন মন যে রকম প্রসারিত হয় সহরের সৌন্দর্যবিহীন ইটকাঠের বাড়ীর অপরিসর সীমার মধ্যে এবং চিত্তবিক্ষেপকারী নিত্য উত্তেজনা-পূর্ণ আবহাওয়ায় কখনো সে রকম হতে পারে না। সুতরাং সম্ভবপর হলে বিদ্যাকেন্দ্রগুলি সহর হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে সত্যিকারের শিক্ষক, যাঁরা কেবল-মাত্র বিদ্যা বিক্রি করেন না, যাঁরা গোপনে ত্যাগ করেন এবং নিভৃতে সাধনা করেন সেই সব সত্য গুরুর নিত্য সান্নিধ্যে যাতে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। ছাত্রসমস্যা সমাধান করার জন্যে বিদ্যাকেন্দ্রগুলি সহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার রাজনীতির দিক থেকে ত প্রয়োজন আছেই—ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার জন্য সেটা আরো বেশী দরকার।

শিশুশিক্ষার আর যে একটি দিকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে চলিত বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্ম-শিক্ষা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত লেখক পরলোকগত ব্রাহ্মের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় রাজা রামমোহনের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতের উল্লেখ করে লিখেছেন—

"গল্প আছে যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরে একজন লোক তাঁহার কাছে আসিয়া গল্প করিতেছিলেন যে, অমুক ব্যক্তি আগে ছিল Poly-theist, তারপর হইল Deist, এখন সে Atheist হইয়াছে। রামমোহন হাসিয়া বলিলেন "ইহার পর বোধ হয় সে beast হইবে।" "ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়া বিদ্যাশিক্ষা (secularisation of education) রামমোহন রায় কখনই কল্যাণকর মনে করিতেন না। অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ধর্ম-শিক্ষাও থাকে, সেজন্য তিনি নিজে যেমন একটি ইস্কুল করিয়াছিলেন তেমনি খৃষ্টান মিশনারী ডফ সাহেবকে একটি ইস্কুল খুলিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। "প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা-পূর্বক বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয় দেখিয়া তিনি

অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন।" যে কোন ধর্মশাস্ত্র হৌক না, ছাত্রেরা ধর্মালোচনা করিতে শিখুক এবং অন্যান্য শিক্ষাকে সেই বড় শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়া জানুক, ইহাই ছিল রামমোহন রায়ের শিক্ষার আদর্শ। বেদান্তের অনুরাগী বলিয়া তিনি প্রাচীন-কালের তপোবনের শিক্ষার মত বিদ্যামন্দিরে অপরা-বিদ্যা ও পরাবিদ্যা এ দুয়েরই চর্চা হয়, ইহাই ইচ্ছা করিতেন। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন সাত্ত্বিকতার শিক্ষা সেইজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সময়ে শিশুরা প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ করতে আরম্ভ করে ঠিক সেই সময়টিতেই যদি ধর্মজীবনের বীজাঙ্কুরটিও শিশুর হৃদয়ক্ষেত্রে গোপনে রোপণ করে দেওয়া হয় এবং তাকে যদি ঈশ্বরপ্রীতি ও শ্রদ্ধাসলিল দিয়ে সিঞ্চিত করা যায় তবে একদিন সে বীজটি যে পল্লবিত হয়ে উঠবেই সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। মনে পড়ে গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরীর কথা। ঘরে এক ঘরে গান হচ্ছে—সেই পূর্বাগত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বৈদ্যুতিক তার বেয়ে যেই সুবযন্ত্রটিতে যা দেয় তখনি তার ধারাল ছুঁচটি তালে মানে লয়ে নেচে নেচে নীচের ঘূর্ণমান মোমের ছাঁচটির উপর আঁচড় কেটে কেটে স্বরলিপি করে রাখে সেই গানটিকে। সেই মোমের ছাঁচ থেকে পাকা রেকর্ড তৈরী করে গ্রামোফোন যন্ত্রে বাজালে সেই মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে তালে, মানে, লয়ে অপূর্ব সঙ্গীতে। শিশুমনটি ওই গ্রামোফোন রেকর্ডের মোমের ছাঁচটির মত। শিশুর মানসপটে নানা ছবি ফুটে উঠছে সারা দিবস-যামিনী ধরে এবং তার অজানিতেই শিশু নানা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করেই চলেছে। তার মনটি নিত্য প্রস্তুত হচ্ছে ভগবানপ্রেরিত বুদ্ধি-বৃত্তিগুলির স্ফুরণের প্রতীক্ষায়। ঠিক এই সময়টিতে শিশুর কোমল নবীন হৃদয়টিতে তার অজানিতে ভগবৎ প্রেমের ছাপ খুবই সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে এঁকে দেওয়া যেতে পারে। একদিন যখন সেই শিশু বড় হয়ে উঠবে তখন তার বুদ্ধিপ্রদীপ্ত জীবনে বাল্য-কালের সেই ক্ষীণ ছাপগুলিও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠবে অভিনব সাজে। যেমন ছাঁচে-ঢালা মুখরুচি গানগুলি, তেমনি করে শিশুর অন্তরের মর্মস্থলে সযত্নোপনে ধৃত ব্রহ্মসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা একদিন জাগ্রত হয়ে উঠবেই ব্রহ্ম-নাম-গানের অপার আনন্দ-হিল্লোলে—একথা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি।

একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝাবার জন্যে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সেটা নেহাৎ অবান্তর হবে না বলে আশা করি। আজ থেকে পঞ্চান্ন কি ছাপান্ন বছর আগে কলকাতার কলকোলা-হল হতে দূরে বোলপুর ষ্টেশন থেকে দু' তিন মাইল ছাড়িয়ে গিয়ে মহর্ষিদেবের সাধনার ক্ষেত্র শান্তি-নিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিয়ম করেছিলেন যে বার বছরের বেশী বয়সের ছেলেদের তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে না, বড় বয়সের ছেলেদের মন গঠিত হয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং তাতে তখন আর কোন ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় না। শিশুদের কোমল মনের উপরে শান্তি-নিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, খোলা মাঠের হাওয়া এবং নির্মল আলোকরেখা, দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের শ্যামল শোভা এবং দৃশ্যমান বহির্জগতের সকল বিচিত্র ছবিগুলি প্রতিফলিত হয়ে উঠে তাদের হৃদয়-গুলিকে প্রস্তুত করবে সত্যিকারের বিদ্যা গ্রহণের জন্যে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের অন্তরক্ষেত্রকে অভিসিঞ্চিত করে দেবে মহর্ষিদেবের ধ্যানদিঠে গড়া ধর্মজীবনের অনাবিল মন্দাকিনীধারা। যা শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে সরস, সুন্দর ও সজীব করে রেখেছে এবং গুরুজীবনের সাধনার মহান আদর্শের আওতায় বেড়ে উঠে শিশুরা জীবনে মাধুর্য ও চরিত্রে বলশালী করবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের প্রতি আমার পিতা আস্থাবান ছিলেন বলেই [illegible] সাল ১৯০৯

সালে আমাকে পাঠিয়ে দেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। মায়ের কোল থেকে এসে পড়লাম আশ্রম-জননীর কোলে বয়স যখন আমার ছিল দশ থেকে এগারর মধ্যে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তখন ছেলে ছিল খুবই কম—পনেরো থেকে কুড়ির বেশী নয়। তখন নীচু বাংলা, দেহলী, কাঁচের মন্দির, পাকা দোতলা বাড়ীটি, ছাতিম তলায় মহর্ষির উপাসনাবেদী, টালির ঘোচালো ছাত্রাবাস, যাকে আজকালে "প্রাক্ কুটীর" বলে, তারই পাশে একতলা ছোট তিন কামরা ওয়ালা একটি বাড়ী যাতে ছিল গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগার এবং গুটিকয়েক খড়ের চালা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন চারিদিকে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর আর রুক্ষিম খোয়াই। ঘর-বাড়ী-দুয়ারে তখন দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল না। ভোরের বেলায় পূর্বদিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যেত রেল লাইনের দুই ধারের উঁচু ঢিবির উপরকার তালগাছগুলির ফাঁকদিয়ে প্রথম সূর্যোদয়ের সোনালি আভা। ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পশ্চিম দিগন্তে অস্তমান সূর্যের রুক্ষিম গোলকের গায়ে গৃহাভিমুখী রাখাল ও তার গরু দুটির চলন্ত কালো ছায়া ছবি। বর্ষার দিনে সুকলের দূর বনানীকে ঝাপসা করে বৃষ্টি চলে আসত যেন হেঁটে হেঁটে ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে বিজেমাটির গন্ধ বহন করে। প্রাক্ কুটীরের সামনের শালবীথিতে ঝড় দোলা দিত হেঁকে হেঁকে এবং যখন অদূরের কোপাই নদীতে বান ডাকত তখন কত কেয়া ফুলের গন্ধ ভেসে আসত বর্ষার জোলো হাওয়ার সঙ্গে মিশে। আষাঢ় ও শ্রাবণের জমাট ঘনঘটা আমাদের নয়ন-পাতে ছুঁয়ে চুঁয়ে বুলিয়ে দিত সজল মেঘের সুনীল অঞ্জন। আকাশে অহরহ ভেসে যেত খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি পালতোলা ভেলার মত। তার সুস্পষ্টছায়া পড়ত তালপুকুরের জলে এবং সেই ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাসিয়ে দিতাম আমাদের ছোট কাগজের নৌকাগুলি আর মনে ভাবতাম—"ঐ মেঘ আর তরণী আমার কে যাবে কাহার আগে।" বসন্তের নবজীবনের সাড়া পাওয়া যেত শুষ্ক বনস্পতির সবুজ কচি পাতায় মর্মরধ্বনিতে ও দিক্-দিগন্তে কত বিচিত্র পাখীর সুমধুর কাকলীতে। শান্তি-নিকেতনের আকাশ এবং বাতাস, আলো এবং জল রোদ ও বৃষ্টি এবং ব্রহ্মচর্যপালন আমাদের দেহকে সতেজ ও স্বাস্থ্যবান করে তুলেছে এবং ঋতু-উৎসবের আনন্দ নিঃশব্দে, আমাদের অজানিতে আমাদের অন্তরকে বিকশিত, উন্মুক্ত ও প্রণত করে বিশ্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছে।

এই রকম পরিবেশের মধ্যে যখন আমরা বেড়ে উঠেছিলাম তখন থেকেই ঈশ্বরপ্রীতির বীজটি আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যাতে পড়ে সে দিকে রবীন্দ্রনাথের নিত্য সজাগ দৃষ্টি ছিল। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই আমাদের শয্যাত্যাগ করে উঠবার নিয়ম ছিল। নিজের বিছানাটি গুটিয়ে রাখতে হতো এবং সেই সঙ্গেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হতো—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
জড়েন্দ্রিয় বিদ্যে। তদন্তরস্থৈব
হিতায় লোকস্য, তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে।"

(তত্ত্বকৌমুদী ১৬ই পৌষ হইতে গৃহীত)

— — —

কদমতলা স্কুল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় হইতে পঞ্চম এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রথম মহাসমরের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। যুদ্ধের এক সঙ্কটকালে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য ও রসদের প্রচুর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের স্কুলেও সরকারি আড়কাটি আসিয়াছিলেন। ছাত্র ও সাধারণ লোক জমায়েতের ব্যবস্থা হইল। আমরা ছোট, তথাপি উপস্থিত হইলাম। সৈন্যদলে তখন কেহ নাম লিখিয়াছিল কি না মনে নাই। চতুর্থ শ্রেণীতে থাকিতেই ১৯১৮ সনের ১১ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা হইত। প্রতি বৎসর এই সময়ে এক মিনিটের নিমিত্ত আমাদের মূক হইয়া থাকিতে হইত। যুদ্ধবিরতি উপলক্ষ্যে ছাত্র ও শিক্ষকদের লইয়া স্কুলগৃহে একটি সভা হইল। নিবারণ বাবু বেশ বক্তৃতা দিতে পারিতেন, প্রফুল্ল বাবু সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। প্রফুল্লবাবু বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলিলেন, যুদ্ধবিরতি এখন নিত্য হইতেই আমাদের মনে সোয়াস্তি আনিয়া দিয়াছে। এক রাক্ষসের বদলে অন্য রাক্ষস আসিলে তাহার ক্ষুধা যে শতগুণে বাড়িয়া যাইত না, কে জানে? এই রকম গরম গরম কথাবার্তা আমাদের স্কুলে [illegible] হইত। অষ্টম শ্রেণীর প্রধান স্মরণীয় ঘটনা পূর্ণিয়া (১৯১৯ ইং) পূর্বের ঝড়। '২৬ সালের ঝড় বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছে। [illegible] বৎসর পূর্বে '১৬ সালেও ঐ রূপ সময়ে ঝড় ও [illegible] হইয়াছিল। উহাকে লোকে '১৬ সালের বন্যা বলিয়া আখ্যা দিত। পূর্ব বন্যার সময় আমি শিশু ছিলাম, তবু কিছু কিছু মনে আছে। কিন্তু এই ঝড়ের সঙ্গে বুঝি তাহার তুলনাই হয় না। পূজার পূর্বে সেকেণ্ড টার্মিনাল পরীক্ষা, তখন সাপ্তাহিক পরীক্ষা বাদে ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পরীক্ষা দুইটি হইত। আমাদের সেদিন ছিল ড্রয়িংয়ের পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হয় হইয়া গিয়াছে, সম্মুখের প্রাঙ্গণে ড্রিল পরীক্ষা হইবে। এমন সময়, বোধ হয় বিকাল সাড়ে তিনটা, বাতাসের ডাক শুনিতে পাইলাম। সে কি ডাক! অমন বাতাসের ডাক জীবনে আর কখনও শুনি নাই। গম্ভীর আওয়াজ, শোঁ শোঁ শব্দ। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সুরু হইল। চারটে নাগাদ ইহার তীব্রতা বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এই বাতাবৃষ্টি সমানে চলিল। ইহার পর পবনদেব খানিকটা প্রশমিত হইলেন। রাত এগারোটা নাগাদ বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেবার সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে তিনজন ছাত্র বর্ষাকালে একসঙ্গে ছিলাম। তখন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তিনি শক্তিমান মানুষ, হাওয়ার প্রকোপে চাটাইয়ের বেড়া খুলিয়া যাইতেছে, আমরা প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার সঙ্গে ইহা ধরিয়া আছি—এই ভাবে বাতাসে মানুষে রাত্রিবেলা চলিল তিন চার ঘণ্টা—পরে আমরা ছেলেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ঐ ভীষণ বাত্যার মধ্যেও আমরা প্রফুল্ল বাবুর নির্দেশে বিছুড়ি রাঁধিলাম। কিন্তু তৃপ্তির সঙ্গেই না খাওয়া হইল। পরদিন সকালে কিন্তু দেখি, মস্ত ডাল প্রায় আর্ধেকটা দো-কে-সেই রহিয়া গিয়াছে। [illegible] দিকটা ডালের উপর দিয়া

এই হাত্যা চলিয়া যায়—মানুষ পশু, ওয়ারেণ্ট গাছপালা বিস্তর বিনষ্ট হইয়াছিল এই '১৬ সালের ঝড়ে। পরবর্তী জীবনে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাতাসের এমন ভীষণ ডাক আর শুনি নাই।

বাৎসরিক পরীক্ষা হইল, নবম শ্রেণীতে উঠিলাম। এইবার বড়দিনের ছুটিতে পায়ে হাঁটিয়া বরিশাল যাই। বরিশাল আমাদের পল্লী হইতে ত্রিশ মাইলের পথ। সেখানে আমার জানাশুনা কেহই ছিল না। অজানার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার স্পৃহা আমার প্রকৃতিগত। রাত্রিটি মাঝপথে কাটাইয়া সকালে বরিশালে পৌঁছিলাম। প্রায় একটানাই ত্রিশ মাইল হাঁটা। কিন্তু ক্লান্তিবোধ করিলাম না। দুই দিন বরিশালে ছিলাম। অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাদের আদর্শ। তখন তাঁহার ভক্তিযোগ পাঠ করিয়া প্রত্যেহিত জীবনকে কতকটা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে প্রয়াস পাইতেছি। তাঁহার স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তৎকালীন আমাদের শিক্ষকগণের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কতই না উচ্চ ধারণা হইয়াছে আমার মনে। তিনি বরিশালে নাই জানিয়া মন বড়ই খারাপ হইল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজীবন ব্রহ্মচারী, সাধুপ্রকৃতি জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে গেলাম তাঁহার আশ্রমে। সন্ধ্যাবেলা। তিনি আমার পরিচয় জানিয়া আমাকে যেন একান্ত আপনার করিয়া লইলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটি কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। অন্যত্র তাহা লিখিয়াছি বোধ হয়। এই কথাটি আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, সর্বদা মনে রাখিও—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। অন্য পথে বাড়ী ফিরিলাম। সে পথও ত্রিশ মাইলের কম হইবে না। চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের দ্বারা খনিত বিখ্যাত সুবিস্তৃত দুর্গাসাগর দীঘি দেখিলাম। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ লোপ পাইয়াছে, রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়িল না। আশেপাশে বনজঙ্গল জমা চোখে পড়িল। ফিরিবার পথে দুই রাত্রি দুই গ্রামে পরিচিত লোকের বাড়ীতে কাটাইয়াছিলাম। হাঁটা পথে দেশপরিক্রমার কি আনন্দ তাহার প্রথম অনুভূতি হইল এই সময়ে। বাড়ী ফিরিবার পর দিনই স্কুল খুলিয়া গেল।

এই কয় বৎসরে নিজ জীবনে অভিজ্ঞতাও হইয়াছে প্রচুর।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের দৈনন্দিন কর্মতালিকানুযায়ী আমিও একটি তালিকা প্রস্তুত করি এবং তদনুযায়ী কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হই। কিছুদিন ডায়েরিও লিখিয়াছিলাম। ডায়েরি লেখা অভ্যাসটা চালু থাকিলে এই পঞ্চাশ বৎসরের কত বিষয়ই না নূতন করিয়া আজ জানিয়া লইতে পারিতাম। বন্ধুবর শরৎচন্দ্র ফরিদপুরের বৈদ্যপ্রধান জগদ্বন্ধুর শিষ্য। এই সাধকসম্বন্ধে বইপত্র তাঁহার নিকট পাইতাম। জগদ্বন্ধুর শিষ্যপ্রধান রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত "ব্রহ্মচর্য" পুস্তকখানির একখণ্ড আমি শরৎচন্দ্রের নিকট পাইলাম। ইহাতে কিশোরদের জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ ছিল। এক সময় প্রথম রাত্রে ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া পড়িবার অভ্যাস করিতে প্রয়াসী হইলাম। সোদরের এই পুস্তকে প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে। শেষ রাত্রি, সব নিস্তব্ধ, পড়ায় বেশ মন বসিত। কিন্তু সাময়িক বা পারিবারিক পরিবেশ ইহার অনুকূল না হওয়ায় এই অভ্যাস বর্ধিত হয় নাই। তবে ইহার উপকারিতা আই-এ টেষ্ট পরীক্ষার সময় বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। "মা-বাবা" আরেকবার বাসন্তায় আসিলেন, সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে আবার গেলাম। এইবারে কি প্রথম বারে মনে নাই. হাসবিহারী আমাকে এই সাধক দম্পতির নিকট হইতে মন্ত্র নিতে বলিয়াছিল। তাঁহাদের তিনটি নিয়ম মাত্র মা-গ্রহণবিধি, যথা, মশুর ডাল, ডিম এবং মাংস। বরিশালের মানুষ আমি। সব ছাড়িতে পারিব, কিন্তু ঐ মশুর ডালটি বাদে। এইজন্য আমার মন্ত্র লওয়া হইল না।

তখনি সাধ্যমত মতরিডাল খাইয়াই চলিয়াছি। বরিশালে দুই দিন মাত্র ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ পূর্বপরিচিত জিতেনবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি একটি সর্তে রাত্রিতে আমার স্নান করিয়া দিলেন—রাত্রি দশটার পর তাঁহার নিকট যাইব এবং পাঁচটা বাজিবার পূর্বে সেখান হইতে বিদায় লইব। ইহার মধ্যে আজও ভেদ করিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, রাজনৈতিক বিপ্লবী ও গুপ্তচরের নিরিখ সহরের প্রত্যেক গৃহস্থের ব্যবহার এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নদীমাতার দেশে যেমন সাঁতার কাটিতে শেখা অবশ্য কর্তব্য তেমনি নৌকা চালনা করিতে জানা একান্ত আবশ্যক। নৌকা চালনা না জানায় বরিশাল হইতে ফিরিবার পথে বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমি নদীর যেই পারে সেই পারে নৌকা বাঁধা; দুপুর বেলা, দ্বিতীয় মানুষ নাই! অপর পার হইতে একজন নৌকা বাহিয়া লইয়া যাইবার জন্য হাঁক দিলেন, তাঁহার হাঁকডাকে উত্যক্ত হইয়া নৌকায় উঠিয়া উহা ছাড়িয়া দিলাম। অপর পারে পৌঁছিতে যে কি বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। কোনমতে অপর পারে পৌঁছিলে ভদ্রলোক আমাকে সমঝাইয়া দিলেন যেন আমি নৌকা চালাইতে শিখিয়া তবে একাকী পথে বাহির হই।

এইরূপ ছোটোখাটো অথচ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে নবম শ্রেণীতে যথারীতি পাঠ আরম্ভ করিলাম। আমাদের সময় অনেকটি বিষয় ছিল compulsory বা আবশ্যিক, আর কয়েকটি additional বা অতিরিক্ত। অতিরিক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দুইটি প্রত্যেককে নিতে হইত। এই স্কুলে অতিরিক্ত বিষয় পড়ানো হইত তিনটি। গণিত, সংস্কৃত ও ইতিহাস। ভূগোল অতিরিক্ত বিষয় ছিল না, কাজেই প্রত্যেককেই অষ্টম শ্রেণীতে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকেও বিদায় দিতে হইল। ইতিহাসে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও, অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণিতই লইলাম। সংস্কৃত আমাদের প্রিয় বিষয়। পূর্ব পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া যাওয়ায় অষ্টম শ্রেণীতে পাঠকালেই নূতন পণ্ডিতমহাশয় আসিলেন পণ্ডিত রাসবিহারী কাব্যতীর্থ। তিনি বহু বৎসর কদমতলা স্কুলে কাজ করিয়া পরে অত্র স্কুলে হেড পণ্ডিত হইয়া যান। তিনি ইংরেজি জানিতেন না, এজন্য পাঠনায় কতকটা বিঘ্ন ঘটিত। কারণ তখন পরীক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। কিন্তু যে তিন বৎসর তাঁহার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছি, মেদিয়াছি তিনি প্রাণ ঢালিয়া সংস্কৃত পড়াইতেন।

তাঁহার ঐকান্তিকতা উক্ত অভাব অনেকাংশে বিদূরিত করিত। তিনি আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হয়ত ইহার একটি পারিবারিক কারণ ছিল। তাঁহারা ছিলেন আমাদের কুল-পুরোহিত। শ্রাদ্ধ বা বিশেষ পালপার্বণে তাঁহারা পৌরোহিত্য করিতেন। এসব কাজ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা করিতেন না। অতিরিক্ত সংস্কৃত বিষয় একজন ইংরেজি-জানা শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। গণিতের শিক্ষক ছিলেন প্রফুল্লবাবু। পূর্বেই বলিয়াছি গণিত এবং ইংরেজি উভয় বিষয়েই তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার নিকট দুই বৎসর গণিত অধ্যয়ন করিয়া গণিতের প্রতিও আমার বেশ একটা অনুরাগ জন্মিয়াছিল। প্রফুল্লবাবু আমাদিগকে ইংরেজি গ্রামার ও ট্রান্সলেশন পড়াইতেন। নেসফিল্ডের গ্রামার, ইংরেজি ব্যাকরণ, ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ানো অনেকেরই বোধগম্য হইতনা। তবু তিনি ইহাকেও সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। গড়া তৈরি করিয়া না গেলে, এই নবম শ্রেণীতেও ছেলেরা তাঁহার শক্তি হইতে রেহাই পাইত না। ছিরাও এবং তার্বাল নাউনের পার্থক্য অধিকাংশ ছেলেই বুঝিতে পারিত না। Gerundকে verbal noun এবং verbal nounকে gerund বলিয়া ভ্রম করিত। একদিন তিনি

বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোরা আজন্ম খেয়েছিস তিন্তিরী পাতার ঝোল, এখন তেঁতুড় তুলসি কি রসগোল্লার? ইহার একটি গুরুতর ব্যঞ্জনা আছে। আজিকার ছেলেদের এরূপ কথা বলা হইলে বর্ণবট হইত কিনা কে বলিতে পারে?

এইবারে প্রধান শিক্ষক অনন্তবাবুর সংস্পর্শে আসিলাম। তিনি আমাদের ইংরেজি গদ্য পড়াইতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা এবং ইংরেজির কোন পাঠ্য বই ছিল না। তবে ক্লাসে গদ্য পদ্য বাংলা ইংরেজি বই পড়ানো হইত। ভাষা শিক্ষার উপর তখন বেশ জোর দেওয়া হইত। ইংরেজি বিদেশী ভাষা, কাজেই ব্যাকরণ না জানিলে ইহার গঠনকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তাই ইহার পাঠের উপর এত জোর। বাংলা ব্যাকরণের বালাই ছিল না। অনন্তবাবু আমাদিগকে Lamb's Tales from Shakespeare পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ন্যাব ছিলেন বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসের একজন কেরাণী। কিন্তু সাহিত্য চর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সেক্সপীয়রে সাহিত্যে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, এই বইখানিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেক্সপীয়রের এক একটি নাটক লইয়া এক একটি রচনা। গদ্যাংশ লইয়া ইহা রচিত বটে, কিন্তু লেখক মূল বইয়ের ভাব ও ভাষা ইহাতে সংরক্ষণের প্রয়াস করিয়াছেন। সেকালের ইংরেজি কাব্যগুলি লম্বা লম্বা, বিস্তর adjacent বা অধীন বাক্য সম্বলিত। কিন্তু একবার বুঝিয়া লইতে পারিলে বেশ রস পাওয়া যাইত। অনন্তবাবু এই বইখানি আমাদের পড়াইয়াছেন। সেক্সপীয়র সাহিত্যের প্রবেশক রূপে যেমন এই বইখানি, তেমনি তাঁহার পড়ানো আমাদের বিশেষ সহায় হইয়াছে। ঝড়ের মধ্যে মিরাণ্ডার ছবি যেন এখনও দেখিতেছি। অনন্তবাবু অন্যান্য বই বা মাসিক পত্রও মনে হয় কখনও কখনও আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বোষ্টমী গল্পটি প্রথমে সবুজ পত্রে বাহির হয়। তিনি একদিন ক্লাসে আসিয়া সমস্ত গল্প আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার পড়ার গুণে রবীন্দ্রনাথের নিকট বোষ্টমীর আনাগোনা আমরাও যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। কলকাতে একটা মধুর রসের হাওয়া বাহিয়া গেল! (ক্রমশঃ)

টোলের শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীশীরেন্দু সান্যাল

একটানা ছয় বৎসর টোলে পড়িয়াছি। একাদিক্রমে বিয়াল্লিশ বৎসর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছি। এই দুই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। এই পার্থক্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) বাতাবরণসংক্রান্ত পার্থক্য, (২) পরিচালনসংক্রান্ত পার্থক্য ও (৩) শিক্ষাদান প্রণালী সংক্রান্ত পার্থক্য।

(১) বাতাবরণ

টোলে পড়ার জন্য বেতন দিতে হইত না। অতএব অধ্যাপকমহাশয়ের সহিত ছাত্রদের ক্রেতা বিক্রেতার সম্বন্ধ ছিল না। অধ্যাপকমহাশয় ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেন বিদ্যাচর্চার জন্য—জীবিকার্জনের জন্য নহে। জমিদারগণের প্রদত্ত পণ্ডিতবিদায় প্রভৃতি দ্বারা কষ্টেই তাঁহার পরিবার প্রতিপালন হইত। কিন্তু সেজন্য কোন কৈফিৎ ছিল না। বোর্ডের পরীক্ষক হিসাবে কিছু পাইতেন। সময়ে সময়ে যাজকতা করিয়াও কিছু পাইতেন। নিয়মিত যাজকতা করিতেন না।

ছাত্রদেরও কোন অসন্তোষ ছিল না। ধাবী আবাদের জন্ম ফেডারেশন, ধর্মঘট প্রভৃতিও ছিল না। কখনও একান্তে ইষ্টগোষ্ঠীতে বসিয়াও অধ্যাপক মহাশয়ের কোন সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

অধ্যাপক মহাশয় কখনও কোন ছাত্রকে প্রহার করা দূরের কথা—মৌখিক তিরস্কারও করেন নাই। কথার প্রয়োজনও হইত না। কারণ পাছে অধ্যাপকমহাশয় অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে আমরা অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত থাকিতাম।

অধ্যাপকমহাশয় পিতৃস্থানীয় ছিলেন। অগ্রগামী ছাত্রগণকে আমরা দাদা বলিতাম এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অগ্রজের শাসন ও স্নেহ দুইই পাইতাম। টোলের ছাত্রদের মধ্যে তামাক খাওয়ার অবাধ প্রচলন ছিল। উহা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। দাদাদের তামাকও কখনও কখনও সাজিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা তামাক খাইতে শিখান নাই। অবশ্য ইচ্ছা থাকিলে শিখিবার এবং অভ্যস্ত হইবার কোন অসুবিধা ছিল না।

টোলঘরে একখানি বড় সতরঞ্চি পাতা থাকিত। তাহার উপর অধ্যাপকমহাশয়ের জন্ম একখানি কম্বল বা গালিচার আসন থাকিত। আমরা এই সতরঞ্চিতে বসিয়া পাঠ লইতাম। পাঠ লইতে আরম্ভ করার সময়ে এবং পাঠগ্রহণান্তে অধ্যাপক মহাশয়ের পদধূলি লইতে হইত। ভক্তি-ভরেই প্রণাম করা হইত, গতানুগতিকভাবে নহে। অষ্টমী ও চতুর্দশীর দিন টোলে অধ্যয়ন অর্থাৎ ছুটি। পালে পার্বণেও অল্প বয়ে ছুটি থাকিত। কিন্তু স্কুলের গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশের ন্যায় কোন দীর্ঘ অবকাশ থাকিত না।

(২) পরিচালন

টোলে পরিচালন administration বলিয়া কিছু ছিল না। অতএব ঐ কার্যের জন্ম অধ্যাপক মহাশয়ের কোন সময়ের অপচয় হইত না। আমরা ৫০।৬০ জন ছাত্র পড়িতাম। কিন্তু ছাত্রদের নামের তালিকাযুক্ত কোন খাতা বা হাজিরাবহিও ছিল না। হাজিরা বহি না থাকার জন্ম একবার পরিদর্শক মহাশয় আপত্তি করায় একখানি খাতায় কল টানিয়া আমাদের নাম লিখিয়া ৫।৬ দিন আমাদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহার পর সে খাতার খোঁজ কেহ করে নাই। এই খাতা থাকা বা না থাকায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্বচ্ছন্দ গতিতে কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। Discipline বা উহার কোন দেশীয় প্রতিশব্দ আমরা শুনি নাই। টোলের discipline ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অল্পস্বল্প ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে আমাদের মধ্যস্থতায় সব ঠিক হইয়া যাইত। এই সকল অবান্তর কার্য না থাকায় অধ্যাপক মহাশয় উদয়াস্ত এবং কখনও কখনও রাত্রিতেও পড়াইয়া ৫০।৬০ জন ছাত্রের অধ্যাপনা-কার্য সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিতেন।

মাসে মাসে আমাদের পরীক্ষা হইত। উহা মুখের পরীক্ষা, ওঠাউঠির পরীক্ষা নহে। অতএব এই পরীক্ষায় চুরির চেষ্টা থাকিত না। বৎসরান্তে বোর্ডের কেন্দ্রে যাইয়া আদ্য, মধ্য বা উপাধি পরীক্ষা দিতে হইত। এই পরীক্ষায় কিছু কিছু চুরি হইত। সকল ছাত্র সকল বৎসর পরীক্ষা দেওয়ার মত হইয়া উঠিতে পারিত না। অধ্যাপক মহাশয়ের মতামতের দ্বারাই এই যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ণীত হইত, টেষ্ট পরীক্ষাদ্বারা নহে।

(৩) শিক্ষাদান প্রণালী

আমাদের টোলে মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি এবং মীমাংসা এতগুলি বিষয় পড়ান হইত। অধ্যাপক মহাশয় একাই সমস্ত বিষয় পড়াইতেন। প্রত্যেক বিষয়ে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার্থী ছাত্র থাকিত। আবার এক পরীক্ষার্থী সব ছাত্রও একসঙ্গে পড়িত না। আমরা এক এক দলে ৪।৫ জন বা বড়জোর ৭।৮ জন পাঠ লইতে বসিতাম। অনুপস্থিতি বা অন্যকারণে

এই দলের কোন ছাত্র দুই চারিদিন অনুপস্থিত থাকিলে বা বুদ্ধিমান্দ্যবশতঃ অন্য সকলের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইতে না পারিলে দল হইতে বাদ যাইত। সে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌গামী দলে যোগদান করিত। এরূপ দল না থাকিলে তাহাকে পৃথক্‌ভাবে পাঠ দেওয়া হইত। তাহার অনুপস্থিতি-কালে অধ্যাপিত অংশ না পড়িয়াই—অথবা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাহাকে দলের অন্যান্য ছাত্রের সহিত আগাইয়া যাইতে হইত না। অধ্যাপক মহাশয় ভল্টনের নাম অবগত ছিলেন না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপে দলের বা ক্লাসের সংখ্যা খুব বেশী হইত। অতএব আমরা অধ্যাপক মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া পাঠ লওয়ার জন্য খুব অল্প সময়ই পাইতাম।

এই অল্প সময়ের মধ্যে সকলের পক্ষে সকল বিষয় ঠিকমত বুঝিয়া লওয়া হয়ত সম্ভব হইত না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এবং পুরাতন পাঠের পুনরনুশীলনের জন্য আমাদিগকে অগ্রগামী ছাত্রদের অর্থাৎ দাদাদের নিকট যাইতে হইত। এই ব্যবস্থাকে টোলের ভাষায় "পাঠ চাওয়া" বলে। পাঠ চাওয়া ব্যবস্থার ফলে দাদাদের অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা হইত, আমাদেরও যথেষ্ট উপকার হইত। দাদারা কোন বিষয়ের সমাধান করিতে অসমর্থ হইলে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট যাইতেন এবং তাঁহার দ্বারা সমাধান করাইয়া লইতেন।

এই ভাবে উপরাহ্ণ এবং কখনও কখনও রাত্রিতেও অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। টোলের কোন রুটিন ছিল না। আমরা জানিতাম আমরা পূর্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে পাঠ পাইব—এই পর্যন্ত। অধ্যাপক মহাশয়ের পদপ্রান্তে অতি অল্প সময়ের জন্য বসিতে পাইতাম। কিন্তু টোলে অনেক-ক্ষণ, দুই তিন ঘণ্টা থাকিতে হইত। এই সময়খানি পাঠ চাওয়া, নীচের ছাত্রগণকে সাহায্য করা, এবং নূতন নূতন ফাঁকি (apparent incoherence) উদ্ভাবন করিয়া সহপাঠিগণকে বিব্রত করা, পাঠ্য-পুস্তক লইয়া পড়া তৈয়ারি করিয়া লওয়ার কাজে ব্যয়িত হইত।

প্রাথমিক ছাত্রকে অর্থবোধ শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে অনেক দিন ধরিয়া ব্যাকরণ, অমরকোষ প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে বলা হইত। এরূপ আবৃত্তি করিতেও খুব ভাল লাগিত। অর্থবোধ শিক্ষার পরেও প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত ব্যাকরণ বা অন্যান্য গ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াছি। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেন, "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

কখনও কখনও অধ্যাপক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দুই টোলের ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক সভা হইত। বিপক্ষকে বাগ্‌যুদ্ধে হারাইয়া দেওয়ার কোন চেষ্টারই ত্রুটি হইত না। এই জাতীয় বিতর্কসভা অধুনাতন ফুটবল ম্যাচ অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত, কিন্তু বিদ্বেষ, বিরোধ বা মারামারিতে পর্যবসিত হইত না।

টোলের ছাত্রেরা আসিত প্রকৃত বিদ্যার্থীর মনো-ভাব লইয়া। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপক নিজেকে ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত করার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। ছাত্রদের হৃদয়ে থাকিত স্বতঃ-স্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি। অধ্যাপক থাকিতেন অনুরক্ত পিতৃস্নেহের মহিমায় মহীয়ান্। এই মণিকাঞ্চন যোগে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সাফল্যের জন্য অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন হইত না।

———

ইতিহাসের পাঠ-ক্রম নির্ণয়ের সমস্যা (১)*

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী

প্রাচীনকালে স্কুলে ইতিহাস পড়ান যাঁরা সমর্থন করতেন তাঁরা সকলেই হয় লক্ষ্য করেছিলেন নয় ধরে নিয়েছিলেন যে ইতিহাসের দিকে শিশুদের একটা স্বাভাবিক টান আছে। শিশুরা ইতিহাসের গল্প আনন্দের সঙ্গেই শোনে, একথাই তাঁরা বলতেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে Vives বলেছিলেন যে ইতিহাস বহু বিরাট, শক্তিমান এবং শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষের কাহিনীতে পূর্ণ। শিশুদের মধ্যে এমন কে আছে যে তাদের কথা শুনবার জন্যে কান খাড়া করে উৎসুক হয়ে থাকবে না? শিশুদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা ইতিহাসের পরিণাম জানবার জন্যে খাওয়াদাওয়া বা ঘুম ভুলে যাবে। এক পুরুষ আগেও শিক্ষকেরা দেখেছেন যে Sleidan লিখিত (Four Monarchies) চার রাজ-বংশের গল্প শুনতে তারা খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়েছে।

১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Comenius বিশ্বাস করতেন যে এই রকম ঐতিহাসিক গল্প শিশুর কাছে খেলাধুলা বা অভিনয়ের মতই চিত্তাকর্ষক। ১৬৩৪ এর কিছু পরেই ফরাসী দেশের বক্তৃতাবলীতে ইতিহাসের পঠনপাঠন কার্যতঃ চালু ছিল। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে Weise জানতে চেয়েছেন ইতিহাস ছেলেদের পক্ষে কঠিন হবে একথা মনে করবার কি কারণ থাকতে পারে? আট বছরের ছেলের কাছে ইতিহাসকে আকর্ষণীয় করতে তিনি নিজেরই অজান্তে ছাত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠদানের তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রুশো সজ্ঞানে এই তত্ত্বে উপনীত হন এবং আরও অনেকদূর অগ্রসর হন। 'এমিলের' শিক্ষার ধারা এমিলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত তার ইতিহাস শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। এই বয়সেই এমিল মানুষের মনের কথা পাঠ করবার তাগিদে জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার প্রয়োজন অনুভব করে। রুশো তখন স্বীকার করলেন যে শিশু ইতিহাসের কথা শিখতে পারে কিন্তু পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা দ্বারাই তার অর্থ উপলব্ধি হয়। রুশোর এই মতের দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে স্কুলে ইতিহাস পঠনের দ্বারা শিশু শব্দশিক্ষা ছাড়া আর বেশী কিছু লাভ করে না। অধিকাংশ শিশুর কাছেই ইতিহাস শুধু নাম আর সাল তারিখের তালিকা, তার বেশী আর কিছু নয়।

রুশোর এই অভিজ্ঞতা প্রকৃত। শুধু ইতিহাসের কোন অঙ্গ অন্ততঃ এগার বা বার বছর বয়সের শিশুর কাছে বোধগম্য হতে পারে এটা প্রমাণিত হল। জীবনীর মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষার একটা নূতন পথ রুশো দেখালেন। পরবর্তী সংস্কারকেরা ছয় বছরের শিশুর জন্যে এই পথটাই বেছে নিলেন।

স্কুলে ইতিহাসের পাঠদান কালক্রমানুগত 'chronological' ধারাতেই শুরু হয়েছিল। বছরের পর বছর স্কুলে এই ক্রমই চলেও আসছিল। আধুনিক কালের ইতিহাস অপেক্ষা প্রাচীন কালের ইতিহাসকে এই ক্রমে স্থান সহজও ছিল। তাই এই ছিল ইতিহাস পাঠদানের ক্রম বা সোপান। কিন্তু ছাত্রের সমকালীন বা নিকটবর্তী কালীন ইতিহাসকে তার অধ্যয়নকালের শেষাংশের জন্য ফেলে রেখে প্রাচীনকালের ইতিহাস দিয়ে তার পাঠ আরম্ভ করা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে মনে হ'তে লাগল। তাই Comenius এই আপত্তির কতকটা সংশোধন করলেন, ইতিহাস পাঠকে বিষয়ানুযায়ী বা প্রসঙ্গানুযায়ী (topical) সাজিয়ে। কিন্তু তাঁর চেয়ে বেশী সংস্কারকামী Weise মত দিলেন যে ইতিহাস পঠনের সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বর্তমানকালে পাঠ আরম্ভ করে পিছনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। Basedow এবং Alembert পরীক্ষাগত বিশ্বাসের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

Sabman তাঁর বিদ্যালয়ে স্থানীয় সমাজের ইতিহাস দিয়ে ইতিহাসের পাঠ আরম্ভ করলেন। কিন্তু সাধারণ রীতি হিসাবে কালক্রমানুগ ধারাতেই

* Johnson লিখিত The Teaching of History বইয়ের The Problem of Grading History অবলম্বনে রচিত।

ইতিহাসে পাঠদান চলছিল। ইতিহাস পাঠদানের এই সুপ্রাচীন রীতিই সমকেন্দ্রিক বলয় ব্যবস্থায় (concentric circles arrangement) রূপান্তরিত হয়েছে।

Pestalozzi (1746—1827) এবং তাঁর অনুগামী রুশোর প্রেরণায় শিশুর মানসিক শক্তি অনুযায়ী পাঠক্রম নির্ধারণের যে পদ্ধতি প্রচলিত হয় এই সমকেন্দ্রিক বলয় বা বৃত্ত সমূহেরও তাহাই ভিত্তি। ইতিহাস পঠনের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। ছাত্র এর কেন্দ্র; ছাত্রের মানসিক সামর্থ অনুযায়ী সে তার চতুর্দিকে যতখানি সম্ভব দেখবে; প্রাথমিক স্তরে এই দৃষ্টিবলয় বেশী দূর পৌঁছবে না। পরবর্তী স্তরে তার মানসিক বৃদ্ধিহেতু তার দৃষ্টির সীমা আরেও একটু প্রসারিত হবে; সমাপ্তির স্তরে, শিশুর মানসিক বৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হতে, নির্দিষ্ট শিক্ষনীয় ক্ষেত্রের সীমান্ত রেখা অবধি তার দৃষ্টিগোচর হবে।

প্রথম বলয় বা স্তরে পাঠদান জীবনীসংক্রান্ত আখ্যায়িকার আকার গ্রহণ করবে, আখ্যায়িকাগুলি হবে কতক প্রকৃত কতক কল্পনামূলক; একটির সঙ্গে অপরটির ধারাবাহিকতা রাখবার প্রচেষ্টা হবে কম। দ্বিতীয় স্তরে বা বৃত্তে পূর্ব-পঠিত আখ্যায়িকার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঘটনার সংযোগে একটি অবিচ্ছিন্ন কাহিনী গড়ে উঠবে। শেষ স্তরে পুরাতন ও নূতন ঘটনাসমূহ একত্র মাত্র একটি কাহিনীর ঊর্ধে কার্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত একটি প্রকৃত ধারাবাহিকতা লাভ করবে। সাধারণ শিশুদের জন্য এমনি দুটি বা তিনটি বলয়; অপর শিশুদের জন্য তিনটি।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জার্মানিতে এই সমকেন্দ্রিক বলয়পদ্ধতির পূর্ণ প্রচলন হয়। জার্মান বিদ্যালয়সমূহে ইহা এরূপ কার্যকরী হয় যে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে এটি একটি পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা এই পদ্ধতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণ করে কিন্তু ১৮৬৫ সালে বর্জন করে। তারপর চলতে থাকে বহু পরিবর্তন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে মোটামুটি সমগ্র ইতিহাস মধ্যযুগের উপর বা প্রাচীন যুগের উপর জোর দিয়ে পাঠ সমাপন করা হত। হয়ত কোন কোন অংশ একবারই পঠিত হত। যথাযথ বলতে গেলে এটাকে সমকেন্দ্রিক বলয় পদ্ধতি না বলে শুধু বলয় পদ্ধতিই বলা উচিত এবং ফরাসীরা বলতেও তাই।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—এই দুই পদ্ধতিই অর্থাৎ সমকেন্দ্রিক বলয় বা শুধু বলয় পদ্ধতি সমানার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শিক্ষাদানের একাধিক স্তরে ইতিহাসের কতকাংশের শিক্ষা দানকেই বোঝাত।

শেষোক্ত অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসপঠনের ক্ষেত্রে এই বলয় পদ্ধতি দীর্ঘ দিনই প্রচলিত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমেরিকার ইতিহাস পঠিত হয়, আবার উচ্চ বিদ্যালয়েও পঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের ইতিহাসও পঠিত হয় আবার উচ্চ বিদ্যালয়ে ইউরোপের ইতিহাসও পড়ান হয়। জুনিয়র স্কুল প্রবর্তনের সময় কিছুদিনের জন্য আবার একটি নূতন বলয় প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বলয়পদ্ধতি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও চলে। এই সব বিভিন্ন বলয়ের কয়েকটিই সমকেন্দ্রিক। ১৮৯২-৯৩ সালে, তৎকালে প্রচলিত আটবছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য রচিত পাঠ্যতালিকা অনুসারে আমেরিকার সমগ্র ইতিহাস সাতবার পুনঃপঠিত হবার কথা—ইউরোপীয় অর্থে আমেরিকার ইতিহাসপঠন সাতটি সমকেন্দ্রিক বলয়ে শ্রেণীবদ্ধ।

প্রথম প্রথম এই সমকেন্দ্রিক বলয় রীতি পদ্ধতিকে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমতঃ অত্যন্তরূপ বলয়সমূহও কালক্রমানুগত ধারাতেই সাজাতে হয়। কোন কোন সমালোচক একে মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সুস্পষ্ট পার্থক্যসত্ত্বেও বিভিন্ন স্তরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের সজীবতা বা নূতনত্বকে বিনাশ ক'রে ছাত্রের কাছে তাকে একঘেয়ে করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যহীন পুনরাবৃত্তি,—এই একঘেয়েমির অভিযোগকে প্রবলতর করে তুলেছে। উনবিংশ শতাব্দে এ কথা অতীব সত্য ছিল। কারণ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রকে সেই একই পাঠ্যপুস্তক দ্বিতীয়বার পাঠ করতে হতো—কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ স্তরে এবং উচ্চবিদ্যালয়ে একই পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। অবশ্য ১৮৯৭ সালে উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য আমেরিকার ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক বিশেষভাবে রচিত হয়েছে কিন্তু একথা বলা শক্ত যে, এই একঘেয়েমি দূর হয়েছে। কতকটা পুনরাবৃত্তি অবশ্য সব ক্ষেত্রেই থাকবে।

(ক্রমশ)

১৬শ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী (১৩৬৪-৬৫)

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
আমাদের ছেলেবেলা ও শিক্ষা	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩২, ১২৮, ১৭১
আমার দেখা মাহুদ	„ সুখময় ভট্টাচার্য	৪
আলোচনা		১, ২৪, ৪৯, ৭৩, ৯৭, ১২১, ১৪৫, ১৬৯, ১৯৩, ২১৭, ২৪১, ২৬৪
ইতিহাসের সাথে পৌরশাস্ত্র ও সামাজিক পাঠের সম্পর্ক	„ ইতিহাস রসিক	৪৩
কদমতলা স্কুল	„ যোগেশচন্দ্র বাগল	২৭৬, ২৪২
কামাখ্যাচরণ নাগ	„ „	১৪৭
কুড়ি বৎসর পূর্বে	„ প্রিয়রঞ্জন সেন	৮, ৩০, ৭৪, ১০১
খাতা দেখা	শ্রীমতী বকুলবালা সেন	৬৩
গল্প বলা	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার	১৮১
গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা	„ প্রিয়রঞ্জন সেন	২৮৭
চরখার ঐতিহ্য ও বুনিয়াদী শিক্ষা	„ লক্ষীশ্বর সিংহ	
ছাত্রজীবনের দুরবস্থা	„ কিশোরলাল মশরুওয়ালা	২৫৪, ২৮৫
জলছবি	„ মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	২২
জীবনের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা	„ যোশিকৈ	৬৩
ডিমে পেঁপে খাওয়া	„ মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	২২২
দৃষ্টিহীনে দৃষ্টিদান	„ তরুণ ঘোষাল	৪৫
নক্ষত্রদের বিষয়ে পৌরাণিক কথা	„ সুধীরচন্দ্র মজুমদার	২৫৬
পত্র	„ সুধীরচন্দ্র মজুমদার	২৫১
পল্লী উন্নয়নের কাব্য	„ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	২৮
পুস্তক-পরিচয়		১৬৯, ২১৬
প্রতিবাদ	„ কমলকুমার কর	২৩৭
স্বাস্থ্যতামূলক শিক্ষা	„ গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৯০
বিড়াল শত্রু	„ সুখময় ভট্টাচার্য	২৬১
বিদ্যালয় পরিদর্শন	„ বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত	১০৪, ১৪৬, ২০২, ২৪৯
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ও বিকাশ সূচী	শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা	১৮৪
বিদ্যালয়ের সমাজজীবন	„ „	৮৭
বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা	শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ দে	১২৩
বিদেশী শিশুর প্রশ্নাবলী	শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা	২২৩

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
বুনিয়াদী শিক্ষা	ডা: জাকির হোসেন	২১৭
বুনিয়াদী শিক্ষা ও তৎকালির ঐতিহ্য	শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	৮০
বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজ ব্যবস্থা	,, গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল	২৩০
বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম	,, বিজয় কুমার ভট্টাচার্য	৪২
বৈদিক হইতে বুনিয়াদী	শ্রীমতী নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬
ভাববার কথা	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	২২১
ভারতের শিক্ষার স্বরূপ	ডা: জাকির হোসেন	৩৮
ভাষা সমস্যা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৩৭
রবীন্দ্রনাথের চোখে শিশুমনস্তত্ত্ব	,, ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২২৫
রবীন্দ্রবাণী		১৪৪
লেখকের মন্তব্য	শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত	২৫০
শিক্ষা ও শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীমতী বকুলবালা সেন	১৬৬
শিক্ষক শিক্ষণের নব পরিকল্পনা	ডা: নলিনকুমার মুখোপাধ্যায়	৭৭
শিক্ষা ও সমাজ	শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১৪১
শিক্ষণ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	৯৫, ১১৯, ২২৬
শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন	,, জীবেন্দ্র দে	২১৮
শিক্ষানৈতিক কার্পাস শিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞান	,, লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	২৩৬
শিক্ষানৈতিক শিল্পশিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি		২০৯, ২৭১
শিক্ষানৈতিক হাতশিল্প	,,	১৩৪, ১৬১
শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে দুর্গাপুর	শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত	২৬০
শিক্ষার মাধ্যম		৩
শ্রী অ—"	,, বহিবারঞ্জন ভট্টাচার্য	২৪৫
শ্রীঅরবিন্দ ও নারীর শিক্ষা	শ্রীমতী বকুলবালা সেন	২১৩
সমবায় ও সামাজিক পাঠ	শ্রীইতোরিয়া	১৪৩
সহজে শিক্ষাদান	শ্রীমতী রত্নময়ী দীক্ষিত	১৫৭
সামরিকী	শ্রীমতী বকুলবালা সেন	১১১
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১৭৭

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : . পৌষ ১৩৬৩

সূচী

আলোচনা ১৭

কদমতলা স্কুল ২১

[শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল]

সাহিত্য-কর্মশালা ২৬

প্রকৃতি-পাঠ ৩১

[শ্রীবহ্নিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY COLLEGE

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎকল্পিহ্ ছর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৬৫ | ২য় সংখ্যা

আলোচনা

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

নানা প্রকার গোলমালের জন্য বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকর্ম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল। একটি একটি করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ভুক্ত প্রায় কলেজই এখন খোলা হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, ছাত্র ও অভিভাবক উভয় দলেরই নির্বন্ধাতিশয্যে আয়ুর্বেদ বিভাগ ভিন্ন অন্য কলেজগুলি আবার খোলা হইল। আমরা আশা করি, এখন হইতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের সহিত অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ চলিতে থাকিবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী

ভারতবর্ষের মধ্যে বৎসর বৎসর বিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশন হইতেছে। তাহার সুবর্ণ জয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চাশবৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া এই উৎসব হইল। বাঙ্গালোর ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কথাও যেমন বলিয়াছেন, তেমনই আবার তাহার সঙ্কটের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান একাধারে মানবের পার্থিব উন্নতির উৎস এবং ধ্বংসের ভয়াবহ হাতিয়ার। বিজ্ঞানের এই উভয় সংকটের প্রতি উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ভারতীয় ও বিদেশী সকল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক উন্নতির সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে দ্রুত পার্থিব উন্নতি মানুষের জগতে সাধিত হইতেছে, তাহা যে মানুষের নীতিবোধকে ক্রমেই ক্ষুণ্ণ করিতেছে, তাহা কি অস্বীকার করা চলে? রাষ্ট্রপতি বলেন যে, মানুষের সুখ ও নিরাপত্তাই সকলের কাম্য, যদি বিজ্ঞানের সফলতা এই কাম্য লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই বিপর্যয়ের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিজ্ঞানও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই চেষ্টিত। বিজ্ঞানের সেই উদ্দেশ্য সফল হউক, বিজ্ঞান পরিষদ মহৎ চরিত্রের মানুষ গড়িয়া তুলুক। তবেই জগতের কল্যাণ।

এই পরিষদের অনুষ্ঠানে বিদেশের অনেক

বৈজ্ঞানিক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডিউক অব এডিনবরার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি আসিয়াছিলেন কমনওয়েলথের প্রতিনিধি হিসাবে। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডিউক বলেন, বিজ্ঞান আজ জগতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সত্য। তবে আমরা ইচ্ছা করিলে এই সমস্যার সমাধান করিতে নাও পারি। আমরা যদি সমাধান না করি তবে শান্তির স্থানে অশান্তি, প্রাচুর্যের স্থানে দুর্ভিক্ষ, কল্যাণের বদলে অকল্যাণ আসিবে।

পরিষদের ডিরেক্টার ডাঃ এস্ ভগবন্তম্ ঘোষণা করেন যে, সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে টাটা ট্রাস্ট ৫২,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। টাটা ট্রাস্ট হইতে বর্তমানে ৫০৲ হইতে ৭৫৲ টাকার যে ৩৬টি মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আরও টাকা পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞান পরিষদের চেষ্টা মানুষের কল্যাণসাধনের কর্মে নিয়োজিত হউক।

অধ্যাপক মাইতি

বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক হরিপদ মাইতির সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। অধ্যাপক মাইতি কলিকাতা সায়াল কলেজের এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল সাইকোলজির অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাইকোলজি ডিপার্টমেণ্টের পরিচালক হন। তিনি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া ঐসকল দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা বোধ করিতেছি। তাঁহার শোকতপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীবিঠল চন্দ্রভারকর

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ও শিল্পপতি শ্রীচন্দ্রভারকর অতি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে অভিভাষণ প্রদান উপলক্ষে তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ, উদ্দীপনা-প্রদায়ী অভিভাষণটি সকলের খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ফিরিবার পথে ট্রেণেই তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার কোন ব্যবস্থার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শরীরে ও মানসিক শক্তিতে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও প্রাইভেট সেক্রেটারি ঐ গাড়িতেই তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলেন। এই অতর্কিত দুর্ঘটনায় সকলেই খুব বিচলিত হইয়া পড়েন। আমরাও তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যার জন্য আন্তরিক সমবেদনা বোধ করিতেছি।

স্যর মির্জা ইসমাইল

অল্প কিছুদিন আগে বাঙ্গালোরে নিজের মনোরম বাসভবনে শিক্ষাবিদ্ ও খ্যাতনামা কর্মবীর স্যর মির্জা ইস্‌মাইলের মৃত্যু হইয়াছে! তাঁহার বয়স যদিও যথেষ্ট হইয়াছিল তবু কর্মশক্তি ও সতেজ চিন্তাশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত আমরা অনেকবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া 'শিক্ষায়' প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার চিন্তাধারা ছিল বলিষ্ঠ ও গঠনমূলক। বাঙ্গালোর ও মহীশূরে নানা প্রতিষ্ঠানে, প্রাসাদভবনে, রাজপথে, মন্দিরে মসজিদে তাঁহার নিপুণ কর্মকুশলতা ও উদার পরিকল্পনার পরিচয় ছড়াইয়া আছে। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ মূর্ত হইতে দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সমসাময়িক যুগের এক অধ্যায়ের শেষ হইল।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

'শিক্ষার' বর্তমান সংখ্যায় আমরা একাধিক শিক্ষাবিদ্ মনস্বীর লোকান্তর গমনের সংবাদ

দিতেছি। খুবই দুঃখের কথা। মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু কাহারও মৃত্যুতে শোক ও ক্ষয়ক্ষতি, ব্যক্তিগত বা পরিবারগত না হইয়া ব্যাপক হইয়া পড়ে। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে এইরূপ একটা ক্ষতি হইল বাংলা দেশের তথা ভারতের। ১৯১৩ খ্রি ১৪ সনে যে কয়জন বাঙালী যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গ্র্যাজুয়েট হন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আর শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বা বলি কেন, দেশের সামাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে, বিশেষ করিয়া শিক্ষার কাজে ইঁহাদের দানের কথা সকলেরই বিদিত। মাত্র কয়েক বৎসর হইল ডাঃ সাহা অতি আকস্মিক ভাবে, কাজ করিতে করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবার এই অল্পদিনের ব্যবধানে দেশবাসী ডাঃ ঘোষকে হারাইল। এই ক্ষতি অপূরণীয় বলিলেই হয়।

ডাঃ ঘোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞানমন্দিরে, খড়্গপুর টেকনিকাল কলেজের অধ্যক্ষরূপে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে, ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যরূপে, তিনি দেশের শিক্ষাজগতে নানাভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে এখনও আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসান হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিক বিভাগের নূতন ভবন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, সকল বিভাগেই স্থানাভাব। স্থান সম্প্রসারণের জন্য নানা পরিকল্পনা করা হইতেছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে অর্থনীতি বিভাগকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে নূতন গৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদেশমুখ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনের উদ্বোধন করেন। ইহাতে একটি বিশেষ অভাব পূরণ হইল।

কলিকাতা হইতে বেশ একটু দূরে পড়িয়া যায় বলিয়া অনেকের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ঐখানে আপাতত ষাটজন ছাত্রের থাকিবার মত ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য এগারো কাঠা জমি কিনিয়াছেন। ঐ বিভাগে প্রায় আড়াই শত ছাত্র, সকলের উপযোগী ছাত্রাবাস নির্মাণ বর্তমানে সম্ভব নয়। তবে শ্যামবাজারের মোড় হইতে ঐ পর্যন্ত shuttle service চালাইবার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই বিভাগ শুধু ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি অপেক্ষা অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণার কাজের উন্নতির জন্য এখন অধিক আগ্রহান্বিত। সেই উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক অধ্যাপক ও রীডার নিয়োগের কথা চলিতেছে।

পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

গোরক্ষপুর পল্লীবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ দেন। তাঁহার মতে পল্লীবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবহারিক জ্ঞানকে উচ্চ শিক্ষার মূল শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা। পল্লী অঞ্চলের সমাজজীবনের সহিত নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, এমন জ্ঞানকেই তিনি ব্যবহারিক জ্ঞান বলেন। তাঁহার মতে শিক্ষার আদর্শ, এবং যে সমাজের কল্যাণের জন্য শিক্ষা প্রবর্তন করা হইতেছে সেই সমাজের আদর্শ, একসূত্রে গাঁথা আছে। মানুষের মন ও চিন্তাধারাকে সুগঠিত ও উন্নত করাই শিক্ষার আদর্শ ও তাহাতেই শিক্ষার সার্থকতা। তিনি বলেন, শিক্ষা সম্বন্ধে

আমরা এখনও অন্যান্য দেশের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। যেখানে জাপানে প্রতি এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫৮৬ জন কলেজে উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে, সেখানে ভারতে প্রতি এক লক্ষে মাত্র ১৩ জন কলেজে পড়ার সুযোগ পায়। সুতরাং দেশের দারিদ্র্য ও অ-শিক্ষা দূর করিতে হইলে আমাদের কঠোর শ্রম ও অক্লান্ত সাধনা করিতে হইবে। পল্লীতে পল্লীতে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও আদর্শ অনুযায়ী তাহার পরিচালনা, এই দুইটির দিকে পণ্ডিত পন্থ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

শিক্ষকদের জন্য জাতীয় সম্মান

এতদিন পর্যন্ত বিদেশী রাজশক্তি বৎসরে বৎসরে রাজ্যসরকারের জ্ঞানী গুণী হিতৈষীদিগকে উপাধি ভূষিত করিতেন। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে জাতীয় সরকার সেই কাজটি করিতেছেন। জ্ঞানী বিজ্ঞানী, কবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পপতি, সাহসী কর্মবীর ইঁহারা অনেকেই বিভিন্ন উপাধি মণ্ডিত হইয়াছেন। দেশের লোক দেশের কাছে গুণের আদর পাইতেছে। সম্প্রতি একটি নূতন ক্ষেত্রে গুণের আদর করা হইয়াছে। কয়েকজন নিষ্ঠাবান, কৃতবিদ্য, জনপ্রিয় শিক্ষককে জাতীয় সরকার সম্মানিত করিয়াছেন। দিল্লী নগরীতে বিজ্ঞান ভবনে একটি মনোরম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রদেশের ৩২ জন শিক্ষক রাষ্ট্রপতির হাত হইতে এই সম্মানপত্র ও পুরস্কার লাভ করেন। ইঁহাদের এই সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন বাঙালী শিক্ষকও ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, গুরু বা শিক্ষকের স্থান ও মান আমাদের দেশে আগে যেমন উচ্চ ছিল, আবার তাহাই করিতে হইবে। সকলেই জানেন যে শিক্ষকরা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন বর্তমানে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা তাহার অনুপাতে মোটেই যথেষ্ট নয়, এবং সমাজ তাঁহাদের মর্যাদাও যথেষ্ট দেয় না। সেজন্য সমাজের ও সরকারের চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শিক্ষকদেরও সতর্ক করিয়া দেন যে তাঁহারা যেন টাকার অনুপাতে কাজ না করেন। তাহাতে তাঁহাদেরও অগৌরব, শিক্ষকতা বৃত্তিরও অগৌরব। শিক্ষক যদি নিজের বিদ্যা ও কুশলতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন, তাঁহাদের আচরণে যদি মিষ্টতা ও সৌজন্য থাকে, ছাত্রদের জন্য স্নেহ ও দরদ থাকে তবে সাধারণভাবে শিক্ষকতা বৃত্তির উপর ও শিক্ষকদের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিবে।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেন, আজকের এই শিক্ষকদের স্বীকৃতি শুভ সূচনা করিতেছে। মানুষের সকল উন্নতির গোড়ায় এই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। সেইজন্য এই দুই বিভাগের শিক্ষকদের কাজ জাতির পক্ষে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেইজন্যই শিক্ষকদের প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়া জাতীয় সরকারের কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি বলেন যে, এই পুরস্কারের জন্য শিক্ষক মনোনয়নের কাজে তাঁহারা শিক্ষাদানে যোগ্যতা, স্থানীয় সমাজে শিক্ষকের জনপ্রিয়তা, ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ও শিশুদের প্রতি মনোভাব, স্থানীয় সমাজের সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া তবে স্থির করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীমালি বলেন যে বর্তমান বর্ষের জন্য নির্বাচিত ৩২জন শিক্ষকের মধ্যে মোটে একজন মহিলা। তাঁহার আশা, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

কোচবিহার শিক্ষানিকেতনে বুনিয়াদী শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন

কোচবিহার শিক্ষানিকেতন ২০শে জানুয়ারি হইতে ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত সাতদিন ধরিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দেন। জন-সাধারণও দলে দলে যোগ দেয় ও উৎসাহ প্রদর্শন

P3C574

করে। এই অনুষ্ঠানে নরওয়ের প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, জনশিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, নারীর শিক্ষা ও গ্রামীন খেলাধুলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় নয়ঘাষপদ্ধতি অনুসারে একটি আদর্শ পাঠ দেন কোচবিহার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীনিত্যময় চৌধুরী। কোচবিহারে এই অনুষ্ঠান গুলিতে জনসাধারণের কাছে যেরূপ সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আশা হয়।

— — —

কদমতলা স্কুল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্কুলের খেলাধূলার কথা অনেকক্ষণ বলি নাই। ইহাও ক্রমে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ, বর্ষাকালে প্রত্যহ বিকালে খেলা হইত। শিক্ষকদের মধ্যে প্রফুল্লবাবুর খেলায় খুবই উৎসাহ। তিনি নিজেও একজন ভাল খেলোয়াড়। আমরা সহপাঠীরাই এখন এ বিষয়ে নেতা হইয়া উঠিলাম। সতীর্থ মন্মথনাথ আমাদেরই বয়সী, সামান্য বড়ও হইতে পারে। খেলাধূলার প্রতি তাহার অনুরাগ প্রথম হইতেই দেখিয়াছি, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে মন্মথই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। কদমতলা স্কুলটীম বাহিরেও খেলিতে যাইত এবং বেশ সুনাম অর্জন করিয়া আসিত। সেই যে মন্মথর শরীর গঠিত হইয়াছিল, জীবনের শত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এখনও সে শক্তপোক্তই রহিয়াছে। পড়াশুনায় সে মন্দ ছিল না, খেলার প্রতি অতি-আসক্ত হইয়া পড়ার পাঠে খানিকটা অমনোযোগ আসিল, কিন্তু সে কখনও ফেল করে নাই। আমরা একসঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষা-বৈতরণী পার হইয়াছিলাম। কলেজেও আমরা দুই বৎসর একসঙ্গে পড়ি, কিন্তু তাহার পড়াশুনা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ খুব কমই দেখিয়াছি।

এই সময়ে অন্য দিকেও আমাদের দৃষ্টি ফিরিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ তখন নানা গুরুতর কারণে বিলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাবে সরকারি অনাচার, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধিত্যাগ, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রভৃতির বার্তাও ক্রমশঃ আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিল। শিক্ষকগণের মধ্যে রাজনীতির আলোচনা চলিত, আমরাও কেহ কেহ তাহা মন দিয়া শুনিতাম। সাপ্তাহিক 'বসুমতী' (তখনকার সেই বহুমূল্য পরিধান দীর্ঘাকৃতি) রীতিমত পড়িতাম। গরম গরম কথা পড়িতে ভাল লাগিত, কিন্তু পরে বুঝিয়াছি ইহা ছিল বৃথা আস্ফালন, যেন শাঁসবিহীন নারিকেলের মালা। স্কুলে বেঙ্গলী দৈনিক আসিত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতি তখন ধীরপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি হক্ কথা উহাতে তখনও বাহির হইত। "White Elephant" কথাটি প্রথম বেঙ্গলীতে পাই। ইহার বাংলা 'শ্বেতহস্তী'

তখনকার উচ্চবেতনভোগী ইংরেজ কর্মচারীকে ঘৃণা করিতাম। নিয়মিতভাবে প্রবাসী পড়িতাম, অন্যান্য পত্রিকাও পড়িতাম, কিন্তু প্রবাসীরই একান্ত ঘোঁড়া ভক্ত হইয়া উঠিলাম।

এই সময়ে Gokhale's Speeches যোগাড় করিয়া মটেশান কোম্পানী হইতে আনাইলাম। গোখলে মহাশয়ের বাজেট বক্তৃতাগুলি বাদে অন্য সব বক্তৃতাই পাঠ করিলাম। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁহার কি উচ্চ ধারণা! দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতার মধ্যে গান্ধীজির কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলেন, "Gandhi is a man amongst men", এই ইংরেজি বাক্যটির নিখুঁত ব্যঞ্জনা অনুবাদে প্রকাশ করা কঠিন।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মারা গেলেন। সংবাদ পৌঁছিবামাত্র আমরা ছাত্র ও শিক্ষকগণ একটি সভায় সমবেত হইলাম। শিক্ষক মহাশয়েরা, বিশেষতঃ নিবারণবাবু, তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ওয়ার কতকটা পরিচয় পাইলাম। পর দিনও আমরা ছুটি পাইলাম। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথাও আমরা শুনিতে লাগিলাম। লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় স্পেশাল কংগ্রেস হইয়া গেল, তাহার খবরও গিয়া পৌঁছিল। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২০ তারিখে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'সার্ভেন্ট' দৈনিক বাহির করিলেন। বেঙ্গলীর পরিবর্তে আমাদের স্কুল সার্ভেন্ট পত্রিকার গ্রাহক হইল। মনে হয়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছিলেন তখন বিলাতে। গ্লাসগোর একটি দৈনিকে তিনি গান্ধী-চরিত্র বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। নিবারণবাবু এই লেখাটি পড়িয়া আমাদের কয়েকজনকে শুনাইয়াছিলেন, কত ভাল লাগিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিতে পারিনা। এইরূপে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে নবম শ্রেণী কাটিয়া গেল। নবম শ্রেণীতে আমাদের পড়া খুবই ভাল হইয়াছিল।

দশম শ্রেণীতে উঠিয়া আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হইলাম। নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই ইহার সপক্ষ হন। সি. আর. দাশ, ব্যারিষ্টারি ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হইলেন। স্কুল-কলেজ বয়কট আন্দোলন বৎসরের আরম্ভেই শুরু হইল। ইতিহাসের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ চন্দ কলিকাতায় আইন পরীক্ষা দিতে গিয়া সত্যাগ্রহী হইলেন। পরীক্ষা না দিয়াই ফিরিয়া আসেন। আমি প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাখানি স্কুল কলেজ বয়কটের বিরোধী ছিল। আমার মনও ঐ প্রস্তাবে সায় দিতে পারিলনা। আমরা স্কুলে তাঁত-চরখা প্রবর্তনে মন দিলাম। অসহযোগকালে আমার চিত্ত খুবই আন্দোলিত হইয়াছে দেখিয়া পিতৃদেব আমাকে চরখা ও তুলা কিনিয়া দিলেন সুতা কাটিবার জন্য। এইরূপে তিন মাস চলিল। স্কুলে যথারীতি যাই, পড়াশুনাও করি, কিন্তু মনে সোয়াস্তি পাই না। এইরূপে তিন মাস চলিল।

এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক (রাজনৈতিক) সম্মেলন। বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতি। সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও আসিলেন। আর বেজায় গুজব উঠিল, মহাত্মা গান্ধীও আসিবেন। আমরা তিন বন্ধুতে মিলিয়া হাঁটা পথে বরিশাল চলিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া বিপুল জনসমাগমের মধ্যে পড়ি। এই সময় তিন দিন বরিশালে ছিলাম। তিন বন্ধুর একজনের পারিবারিক উকীলের গৃহে আমরা তখন থাকি। সভাপতি ও দেশবন্ধুর অভ্যর্থনা শোভা-যাত্রায় যোগ দিলাম। সম্মেলনে প্রবেশ-দক্ষিণাও কিনিলাম। কিন্তু সম্মেলনের দিন যখন

শুনিলাম মহাত্মা গান্ধী আসিবেন না, তখন বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। পূর্বদিন ময়মনসিংহের নেতা সূর্য সোমের একটি বক্তৃতা শুনি। তাহাতে তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ সিংহের চারি পা' এবং ইহার প্রথম পা স্কুল কলেজ ভাঙাই তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য। সম্মেলনের বর্জনমূলক আবহাওয়া এবং গরম গরম বক্তৃতা আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সম্মেলন হইতে ফিরিয়াই সতীর্থদের এবং অন্যান্য ছাত্রদের লইয়া ছাত্রসভা করি এবং সঙ্কল্প করি যে আমরাও স্কুল বর্জন করিব।

তখন মর্ণিং স্কুল। প্রথমে আমরা উপরের ক্লাসের ছেলেরা বাহির হইয়া আসিলাম। নীচের ক্লাসের ছেলেরাও আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। খালের ওপারে বোর্ডিং স্কুলের ঘরে গিয়া আমরা সভা করিলাম। আমাদের কোন নেতা নাই, উপদেষ্টা নাই। যতদূর মনে পড়ে, প্রফুল্লবাবু এই সময়ে ছিলেন না। প্রধান শিক্ষক একেবারেই আমাদের বিপক্ষে। কাজেই আমরাই আমাদের নেতা হইলাম। সকালে স্কুলের গেটকে ও বিভিন্ন পথে পিকেটিং করিতে লাগিলাম। সাতদিন মাত্র আমাদের এই ধর্মঘট চলে। প্রতিদিন দুই বেলা আড়াই মাইল পথ ঠেলিয়া করব-তলায় যাই এবং ধর্মঘট চালু রাখিবার ব্যবস্থা করি। এই সময়কার কোন কোন কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। আমরা এক বৈদ্য বারজীবির বাড়ীতে আড্ডা গাড়িয়াছিলাম। সে বাড়ীর ছাত্ররা আমাদের দলে ছিল। একদিন এক প্রৌঢ় বারজীবি আসিয়া নিজ পরিভাষায় আমাকে বলিলেন, "বাবু, বড় কষ্টে আমরা এই স্কুলটি করিয়াছি। এক সের দুই সের চাউল ভিক্ষা করিয়া এই স্কুলটি দাঁড় করাইয়াছি। বাবু, তোমরা এই আমাদের রক্তে গড়া স্কুলটি ভাঙিয়া দিও না।" এই কথাগুলি তাঁহার অন্তরের মর্মস্থল হইতে উচ্চারিত হইতেছিল, তাঁহার কথা আমার মনে বড় লাগিল।

ধর্মঘটের প্রথম উদ্দীপনা কাটিয়া আসিয়াছে। যে কয়দিন ধর্মঘট করিয়াছিলাম সেই সাতদিন পিতৃদেব বরিশালে ছিলেন। আমি স্কুল ছাড়িবার পক্ষপাতী নই তাহা তিনি জানিতেন। এক সোমবার ধর্মঘট করিয়াছি। পরবর্তী সোমবার তিনি ফিরিলেন। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি না থাকায় কেহ কেহ স্কুলে যাইবার জন্য উসখুস করিতেছিলাম। পরবর্তী সোমবার সাতদিন ধর্মঘটের পরে পুনরায় আমরা স্কুলে গেলাম। শিক্ষক-অভিভাবক স্কুলের হিতৈষী সকলেরই শুভভাবনার শেষ হইল। সাময়িক উত্তেজনায় কিশোর মন কিরূপ দিশাহারা হয়, আমাদের এই ধর্মঘট তাহারই একটি দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু স্কুলের নিয়মিত পাঠে যে মন আর বসে না। ইতিপূর্বে বরিশালের শরৎ ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়াছি। অসহযোগের ওরূপ পারমার্থিক ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টি শুনি নাই। তিনি দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করিতেন। প্রথম দিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন এক নাগাড়ে প্রায় চারি ঘণ্টা। পরেও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি; পূর্ব বক্তৃতারই যেন পুনরাবৃত্তি। প্রথম দিনের উদ্দীপনা আর ফিরিয়া আসে নাই। সংবাদ-পত্র পড়ি, মাসিকপত্র পড়ি, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করি। আমাদের কিছু করিবার সুযোগ নাই, কিন্তু মনটা যেন কিছু করিতে চায়। পূজার ছুটি ঘনাইয়া আসিল। তখন খুলনার সাতক্ষীরায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খুলনার নেতা নগেন্দ্রনাথ সেন বোম্বাইয়ে গিয়া প্রচুর টাকা তুলিয়াছেন। এদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও টাকা তুলিতেছেন। আমরা ছেলেরা কিছু টাকা তুলিয়া আচার্য রায়ের নিকট সায়েন্স কলেজের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম। পূজার ছুটির

পূর্বে অভিনয়াদি উৎসব হইবে। আমরা প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এবারের উৎসব বন্ধ থাকুক এবং যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে তাহা বন্যার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে পাঠানো হউক। এই প্রস্তাবে তিনি রাজী হইলেন না। আমরা কেহ কেহ উৎসবে আর যোগ দি নাই। এই সব ব্যাপারে নূতন সহপাঠী মতিলাল আমার সমর্থক ছিলেন। চাঁদা তোলার ব্যাপারেও তিনি আমার সহায় হন। মতিলালের সঙ্গে এক বৎসর মাত্র পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল খুবই। বরিশালে পরীক্ষা দিতে আসিয়া আমরা কয়েক দিন একসঙ্গে ছিলাম। প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ চন্দ প্রভৃতি শিক্ষকতা কর্ম ত্যাগ করিয়া একে একে চলিয়া গেলেন। নূতন গণিত-শিক্ষক আসিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। তিনি আমাদের গ্রামের জামাতা ও তাঁহার বয়স অল্প; ছেলেদের তিনি তেমন বাগ মানাইতে পারিতেন না। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী। শিক্ষাদান কার্যে তিনি পরে যশ লাভ করিয়াছেন প্রচুর।

স্কুলের দশম শ্রেণীর পাঠ শেষ করিতে আর দুই এক মাস মাত্র বাকি। এই সময় আর একটি বিষয় বলিয়া লই। ব্যক্তিগত কথাই বটে। এই আট বৎসরে স্কুলের একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা এই ঐতিহ্যকে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিতেছিলাম। আমাদের কোন কোন শিক্ষক মহাশয়, তাঁহাদের মধ্যে নিবারণ বাবুই প্রধান, বলিতেন যে, পুরস্কারের আশায় কোন কাজ করা উচিত নয়, পরীক্ষায় পাশ তো করই। গ্রীসে অলিম্পিক খেলায় কত বিখ্যাত বিখ্যাত খেলোয়াড়রাই না যোগ দিতেন, বিজয়ীরা পুরস্কার পাইতেন একটি জলপাইয়ের পাতা। এখানে কৃতিত্ব মুখ্য, পুরস্কার গৌণ। আমাদের স্কুলের, অন্তত ক্লাসের পরীক্ষায় বেলায় ইহা অনুসৃত হইয়াছিল দীর্ঘকাল। আমার ভর্তি হইবার পর দ্বিতীয় বৎসরে মাত্র একবার পাঠোৎকর্ষের জন্য ছেলেদের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। পরে এই সাত বৎসরের ভিতর আর দেওয়া হয় নাই। এক পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াই উত্তীর্ণ হই। কিন্তু পুরস্কারের রীতি না থাকায় একটি বারও পারিতোষিক পাই নাই। পরবর্তী কালে মনে হইয়াছে, পারিতোষিক পাইলে হয়তো আমার এক আলমারি উৎকৃষ্ট বই হইত। কিন্তু তাহা পাই নাই বলিয়া ঐ সময়ে কোন প্রকার ক্ষোভই মনে উপস্থিত হয় নাই। পারিতোষিকের অকিঞ্চিৎকরতা তখন মনের মধ্যে কেমন ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার প্রদান না করার ফল ভালই হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট ছেলেদের মধ্যে পরস্পরের এবং উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ছেলেদের মধ্যে অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষার বদলে একটি সহজ প্রীতির ভাব জন্মিতে পারিয়াছিল। খেলা-ধূলার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার দেওয়া হইত, সারদীয়ার আগমনে অভিনয়াদির আয়োজন হইত। কিন্তু পারিতোষিক প্রদানের কথা কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে যেন উদয় হইত না। আমাদের স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি দেখিয়াছি ঐরূপ অন্য কোথায় কচিৎ দৃষ্ট হইত।

আমরা পারিতোষিক পাই নাই বলিয়া পড়াশুনায় যে নিষ্ঠা ছিলাম এমন কথা বলা যায় না। পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমাদের বেশ স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। আমরা দশম শ্রেণীতে উঠিবার পর কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া স্কুল হইতে কিছু সাহায্য লইয়া মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু পত্রিকার এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলাম। ইহাতেই মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি উক্তি পাঠ করি। সত্যাগ্রহ একটি মুদ্রার ন্যায়। আর এই মুদ্রার একদিকে সত্য এবং

অন্য দিকে প্রেম—"Truth and love are two sides of a coin"। সহজ সরল ইংরেজি, ছোট ছোট প্রবন্ধ পড়িতে বেশ ভাল লাগিত। সম্প্রীতির কথা প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বিদ্যালয়ের সঙ্গে এমন একটি অঙ্গাঙ্গীভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রীষ্মের বা পূজার দীর্ঘ ছুটিতে সহপাঠীরা হইব ভাবিয়া কেমন যেন দুঃখ পাইতাম। এই অনুভূতিটি এতই সত্য যে, এখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

প্রতি ক্লাসেই কিছু না কিছু পুরাতন ছাত্র চলিয়া যাইত, আবার নূতন ছাত্র ভর্তি হইত। অধিকাংশই আমরা পুরাতনরাই রহিয়া গেলাম। সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেল, নবম শ্রেণীতে যোগেন্দ্রনাথ আসিল, দশম শ্রেণীতে আসিল মতিলাল। যোগেন্দ্রনাথ ফুটবল খেলোয়াড়, অভিনয় করিতে পারে ভাল, আবার পড়াশুনায়ও তাহার খুব মতি। কিন্তু তাহার মধ্যে কিছু বদভ্যাস ছিল যাহাতে স্কুলের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাহার খাপ খাইত না। মতিলাল ধীর স্থির, বয়সে যোগেন্দ্রের মতই—আমাদের চেয়ে বড়। তাহার সঙ্গে মতে খুবই মিলিত। তৃতীয় হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আমরা যাহারা একসঙ্গে পড়িয়াছি তাহাদের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হইয়াছিল। মনথ বাবু উপেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে এই দীর্ঘ আট বৎসর পড়িয়াছি। উপেন্দ্র অতিমাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হইতে এল্-এম-এফ পাশ করে, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অল্প কালের মধ্যেই মারা যায়। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদলাল। বি. এ. পাশ করিবার পর পুলিশ বিভাগে কর্মে লিপ্ত হয় এবং এখনও কৃতিত্বের সহিত কার্য করিতেছে।

পূজার পরে যথাসময়ে টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেল। আমরা আটাশজন পরীক্ষা দিই। আটাশ জনই "এলাউ" হইলাম, কিন্তু দুই জন ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল না। একজন আত্মবিশ্বাসের অভাব হেতু, দ্বিতীয়জন অসুখবশে। সে আত্মীয় বিদ্যালয়ের আর পরীক্ষা দিল। সেইবার রাজনৈতিক আন্দোলন হেতু পরীক্ষা হয় ৬ই এপ্রিল হইতে। টেষ্ট পরীক্ষা হইবার পর আমি তিনখানি বই পড়ি,—লা মিজারেবল, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, এবং বিপিনবিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ। তিনখানি বই-ই চমৎকার। লা-মিজারেবলের নায়ক জীন ভলজিনের কারাগার হইতে পলায়নের দৃশ্যটি এখনও যেন চোখে ভাসিতেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিল। আগেই বলিয়াছি, রাজনৈতিক আবর্তে পড়িয়া দশম শ্রেণীতে তেমন ভাল পড়াশুনা হয় নাই। তবে আমাদের সময়ে একটা সুবিধাও ছিল। ইংরেজি ও বাংলা এই দুই বিষয় দুটির কোন পাঠ্য বই ছিল না। সাধারণ জ্ঞানের উপরই পরীক্ষা হইত। ইহার সুফল কুফল দুই-ই ছিল। তবে একটি বিষয় দেখিয়া মনে হয়, কুফলের চেয়ে সুফলই ছিল বেশি। ছাত্রদের ভাবাজ্ঞান বাড়িত, রচনাশক্তির উন্মেষের সুযোগ ঘটিত; পরীক্ষার পূর্বে মাসখানেক সামান্য কিছু পড়িয়াছিলাম। মোটের উপর বলিতে পারি, নবম শ্রেণী পর্যন্ত যতটুকু পড়িয়াছি, বেশির ভাগ তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এবারে (১৯২২) প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। এই সময় একক্রমে নয় দিন বরিশালে ছিলাম। ইহার পর আর কখনও বরিশাল যাই নাই। এই নয় দিন আমার জীবনে অতিশয় স্মরণীয়। এই সময় পূজ্যপাদ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। এই নয় দিনের কাহিনী আমি অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি। এই কয়দিন মতিলাল ও আমি একসঙ্গে ছিলাম। মতিলালের দরুণ এবারের বরিশাল বাসে আমার কোন অসুবিধাই হয় নাই।

জীবনের উৎকৃষ্ট সময় আট বৎসর কাল একই বিদ্যালয়ে কাটাইয়াছি। আমার অজ্ঞাতেই

জীবনের গতি নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মনে পড়ে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় মহাত্মা গান্ধীকে একখানি চিঠি লিখি। তিনি তত কাজের মধ্যেও একখানি পোস্টকার্ডে ইংরেজিতে স্বহস্তে আমার পত্রের জবাব দিয়াছিলেন। এই পত্রখানি দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম। বন্ধুবর শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে টাকানা লইয়া কত টেকনিক্যাল স্কুল বা শিক্ষালয়ের প্রস্পেক্টাস আনাই। কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইবার অনুমতিও পাইলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—আমার জীবন-তন্ত্র যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, বিধাতা যেন আমাকে সেই দিকেই লইয়া গেলেন। কয়েকটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছেলেদের শিক্ষার যেন সুবিধা হইয়াছিল। আমাদের দুইটি গ্রাম (পূর্ব ও পশ্চিম) চলিশা ও পোড়াগাছার কায়েত-বাড়ুলের ছেলেরাই সর্বাদিক উপকৃত হইলাম। যাহাদের জন্য বিদ্যালয়টি করা, তাহারা যে খুব বেশি উপকৃত হইয়াছিল এরূপ বলিতে পারি না। দু'পাতা ইংরেজি লিখিয়া শিল্পপুরুষের ব্যবসা-নিয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিলে তাহা আদৌ কল্যাণপ্রসূ হয় না। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ফলে সুফল-কুফল দুই-ই হইয়াছিল। আজ স্মৃতির পাতা উল্টাইতে গিয়া এই কথাই বারবার মনে হইতেছে।

সমাপ্ত

সাহিত্য-কর্মশালা

কয়েক বছর হল দেশে Literary Workshop বা সাহিত্য-কর্মশালা বলে একটা কাজ চলছে। কাজটা বড় নয়, বছরের স্থায়ীভাবেও কোন কিছু হয় না। হয়তো বছরে একবার মাত্র কাজ হল। কোন বছরে বা হলও না। তা ছাড়া, বছরে একবার করেও, কাজটা বছরের চলবে কি না, তারও কিছু ঠিক নাই। খবরের কাগজেও এ-সম্বন্ধে কোন কিছু বড় একটা বার হয় না। তাই লোকেও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না।

আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে অনেক টাকা বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেওয়া হয়। সেই সকল দেশে শিক্ষাবিস্তারের নানান খাতে এই টাকা খরচ করা হয়। এ রকমের কিছু টাকা বিভিন্ন দেশের গভর্মেণ্টের হাতে দেওয়া হয় শিশুদের উপযোগী বই লেখাবার জন্য, বা সেই সব বয়স্কদের উপযোগী বই লেখাবার জন্য যাদের অক্ষরপরিচয় কেবলমাত্র শেষ হয়েছে।

শুনেছি, বিশেষ করে কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকদের উপযোগী ও শিশুদের উপযোগী সহজ বই লেখাবার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে কিছু টাকা ভারত গভর্মেণ্টের হাতেও দেওয়া হয়েছে। ভারত গভর্মেণ্ট প্রথমবার সরাসরি নিজেরাই কয়েকটি অঞ্চলের মাধ্যমে এই কাজ শুরু করেন। এখন বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য-গভর্মেণ্টের মাধ্যমে এই কাজটা চলছে। সম্ভবত ভারত-গভর্মেণ্ট নিজেরাও এ কাজে কিছু কিছু অর্থব্যয় করেন।

গেল বার, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৫৭-৫৮ সালে, এ কাজটা বাঁশীসুরে হয়। কাজের ভার ছিল প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শ্রীশরৎচন্দ্র দত্তের উপর। তাঁকেই এই কর্মশালার ডাইরেকটর করা হয়। দু-সপ্তাহ মাত্র সময় কর্মশালার কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। লেখক-শিক্ষার্থীদের বেছে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-গভর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ। এই সকল লেখক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা, তাঁদের

দিয়ে বই লেখানো, সেই লেখার সংশোধন করা, এবং প্রেস-কপি ও প্রদর্শনী-কপি তৈরি করানো, সম্পূর্ণ কাজের রিপোর্ট ও হিসাবপত্র গভর্মেণ্টের কাছে দাখিল করা, সবই ঐ সময়ের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল।

বই লেখার কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দিয়ে প্রত্যেক ভাগের কাজ শেষ করার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া ও শেষ পর্যন্ত বাঁধা-সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বই বার করিয়ে নেওয়ার এই যে রীতি এর অনুপ্রেরণা ভারত-গভর্মেণ্ট বোধ হয় আমেরিকানদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকবেন। এ রীতি, এ দেশের নয়, অন্তত বই লেখার কাজে বা সাহিত্যসৃষ্টিতে তো নয়ই। তড়িঘড়ি কাজ করা, চটপট জিনিস তৈরি করা, বৃহৎ ও ব্যাপক শিল্পের দেশের পক্ষে স্বাভাবিক পরিবেশ। অ্যামেরিকার লোকেরা বই-তৈরির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রয়োগ করে থাকে। তাতে নতুন সাহিত্যসৃষ্টি বা উঁচু ধরের বই তৈরি হয় কি না সন্দেহ। সেদেশে যদি বা হয়ও, এদেশের পরিবেশে সে রকম হওয়া মুশকিল। হোক বা না হোক, ভারত-গভর্মেণ্ট যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন তাতে বালীপুরেও কাজের চুলচেরা ভাগ ও সময়ের নির্ঘণ্ট করে নিতে হয়েছিল।

বালীপুরে সাহিত্য-কর্মশালার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৭-র ১৬ ডিসেম্বর তারিখে। কাজের নির্ঘণ্ট ঠিক হয় এইরূপ—

১। বিষয় নির্বাচন ও লেখার খসড়া দেবার শেষ তারিখ ২০-১২-৫৭

২। নির্বাচিত বিষয়ে নমুনা হিসাবে প্রথম দুই পৃষ্ঠা লেখা দেবার শেষ তারিখ ২৩-১২-৫৭

৩। বই লেখা ও সম্পূর্ণ বই দেবার শেষ তারিখ ১১-১-৫৮

৪। লেখা সংশোধন করিয়ে নিয়ে প্রদর্শনী-কপি ও প্রেস-কপি দেবার শেষ তারিখ ১৯-১-৫৮

৫। কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান হয়েছে এ রকম লোকেদের নিয়ে বই-এর পরীক্ষা করার তারিখ ২২-১-৫৮

৬। সমস্ত কাজের পুনরালোচনার তারিখ ২৪-১-৫৮

সাহিত্য-কর্মশালার যাঁরা সময়তালিকা ছিল ১৬-১২-৫৭-তে আরম্ভ করে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। ২৬-১-৫৭-র মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। ২৬ তারিখ ছুটি থাকায় ২৫ তারিখেই সমাপ্তি-অনুষ্ঠান করতে হয়।

দিনে দু বার করে কর্মশালার অধিবেশন হত। সর্বসমেত ত্রিশ দিন ক্লাস হয়। সকালবেলার ক্লাসে, বয়স্কদের কোন কোন দিকে বেশি ঝোঁক ও আগ্রহ, তাদের শেখার শক্তি, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যে সকল বয়স্কদের জন্য বই লেখা হচ্ছে তাদের মানসিক গঠন ও সামাজিক পরিবেশ, কপি-তৈরি করার ও বই-লেখার রীতি-পদ্ধতি, ঠিক ঠিক বিষয়-নির্বাচন করা, উপযুক্ত শব্দ-নির্বাচন ও বাক্যগঠন, বাক্য-গঠনের রীতি ও বানান, ভাব-সম্প্রসারণের রীতি, এই সকল বিষয় অবলম্বন করেই লেখক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ডাইরেক্টরের আলোচনা চালাতে হত। বৈকালবেলার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত তথ্য, লেখা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হত। এ ছাড়া লেখা-সংশোধনের জন্য বা নতুন কোন তথ্যের আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে অন্য সময়েও ডাইরেক্টরের কাছে যাতায়াত করতেন। কাজেই ডাইরেক্টরকেও শিক্ষার্থীদের সঙ্গেই ক্যাম্পে থাকতে হত।

বই লেখার কাজটা ছিল সেই সব বয়স্কদের জন্য যারা কেবলমাত্র অক্ষর-পরিচয় শেষ করেছে। বই তো বাজারে অনেকই আছে, কিন্তু অক্ষরপরিচয় মাত্র সম্বল করে সেই পুস্তকসমুদ্রে সন্তরণ করার সাহসও সাধারণ লোকেদের হয় না, উৎসাহে তো হয়ই না। কোন রকমে সেগুলি যদি বা একটু

আধটু পড়তেও পারে তবুও তাতে তারা আনন্দ পায় না, তা থেকে তারা কিছু গ্রহণ করতেও পারে না। অথচ বই-পড়া যদি আরও বেশ কিছুদিন চালাতে না পারে তা হলে চেনা-অক্ষরও অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কাছে আবার অচেনা হয়ে পড়বে।

তা যাতে না হয় সেইজন্যই সাহিত্য-কর্মশালার মারফত এই বই লেখাবার চেষ্টা। এই রকম লোকেদের বই সহজ হওয়া দরকার। সহজ সহজ কথা, সহজ সরল ছোট ছোট বাক্য হওয়া দরকার, অথচ ভাব বা জ্ঞাতব্য তথ্যের দিক থেকে সেগুলি যেন কেবলমাত্র অপরিণত শিশুদের উপযোগী বা ছেলেভোলানো ছড়ার মত না হয়, কেন না অশিক্ষিত বয়স্ক লোককেও জীবনযাত্রা চালাতে হয়, সমাজের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে হয়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিক থেকেও তাদের শরীর-মন বয়সোচিত একটা পরিপক্কতা লাভ করে। শিশুদের মত আজগুবি বা অসম্ভব কল্পনায় বা ছেলেমানুষি ভাবে তাদের মন সাড়া দেয় না, তাতে তাদের কোন আগ্রহ আসে না।

তাই বয়স্কদের বই সহজ অথচ ভাব-পরিণত হওয়া দরকার। বইএ যে সকল কথা, ঘটনা, বা ভাব থাকবে তার সঙ্গে তাদের জীবনের পরিচয় থাকা চাই। যে সকল তথ্য থাকবে তা তাদের সহজে বোধগম্য হওয়া চাই, এবং এই তথ্যগুলি যে সকল বিষয়ের সেই সকল বিষয় জানার জন্য তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ, বা ঝোঁক থাকা চাই। জীবন-যাত্রার প্রয়োজনের জন্যই হোক বা নিছক আনন্দের জন্যই হোক বিষয়গুলির প্রতি যদি তাদের অনুরাগ থাকে তা হলে সেই সেই বিষয়ের তথ্য জানতে তাদের আগ্রহ হবে। বই পড়তে তারা উৎসাহী হবে।

আনন্দের জন্য হোক, প্রয়োজনের জন্য হোক, জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য হোক বা জীবনযাত্রার আর্থিক উন্নতির জন্যই হোক, বই পড়তে তারা যদি উদ্বুদ্ধ হয়, তা হলে হাতের কাছে সহজ বই পেলে তারা এক বই বার বার করে পড়বে, একের পর এক বই পড়ে যাবে, বই পড়া ব্যাপারটা তাদের অভ্যস্ত হবে। খুঁজে পেতে তাদের দরকার অনুযায়ী বইও পড়বে, পড়াটা তাদের রপ্ত হবে। যত বেশি বই পড়বে, পড়ার কৌশলটা ততই বেশি করে তাদের আয়ত্ত হবে। পড়তে যে পারে এবং পড়ে সহজে বুঝতেও পারে, নিজের উপর এই বিশ্বাসও তাদের থাকবে। আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে তারা বই পড়ে যাবে। নিরক্ষরতার শক্তিহীন অন্ধকারে লোকে পুনরায় নির্বাসিত হবার তাদের আর কোন আশঙ্কা থাকবে না।

সাহিত্য-কর্মশালায় এই রকমের সব বই লেখানোরই কথা। তাই বই লেখার সময়ে সূত্রাকারে তিনটি বিষয়ের উপর লেখক-শিক্ষার্থীদের বিশেষ নজর রাখতে বলা হত :

১। বইএর জন্য এমন কথা বাছতে হবে ও সেই কথা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সে কথার উপর পাঠার্থীর যেন সহজেই দখল জন্মে।

২। বই পড়তে গিয়ে পাঠার্থী বয়স্কদের যেন পাঠ-কৌশল আয়ত্ত করবার বিষয়ের বারংবার চর্চা হয়।

৩। প্রয়োজনীয় তথ্য বা খবর পাওয়ার জন্য এবং আনন্দ পাওয়ার জন্য পাঠার্থী যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায়।

এগারো জন লেখক-শিক্ষার্থী নিয়ে বালীগুরে ১৯৫৭-৫৮-র কাজ আরম্ভ হয়। এই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে শেষ পর্যন্ত কুড়িতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক হয়, কুড়ি জনে কুড়িখানি বই লিখবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে চার জন মেয়ে ছিলেন। পাঁচ জন গ্র্যাজুয়েট। তিনজন এম, এ, এম্, এস্ সি। একজন কলেজের শিক্ষক নিয়ে নয় জন শিক্ষক। চারজন লেখক, অন্যান্য সাতজন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই আগেকার কর্মশালাতেও যোগ দিয়েছিলেন।

এঁদের বাছাইএর কাজ শিক্ষাবিভাগের কর্তারাই করেছিলেন।

এই কর্মশালাতে যে কুড়িখানি বই লেখা হয় সেগুলি এই—

১। উপনিষদের গল্প—শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
২। শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীতারাশঙ্কর ঘোষ
৩। সাঁওতালী উপকথা—শ্রীসুকুমার রায়
৪। রাম-চরিত (সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, পদ্যে) —শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায়
৫। সোনার ফসল (নাটিকা) —শ্রীসতীকুমার নাগ
৬। পাখি কথা কয়—শ্রীরবিদাস সাহা রায়
৭। ঈশ্বর মঙ্গলময় (নাটিকা)—শ্রীকানু মিত্র
৮। পৌষ-পার্বণ—শ্রীমতী ঘোষ
৯। যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা—শ্রীনীরদ বসু
১০। বিনোবা ও ভূদান—শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ
১১। ঘরে ফেরা (ছোট উপন্যাস) —শ্রীপলাশ মিত্র
১২। খাদ্য-পরিপাক—শ্রীমতী কল্পনা দত্ত
১৩। মজার গল্প—শ্রীমতী সনাতনী মুখোপাধ্যায়
১৪। শোনো গো জননী —শ্রীমতী গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়
১৫। বাঁচার পথ (অর্থনৈতিক প্রবন্ধ) —শ্রীসুধীন চট্টোপাধ্যায়
১৬। বাজিয়ে নাও (পড়ার বিষয়ে নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য কতকগুলি পাঠ) —শ্রীমতী অপর্ণা রায়
১৭। বাতাসের কথা—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী
১৮। ধ্রুবতারা (ধ্রুবচরিত, পৌরাণিক) —শ্রীশিবশম্ভু পাল
১৯। সাপের কথা—শ্রীআনন্দ বাগচি
২০। সবজির পোকা—শ্রীঅমিয় সরকার

এ ছাড়া কর্মশালার সকলের সমবেত চেষ্টায় আর একখানি বই লেখা হয়—পড়ার বই। কর্মশালার কাজের অঙ্গীকারে এ বই লেখার কথা ছিল না। বইখানি বাস্তবিক পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখার অর্থাৎ যুক্তাক্ষর বাদে অক্ষর-পরিচয় করানোর প্রথম বই। উপযুক্ত শিক্ষকদের দিয়ে বয়স্কদের বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে খুব ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্য শিক্ষা-বিভাগের মৌখিক অনুমোদনে এই কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই বইএর দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ যুক্তাক্ষর নিয়ে বই, লেখারও কথা হয়েছিল, কিন্তু অনুমোদন পেতে দেরি হওয়ায় সেখানি লেখানো যায় নাই। যেখানি লেখা হয়েছে সেখানিও গৃহীত ও মুদ্রিত হবে কি না বলা যায় না।

লেখা বইগুলি পরীক্ষায় কাজে আরও বেশি সময় দেওয়া যায় নাই বলে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করা যায় নাই, এবং ফলাফল সম্বন্ধেও নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। এইটুকু কেবলমাত্র অনুমান করা গেছে যে অক্ষরপরিচয়ের জন্য আলাদা আলাদা অক্ষর থেকে আরম্ভ করে বানানের ভেতর দিয়ে পড়া শেখানোর যে পদ্ধতি বর্তমানে অনুসরণ করা হচ্ছে তাতে গড়গড় করে বই পড়ে যাবার পক্ষে বাধা ঘটছে, আর যুক্ত-অক্ষরের পরিচয় ভাল হচ্ছে না। তবে পড়ে শোনানো বইএর বিষয়বস্তু পাঠার্থীরা সহজে গ্রহণ করতে পারছে, আনন্দও পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই পরীক্ষা আরও ভাল করে ও বেশি সময় ধরে করার ব্যবস্থা হলে ফলাফল সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত ধারণা করা যাবে ও সেই অনুসারে পরে কাজের অদলবদল করা যেতে পারবে।

কর্মশালা উপলক্ষে যে সকল লেখক-শিক্ষার্থী সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা যে কেবলমাত্র ক্লাস করেছেন ও বই লিখেছেন তা নয়, বাণীপুরের সামাজিক জীবন ও উৎসব অনুষ্ঠানেও তাঁরা যোগ দিয়েছেন। বাণীপুরে গিয়েই তাঁরা ধানকাটার

উৎসব পেয়েছিলেন। ওখানকার কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসবেও তাঁরা সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া নিমন্ত্রিত কিছু কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও মাঝে মাঝে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দেন। এই রকম মেলামেশা, উৎসব-আনন্দ, ভাষণ আলোচনা থেকে তাঁরা বই লেখার অনেক উপাদান এবং ভাবও পেয়ে যান।

২৫. ১. ৫৮ তারিখে সমাপ্তি-অনুষ্ঠানে লেখা বইগুলি প্রদর্শন করা হয় ও লেখক-শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। বিশ্বভারতী বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীঅনাথনাথ বসু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কর্মশালার কাজ চালাবার সময়ে ডাইরেকটরের যে অভিজ্ঞতা হয় সেই অনুসারে রিপোর্টে তিনি মন্তব্য করেন—

১। পড়ার কৌশল ভাল ভাবে আয়ত্ত করানোর উদ্দেশ্যে পাঠ-চর্চার জন্য ছবি আর পড়া মিলিয়ে, ছোট ছোট এক রকমের পুস্তিকা বা দেওয়াল-পত্র ছাপানো দরকার। বয়স্করা পড়ে কতটুকু বুঝতে পারছে তা ঠিক ঠিক জানার জন্য কিছু কিছু পরীক্ষা-টেস্টও স্থির করা দরকার (objective tests of comprehension)।

২। বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লেখাপড়া শেখানোর যে পদ্ধতি বর্তমানে চলছে তার বদল হওয়া দরকার।

৩। বয়স্কদের জীবনযাত্রার কাজের বা জীবিকার বিষয়ে নির্ভুল তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করা দরকার।

৪। লেখক-শিক্ষার্থীদের অন্তত অর্ধেক উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া দরকার।

৫। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য একটি ভাল লাইব্রেরি থাকা দরকার।

৬। লেখক-শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের সময় তাঁদের স্বেচ্ছানির্বাচিত কোন বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা নেবার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

বাণীপুরের ১৯৫৭-৫৮-র এই কর্মশালার আগে পশ্চিম বাঙলায় আরও কয়েকটি সাহিত্য-কর্মশালার কাজ চলেছিল। প্রথমটি সরাসরি ভারত-গভর্মেণ্টই করেছিলেন কয়েকটি অঞ্চলের মাধ্যমে। এখানকার অঞ্চলটি ছিল বাঙলা-আসাম-ওড়িষ্যা-মনিপুর-ত্রিপুরা অঞ্চল। কাজ হয় শান্তিনিকেতনে। ডাইরেকটর ছিলেন শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। এটিতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বয়স্কদের জন্য বই লেখানো হয়। দ্বিতীয় কর্মশালা হয় বাণীপুরে বয়স্কদেরই বই লেখাবার জন্য। ডাইরেকটর ছিলেন শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। তৃতীয়টিও বাণীপুরে হয় শিশুদের বই লেখাবার জন্য। ডাইরেকটর ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত। চতুর্থ কর্মশালার পরিচয় উপরেই দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক কর্মশালা এখনও চলে। তার পর থেকে রাজ্য-গভর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগের মাধ্যমেই কর্মশালার কাজ চলছে। ভারত-গভর্মেণ্টের সঙ্গে সরাসরি যোগ এখন আর নাই।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচয়-পর্ব শেষ করার আগে আর একটি কথা বলা দরকার। এই রকম বরা-বাঁধা নিয়মে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভাল বই লেখানো যায় কি না ফলাফল না দেখে তার কিছুই বলা যায় না, কিন্তু যে বইগুলি লেখা হয় সেগুলি ছাপা না হলে তো সে বিষয়ে কিছুই ঠিক করা যায় না, কোন দিন কিছু ঠিক করা যাবেও না। তা ছাড়া, যে টাকাটা এর পেছনে খরচ করা হয়েছে তাও নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। বই লেখানো সম্বন্ধে যাঁরা আমেরিকার ক্রত-উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন পুস্তক-প্রকাশের সময় কর্মশালার সেই উদ্যোক্তারা কেন গয়ংগচ্ছ-নীতির অনুসরণ করছেন তা সকলের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। বইগুলি তো সরকারী দফ্তর-খানায় কীটদষ্ট হবার জন্য লেখা হয় নাই! কোন কোন কর্মশালায় বই কিছু কিছু ছাপা হয়েছে, কোন কর্মশালার একেবারেই হয় নাই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পক্ষে এর মত লজ্জাজনক অযোগ্যতার পরিচয় আর কিছু হতে পারে না।

প্রকৃতি-পাঠ

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

প্রাতর্ভ্রমণ সেরে হ—বাবুর বৈঠকখানায় যখন প্রবেশ করলাম, তখন আড্ডাটি বেশ জমে উঠেছে। কা—দা দ্বিতীয় কিস্তি সেবুর রস দেওয়া চায়ের বাটিটা শেষ করে তাঁর আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের সাহায্যে পাকাচ্ছেন ও পাক খুলছেন; অধ্যাপক শ—বাবু অন্যমনস্কভাবে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে গণিতের একটা বিশেষ সমস্যা পূরণ করতে ব্যস্ত। লাহিড়ী মশায়, বি—দা এবং হ—বাবু স্বয়ং একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে তর্কে প্রচণ্ডভাবে মেতে উঠেছেন;—তাঁদের উৎসাহের প্রাবল্য আমাদের সর্বজনীন স্নেহাই মশায়কেও স্পর্শ করেছে, সেই নিরীহ ভদ্রলোকও থেকে থেকে ফোড়ন দিচ্ছেন। অনেক দিন পরে সুদূর প্রবাস থেকে ছুটিতে দেশে ফিরেছি। আমাকে দেখে তাঁরা সকলেই কোলাহল করে স্বাগত করলেন,—কা—দা তৎক্ষণাৎ আর এক পেয়ালা "লে—চা" (লেবু মিশ্রিত চা) বলে হাঁক দিলেন: আমি চায়ের বাটি চেয়ারের পিঠে ভাঁজ করে রেখে আসন পরিগ্রহণ করলাম।

কা—দা জানতে চাইলেন, এখানে আসবার সময় সামনের বাড়ীর রোয়াকে আমি কি এত মনোযোগ করে পর্যবেক্ষণ করছিলাম।—এমন কিছু বিষয় নয়, তবু লক্ষ্যণীয়। দুটি ছোট ছেলে কোথা থেকে একটি টিনের কৌটা যোগাড় করে তাতে মাটি ভরে একটা তেঁতুলের গাছ পুঁতবার চেষ্টা করছে। তেঁতুল বীচিটা রাস্তার ধারে কোথাও পড়েছিল, আপনা থেকেই তাতে গাছ বেরিয়েছে। বাচ্চা দুটির গাছ করবার সে কি অসাধারণ উৎসাহ! মাটি ধরে ভাঙছে, জল ঢালছে, সোহা তৈরী কতভাবে গাছটাকে বসাচ্ছে। কা—দাকে তাই বললাম।

কা—দা আজীবন পল্লীগ্রামেই কাটিয়েছেন,—আজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বনকারী এই নীরস কর্মীর মন শিশুর মতই সরস। তাই আমার মনের কথাটা ধরে ফেলতে তাঁর বিন্দুমাত্র দেরী হল না। কলকাতা সহরের ইট কাঠ পাথরের মধ্যে তেঁতুল চারাটা এই শিশুগুলির কাছে প্রকৃতির প্রতীক,—এই ছোট্ট চারাটা তাদের মনে নীল আকাশ, সবুজ প্রান্তর, শ্যামল বনানীর রঙ ধরিয়ে দেবে। তিনি বললেন, —সত্যি, আমাদের শিক্ষাধারাটা বড্ড যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। আমরা প্রকৃতিকে বর্জন করে এতবার চেষ্টা করছি, অথচ মুস্কিল না এতে আমাদের শিক্ষা কত অসম্পূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, ছেলেবেলাকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। বৈশাখের বিকাল, খুব খানিকটা জল বড় একটু আগে হয়ে গেছে, এখনও গাছের পাতা থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে জল ঝড়ে পড়ছে। মোড়ের রুক্ষচূড়া গাছটা ফুলে ও কুঁড়িতে ভরে উঠেছিল—ঝড়ের চোটে তার ভাঙা ডাল, পাতা, কুঁড়ি ও ফুলে সমস্ত গলিটা ছেয়ে গেছে, আর আমাদের তেতলার সিঁড়ির ভাঙা সার্শিটা দিয়ে উড়ে এসে অজস্র পাতা, কুঁড়ি ও ফুলের পাপড়ি সিঁড়ি ও সিঁড়ির চাতাল ভরিয়ে তুলেছে। আমরা খেলা ফেলে সে গুলো কুড়োতে লেগে গেছি। ঠিক সে দিনই আমি প্রথম ভাগের "বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল, ছোট পাতা" পড়া সুরু করেছি। সে দিনের কালবৈশাখী আর রুক্ষচূড়া গাছের পাতা ও ফুল আবার স্মৃতিতে "বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল,

ছোট পাতাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেছে, ওই কটি কথা মনে পড়লেই সেই কালবৈশাখীর বিকাল বেলা সঙ্গে সঙ্গে মনে উদয় হয়।

স্কুলে যখন নীচের ক্লাসে পড়তাম, আমাদের ক্লাস ঘরের পাশেই "—" বন্ধুদের বাগান ছিল। কলিকাতা সহরের বুকের উপর অত বড় বাগান এখন তো খুবই কম আছে—তখনকার দিনেও কম ছিল। দুঃখের বিষয়, ক্লাস ঘরের জানলার সামনেই ওঁদের সহিসের ঘর ও ঘোড়ার আস্তাবল ছিল এবং বাকী জায়গাটা ছেলেদিগের বাঁদরামির হাত থেকে বাঁচবার জন্য লম্বা লম্বা বেড়া ছিল। কাজেই ক্লাস ঘর থেকে কিছুই দেখা যেত না। কিন্তু কতকগুলি পাম গাছ, একটা করবী গাছ আর একটা অন্য কি গাছ লম্বা ডালিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল—নীল আকাশের গায়ে সেগুলোর ছোরা বোলানো মাথার দিকে চেয়ে থাকতে আমাদের কি যে ভাল লাগত কি বলব! তাদের দিকে চোখ থাকতে গিয়ে অনেক নিগ্রহও সহ্য করতে হয়েছে; পড়া মুখে যাওয়ার জন্য মার, অমনস্ক থাকার জন্য বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো, 'হাঁ করে কি দেখছি' বলে তিরস্কার! তবুও সেই গাছগুলোর মাথা দোলানো ডাক আমাদের শিশুমনকে যে ডাক দিত তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার।

আর একটু উপরের ক্লাসে উঠতে দোতলার যে ঘরে বসতাম, সে ঘরটা ঠিক ওই বাগানের উপরেই ছিল, কাজেই অন্যমনস্ক চোখে প্রকৃতির খেলা দেখার আর কামাই থাকত না। এই ক্লাস থেকে পড়া-বলার বালাই অনেকটা কমে গিয়েছিল; যে কয়জন শিক্ষক তবুও পড়া বলতেন, তাঁদের ঘণ্টাটা সামলে সুমলে গেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকা যেত। মাঝে মাঝে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই ঢুকে একটু গোলমাল করতেন, এবং আমাদের মত ভাল ছেলেরা সামনের বেঞ্চি ছেড়ে পিছনে বসি কেন এ বিষয়ে নানাবিধ আশঙ্কা প্রকাশ করে কের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি চলে গেলে কুড়ুৎ করে কের নিজের জায়গায় চলে যেতাম। এই ক্লাসেই প্রথম ছেলেদের কবিতায় পড়ি,

—"হায়রে, প্রকৃতি সনে মানুষের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি!"

কিছুদিন আগে আমার কর্মক্ষেত্রে একটা স্কুলের নূতন ব্লকের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়ে ছেলেবেলাকার ওই স্মৃতির টুকরাগুলি মনে এসেছিল। স্কুলটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এদেশে বাঙালীদের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। এর খ্যাতি ব্যাপক এবং ছাত্র সংখ্যাও প্রচুর। সম্প্রতি এটাকে কলেজে পরিণত করার একটা প্রচেষ্টাও চলছে। এখানে ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে আলাদা ব্লক নির্মাণ না করলে স্থানের আর সঙ্কুলান করা যাচ্ছিলনা। নূতন ব্লকটি এখন স্কুলের প্রাইমারী বিভাগের চাহিদা মেটাবে। ব্লকটি স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচেষ্টা ও সংগৃহীত অর্থে নির্মিত। তাই স্থানীয় প্রায় সকলেই এই উৎসবে এসেছেন। সকলেই হর্ষোৎফুল্ল। ভবনটিও সুনির্মিত এবং আসবাবপত্রের ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়।

এই সহরে যুদ্ধোত্তর এবং দেশবিভাগোত্তর ঘটনাবলীর ফলে স্থানাভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। স্থানাভাবে কর্তৃপক্ষের যেমনটি ইচ্ছা ছিল তেমনটি তাঁরা স্কুলভবনের বন্দোবস্ত করতে পারেন নি।—তাঁদের ইচ্ছা ছিল একটা খেলার মাঠ থাকবে, প্রিন্সিপ্যালের ঘরের পিছনের মাঠটুকুতে একটা ছোটখাট বাগান থাকবে, আর পূর্বদিকের অংশে একটা ব্যায়ামশালা থাকবে। পূর্বদিকের অংশে খেলার জন্য একটুখানি ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে,—তাতে কষ্টেসৃষ্টে একটা ব্যাডমিণ্টন কোর্ট করা যেতে পারে; খেলার মাঠের জন্য পর্যাপ্ত স্থান পাওয়া যায়নি, সুতরাং সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত। আর প্রিন্সিপ্যালের ঘরের পিছনেই এই ব্লকটি নির্মিত হয়েছে। চারদিকে তেতলা চারতলা বাড়ী স্কুল-বাড়ীটাকে বুক চেপে আছে—কাছে পিঠে একটা সরকারী পার্ক পর্যন্ত নেই। এর মধ্যে উদ্যান-বিলাসের জায়গা কই? তবু, প্রিন্সিপ্যাল মশাই কন্ট্রাক্টরের চারধারে গাছ লাগিয়ে একটুখানি বাগানের বন্দোবস্ত করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : মাঘ, ১৩৬৫

সূচী

আলোচনা ৩৩
সেই শিক্ষা ৩৪
প্রকৃতি পাঠ ৩৭
[শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]
স্মৃতি-তর্পণ ৪০
[রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী]
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা
[শ্রীসুশীলকুমার দাশগুপ্ত] ৪২
পারিজাত ৪৪
[শ্রীহরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য]
সঙ্কলন— ৪৮

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্তিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৬৫ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনা

ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলিকাতা সহরের ও আশেপাশের কলেজগুলিতে পড়িতেছে এমন ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপর্ষদ ৪টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী ২০শে মার্চ হইতে চিকিৎসার কাজ সুরু হইবে। একটি থাকিবে উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে মহারাজা মণীন্দ্র কলেজ ভবনে। একটি মধ্য কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে, একটি দক্ষিণ কলিকাতা আশুতোষ কলেজে. চতুর্থটি থাকিবে, বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে। ইহাই হইবে মূল অথবা কেন্দ্রীয় ক্লিনিক। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া সম্ভব নয় এমন কোন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয় ক্লিনিকে আসিবে এবং সেখানেই তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে। বিকালের দিকে ৪টা তিনেক ঐ ক্লিনিকগুলিতে কাজ হইবে। চিকিৎসার জন্য যাইতে হইলে যথাযোগ্য পরিচয়পত্র সঙ্গে লইতে হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চক্ষুরোগ দন্তরোগ স্নায়ু-ভাবজনিত দুর্বলতা ইত্যাদি নানারোগের অভাব তো নাই, বরং আধিক্য দেখিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। অভিভাবকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগ সুবিধা ও অর্থের অভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন না, অনেক সময় অজ্ঞতাও সময়মত চিকিৎসার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপরিষদ কলেজগুলিতে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসা যে যুব-সম্প্রদায় তাহাদের একটি প্রকৃত কল্যাণসাধন হইবে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

সর্বত্র সর্বপর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষা

ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালের মধ্যে দেশের সর্বত্র এবং সকল পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু একথা দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি কর্তৃপক্ষের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালেই চালু হইবে।

শিক্ষার্থীর সমষ্টিগত উৎকর্ষ

সম্প্রতি ব্রিটিশ মিশন, ডিউক অফ্ এডিনবরা বিজ্ঞানকংগ্রেসে যোগ দিতে আসিয়া ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং দেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন। অনাড়ম্বর ব্যবহার ও অনাড়ম্বর গতি-বিধি তাঁহাকে অনভিজ্ঞ করিয়াছে। তরুণ মনের সম্ভাবনা ও বিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি মতামত এখানে উল্লেখ করা গেল।

তাঁহার মতে অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে অনেক গুণ থাকে যাহা বিদ্যালয়ে পাঠ্যকালে স্ফুরণের সুযোগ পায় না, ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনে একটা অবসাদ ও ব্যর্থতা সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েদের বিকাশের পথে এই বাধা দূর করিবার ও সুপ্ত গুণগুলির স্ফুরণের সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি কয়েকটি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বলেন। এই পুরস্কার গতানুগতিক ভাবে পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হওয়ার জন্য নয়। এই পুরস্কার কতকগুলি গুণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বীকৃতি।

তিনি ৮ হইতে ১৫, ১৪ হইতে ১১, ১৬ হইতে ১৯ বৎসর বয়স্ক, এই তিনটি পর্যায় করিয়াছেন। প্রতি পর্যায়েই ৪টি বিভাগ আছে। ১। সমাজ সেবা ও দুর্গতের উদ্ধার। ২। শিক্ষামূলক ভ্রমণ; ৩। বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন ও ৪। শরীরের স্বাস্থ্যচর্চা। এই সব পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা থাকিবে না। কে কোন স্থান অধিকার করিল তাহা দেখা হইবে না, একটা নির্ধারিত মানে পর্যন্ত পৌঁছিলে সকলেই পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। আর সেই মান খুব বেশি উঁচুও নয়। বরং সাধারণ ছাত্র ছাত্রীর কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের আয়ত্তের ও সাধ্যের মধ্যেই রাখা হইয়াছে। ছাত্রের চাই নিষ্ঠা অভিনিবেশ ও চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি। সর্বতো-মুখী দৃষ্টি ও অভিনিবেশ এই দুইটি গুণ যে ভাবীর চরিত্রগঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়।

এক একটি বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা করিলে এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য চোখে ধরা পড়ে। প্রথম বিভাগে যে দুর্গতের উদ্ধার ও সমাজসেবার কাজ করিতে হইবে, তাহা ছেলেমেয়েদের সেবার ভাব ও সামাজিক দায়িত্ব শিখার জন্য। এই বিভাগে ফার্স্ট এইড, দুর্ঘটনা নিবারণ, জীবনরক্ষা, রোগীর সেবা, পশুপাখীর যত্ন, অন্ধ আতুরকে সাহায্য ইত্যাদি কাজ শিখিতে ও হাতে কলমে করিতে হইবে।

পরিভ্রমণ তরুণ চিত্তকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে। তাহাদের ভিতরকার অ্যাডভেঞ্চারস্পৃহা তাহাদের অনেক কষ্ট সহিতে ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে শক্তি দেয় ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নীরস একঘেয়েমির হাত হইতে মুক্তি দেয়। এই পরিভ্রমণের যদি শিক্ষামূলকভাবে ব্যবস্থা করা হয় তবে আনন্দময় পরিবেশে সমষ্টিগত জীবনযাপনের অভ্যাস তাহা-দিগকে অনেক অসুবিধা ও অপরিচিত অবস্থার মধ্যেও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ছোট ছোট সুখসুবিধা ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিবে। এগুলি অনেকটা বয়স্কাউট বা গার্ল গাইড ক্যাম্পের জীবনের মত। এই পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর নেতৃত্বগুণটিরও বিকাশ সাধন হইবে।

তৃতীয় বিভাগে বিশেষ কাজে উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা—ইংরাজিতে যাহাকে Hobby বলে তাহার বিকাশ। কত ছেলেমেয়ের কতদিকে ঝোঁক ও নিপুণতা থাকে, পাঠ্যক্রমের বাহিরে সেই সব দিকের চর্চা করার মত অবসরসময় বাপমের এমন সঙ্গী আর নাই। ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে ইহা সুযোগ দান করে, অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং ঐ বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষার্থী প্রচুর লাভবান হয়!

আর শরীরের উৎকর্ষের জন্য যে বিভাগটি রাখা হইয়াছে তাহার আবশ্যকতার কথা তো বলিবারই নয়। একটি সাধারণ মান সম্মুখে রাখিয়া শরীর চর্চা করিতে হইবে, সেই মানে পৌঁছিলেই স্বীকৃতি পত্র লাভ করিবে। কাহারও সহিত তুলনায় নয়,

নিজের স্থান নিজের হাতে। কোন ছাত্র বা দলকে এই পুরস্কার লাভ করিতে হইলে সবগুলি বিভাগের কাজ দেখাইতে হইবে।

আজকাল সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই অল্প বিস্তর এই সব শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কাজে কতটা হয় জানা নাই, তবে আদর্শগত ভাবে বিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় ইহাদের স্থান আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনায় যে বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মনে লাগিল তাহা হইল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বদলে সাধারণভাবে একটা মান পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পৌঁছাইয়া দেওয়া। যাহাতে সমষ্টিগত ভাবে সকল ছাত্রছাত্রী নিজেদের উন্নতি সাধন করিয়া দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

পুস্তকের উপর বিক্রয়কর বন্ধ হইল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার উপর হইতে বিক্রয়কর উঠাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুস্তকব্যবসায়ীদের অসুবিধা সুবিধার কথা আমরা এই পত্রিকায় আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু কত ছাত্র যে পয়সার অভাবে পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারে না, দিনের পর দিন নামমাত্র অনুবিধার জন্যে কখনও পরের বই ধার করিয়া পড়ে, কখনও বই না কিনে পারার ক্লাসে শিক্ষকের তিরস্কার ভোগ করে, গৃহে আসিয়া পিতামাতাকে ব্যর্থ মিনতি জানায়, তাহাদের কথা ভাবিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি। বইয়ের দাম এতদ্ কিছু কমিলে ছাত্রের ও অভিভাবকের মত দুর্ভাবনা কিছু কম হইবে।

স্বর্গীয় এম, আর, জয়াকর

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে পরিণতবয়সে শ্রীজয়াকরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জীবনের প্রারম্ভে শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী ছিলেন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারূপে, দেশের সেবক হিসাবে, ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তিনি সকলের সুপরিচিত। দেশ জীবনে অনেক বৎসর তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে প্রদেশের শিক্ষাবিস্তার ও তাহার সংস্কারের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন দেশকে নানাভাবে সেবা করিয়া তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

সেই শিক্ষা

চল্লিশ বৎসরেরও আগের কথা। গান্ধীজী কয়েক দিনের জন্য চম্পারণ হইতে সবরমতী আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া চম্পারণেই যাইতেছিলেন। আমেদাবাদ স্টেশনে গাড়িতে উঠিতে হইবে, তাহার জন্য কোচরব আশ্রম হইতে ভদ্র পর্যন্ত দেড়মাইল হাঁটিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার নিজের হাতে কিছু পোঁটলা পুঁটলি আছে, আর কিছু দিয়াছেন প্রফুল্লদাস গান্ধীর হাতে। তাহাকে সঙ্গে নিয়াছেন, সে ভদ্র পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। ১৯১৮ সনের প্রথম দিক। খুব ঠাণ্ডাও নাই, পথ চলিতে কষ্টও কম নয়। গান্ধীজী লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়াছেন এবং খুব জোরেই চলিয়াছেন। তবে মৌন, মুখ দিয়া একটা শব্দও বাহির হইতেছে না, যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু প্রফুল্লদাসের আর ধৈর্য রহিল না। এই তো ভদ্র আসিয়া পড়িল, এই রকম সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। সে তাহার মনের ব্যাকুল ভাব ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় জানাইল।

আমার ষোল বৎসরেরও বেশি বয়স হইয়া গেল। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িতে পারিলাম না। আমার চেয়ে যাহারা বয়সে কম তাহারা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া গিয়াছে, কোথাই সবরে মাসে একশ টাকা রোজগারও করিতেছে। টাকা রোজগারের কথা বলি না, সেদিকে আমার লক্ষ্য নাই, কিন্তু লোকেরা অবজ্ঞা করে। সেদিন আমার মামাই বা-তা বলিয়া ফেলিলেন। কত বলিলেন, তুই মূর্খ হইয়া ঘুরিস কেন, কিছু পড়াশুনা কর্। সত্যবত কাপড় চোপড় পরিতে শেখ্। খেঁয়ো হইয়া থাকিলে পদে পদে মা খাইবি। দেশে মামা উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার কথা যাহাকে শুনিতেও হইল। কিন্তু বাড়ীতেও যে ঠাকুমা কম কথা শোনান না। তুই যে ইস্কুলে যাবার নাম করিস না, এখন তো বাপ্ বাপ্ করিয়া মরিতেছিস্, চিরকাল তোর পেট ভরাইবে কে?

গান্ধীজী চুপচাপ শুনিয়া গেলেন। তাঁহাকে চুপচাপ দেখিয়া প্রফুল্লদাসের সাহস বাড়িয়া গেল। সে বলিয়া চলিল, আমার এমন কিছু জেদ নাই যে আমাকে ম্যাট্রিক পাশ করিতেই হইবে। আর আপনি যদি আশ্রমের ছেলেদের পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচাইতে চান, তবে আমি এই পথ ছাড়িয়াই দিব। কিন্তু কিছু কিছু পড়াশুনা নিয়মিত করা তো চাই। যদি আপনি আপনার কাছে বসিয়া পড়াইতে না পারেন, তাহা হইলে অন্য একটা ব্যবস্থা করুন। বড় হইলে লোকে যে আমাকে মূর্খ বলিবে, যে সমাজে যাইব সে সমাজে মুখ দেখান কঠিন হইবে। এই রকম দুর্দশা হইতে তো আমাকে বাঁচাইবেন! গান্ধীজি উত্তরে ধীরে ধীরে গভীর স্বরে বলিলেন, আমি চাই যে এই লেখাপড়া আর নামের জন্য পরীক্ষার হাত থেকে তুমি বাঁচ। আমার কথা যদি চলে তবে অন্য কেহই এই সারহীন লেখাপড়ার ফাঁদে যাতে ভাসিয়া না যায় আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি তো উহার মধ্যে কিছুই ভাল দেখিতে পাই না। ম্যাট্রিকের কথা কি বলিস্, বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিলেও ঐ পরীক্ষার ভিত্তিতে তোকে আমি দেখিব না। ছোট বড় সব লোকের তো দাম হইল তাহার চরিত্র, যে যাহা বলুক গ্রাহ্যের মধ্যে আনিস্ না। তুই যদি চরিত্র গঠনের শিক্ষা পেয়ে থাকিস্, তবেই তোকে বলিব বুদ্ধিমান। সারা জগতে লোকে তোকে চালাক বলুক, তার চেয়ে ভাল হবে যদি তুই সচ্চরিত্র, সুশীল ও সত্যনিষ্ঠ হতে পারিস। আশ্রম-

জীবনের শিক্ষা পুরোপুরি গ্রহণ কর, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলস্য না করে দিন কাটিয়ে যে। অবসর মত আশ্রমবাসী শিক্ষিত লোকেরা অন্য বিষয় বা মামুলি শিক্ষা দিতে পারবেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস, আর নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা কর যাতে সত্যদর্শী হতে পারিস্। এই হইল আমার শিক্ষা। শেষে দেখবি, সমাজেও তোর জন্য ভাল স্থান রয়েছে। লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই, তুই দেখবি সকলেই তোকে সম্মান করে, যদি তুই সত্যের পথ খুঁজিস্, চরিত্রকে বলিষ্ঠ করিস। আজ তো আমাদের সমাজে এত নীচে নড়ে গেছে যে ভাল লোক খুঁজলেও পাওয়া যায় না।

বাপুজী এই কথা এত গভীর ভাবের সঙ্গে, এত বাৎসল্যের সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে প্রভুদাসের নয়ন ব্যাকুলতা দূর হইয়া গেল। ভক্তের সেই ধন্যাধরের নীচে যখন তাঁহার উষ্ণীষ গাখিলা। উহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন, তখন প্রভুদাসের মত সুখী আর আনন্দিত কে? কোচরব পর্যন্ত দেড়মাইল রাস্তা সে ভাবিয়া আসিল চরকা কি করিয়া নিজেকে সুশীল সচ্চরিত্র সত্যদর্শী করিয়া তুলিবে, বাপুজীর সন্তোষ হইবে?

বিশ বৎসর পরে প্রভুদাস গান্ধী লিখিতেছিলেন, এক দিনও মনে পড়ে না যে পরীক্ষা পাশ না করিবার জন্য আক্ষেপ হইয়াছে। যদি আক্ষেপ হইয়াছে তবে তাহা চরিত্রের দুর্বলতার জন্য।

প্রভুদাস গান্ধীপরিবারের একজন। তিনি একজন পুরানো গঠনকর্মী। তিনি গুজরাতি ভাষার একজন সুলেখক, চিঠিপত্রেও তাঁহার রচনাশক্তি যথেষ্ট সুন্দর। প্রকৃতিবর্ণনা ও মনোবিশ্লেষণে তাঁহার রচনার সুখ্যাতি সমালোচকেরা করিয়াছেন।

— — —

প্রকৃতি পাঠ

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনে হচ্ছে, আমাদের জীবনযাত্রা এখন বাস্তিক যুগে এসে পৌঁছেচে; এখন সময় এসেছে যখন আমাদের চিন্তাশক্তিকেও যেন যন্ত্রের সাহায্যে চালালে ভাল হয়। তার মধ্যে ফুলপাতা পাখীর কল্পনা করলে লোকে হাততালি দিয়ে পাগল বলবে। বলবে, কবিতা কল্পনা এসব inconsistencyর লক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞান পড়তে পড়তে আমরা এত exact হয়ে আসছি যে একটু inconsistency না আদলে আমাদের মনের মৃত্যু হতে আর বেশী দেরী নেই,—লোহার জুতোর ভিতর চীনে মেয়ের পায়ের মত অতি আধুনিক বিজ্ঞানের চাপে এরি মধ্যে আমাদের মন আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত ও বিকৃত হয়ে গেছে, সহরের স্কুলগুলিতে তাই যেন একটু গাছপালার জায়গা রাখলে ভাল হয়—একটুকু মনের আনন্দের খোরাক জোটে।

লাহিড়ী মশাই বললেন,—কিন্তু এই কলিযুগে উন্মুক্ত প্রকৃতি কোথায় পাব যে তার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করব? এই সহরে, শুধু এই সহরে কেন, যে কোনও সহরে, এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। লোকে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসবার শোবার জায়গা পাচ্ছে না—এর মধ্যে বাগান রেখে কি করে স্কুলবাড়ী বানাব?

অধ্যাপক শ—বাবু বললেন, রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে আশ্রম করেছিলেন যাতে আসল শিক্ষাটা ছেলেরা পায়। কেড়ে নিয়ে প্রকৃতি যা শিক্ষা দেন তা-ই প্রকৃত শিক্ষা, সভ্যতার কৃত্রিমতায় একথা আমরা ভুলে গিয়েছি। খোলা মাঠে গাছের তলায় ছেলেরা যা শিখত, অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জামশোভিত জীবাণু সংহারক উৎকট গন্ধবিরাজিত ক্লাসঘরে আজকার ছাত্ররা তার চেয়ে যে বেশী কিছু শিখছে তাতো মনে হয় না।

বেহাই মশাই বললেন,—আরও একটু যান না কেন এগিয়ে? প্রাচীন কালের কথাই ভাবুন না কেন। তপোবনে···বনস্পতির ছায়ায়···গুরু শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন—সেই ছবিটা মনে করুন দেখি! রবীন্দ্রনাথ কি সেই ছবি মনে করে শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন নি?

বি—দা বলিলেন, আর সেই শিক্ষায় শুধু আমাদের মনই যে গঠিত হত তা নয়, স্বাস্থ্যের উন্নতিও হত, এক কথায় সুসমঞ্জস সর্বাঙ্গীন শিক্ষার পুরা বন্দোবস্ত থাকত। গান্ধীজির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আধুনিক শিক্ষার দোষ দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, দেহ, মন এবং আত্মার বিকাশ এই শিক্ষায় হয় না—এটা একটা প্রাণহীন নকল শিক্ষা। তাঁরও মত ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করে উঠুক, যাতে দেহ, মন ও আত্মা তিনটেরই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা হয় তার বন্দোবস্ত হোক। বাস্তবিক, শিক্ষা এমন হবে যে শিশু প্রকৃতিমাকে ভালবাসবে, প্রকৃতিকে ভালবাসবার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শ্রমের মর্যাদা বোঝে, মনের উৎকর্ষ সাধন করবে এবং আত্মার বিকাশ ঘটাবে। আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছি এই কথাগুলো ভুলে গিয়ে, আর তাই পাশ্চাত্যের নকল করতে গিয়ে স্বখান্ত সলিলে ডুবে মরছি। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার চটকটা বড় নয়নমুগ্ধকর, তাই তার দোষটা চাকা পড়ে যায়। আস্তে আস্তে তার চটকটা এবার খুলে যেতে সুরু করেছে—উপরের এই লাগামো আবরণ সরে গিয়ে মৃত্যুর করাল রূপটা এবার ধরা পড়বে। তাই 'পাও ফিরে এ সভ্যতা' বলে আবার আমাদের প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করলে শান্তি নেই, বোধ হয় সুখও নেই।

লাহিড়ী মশাই বললেন,—যাননাম আপনাদের সব কথা, প্রকৃতির মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে যে শিক্ষা পাই তার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র থাকে না; সেই শিক্ষাই হয় প্রকৃত শিক্ষা। বৈদিক যুগের তপোবন, মুনো রামনাথের ভেঁতুলতলা, এবং আধুনিক কালে গান্ধীজীর আশ্রম ও শান্তি-নিকেতনের শিক্ষাভবন সেই কথার ভাস্বর সাক্ষ্য। এ কথা যে আমি মানি না, তা নয়, মনে প্রাণেই মানি। কিন্তু যুগ যে আলাদা যুগধর্মের যে তফাৎ! ঠিক সে যুগের চালে এখন কি আমরা চলছি না চলতে পারি?—বা যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, চলা উচিত? এখন বিজ্ঞান শেখাতে হবে, হাতে কলমে কাজ কারবার শেখাতে হবে, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে, সুতরাং তার জন্য ঘরদোর সাজসরঞ্জাম সব কিছুই চাই। আগে আমরা শিখতাম জ্ঞানের জন্য, এখন শিখি পেটের ভাতের জন্য। তখনকার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে এখনকার আণবিক পরমাণবিক যুগে চলবে কেন? পেটে ভাত থাকলে অথবা পেটের ভাতের চিন্তা না থাকলে, কল্পনাবিলাস শোভা পায়। এখন পেটের ভাতের চিন্তাই মুখ্য—কাজেই যাতে সেটার যোগাড় সহজে করতে পারি শিক্ষার ব্যবস্থা এমনই করা উচিত, তার জন্য প্রয়োজন হলে প্রকৃতিকে একটু আধটু নির্বাসন দিতে হবে বইকি। এখন প্রয়োজনের চিন্তাই বড় চিন্তা, প্রয়োজনের তাগিদেই প্রকৃতির কোলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। আগেকার দিনে মুনো রামনাথ জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় যেন আলো করেছেন, কিন্তু এখনকার দিনে তাঁকে সম্রদ্ধ

প্রণাম জানিয়ে বলব তাঁর স্থান নেই, কারণ তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন ও যে শিক্ষা নিয়েছিলেন, সেই শিক্ষায় এযুগে শতকরা ষোলটি লোকের অন্ন জুটবে না। তাই বসের মধ্যে গাছের তলায় টোলের চেয়ে এখন প্রয়োজন ল্যাবরেটরী কমনরুম—থিয়েটার প্রভৃতি সম্বলিত বিদ্যালয়ভবন, এর জন্য বাগান কেটে সাফ করতে হয়, তাও করতে হবে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সমুদ্রের দেখা না পেলে মনটা হাঁপিয়ে ওঠে—ইটকাঠের স্তূপের ভিতর মন আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য মাঝে মাঝে Outing-এর বন্দোবস্ত কর—দু'চারদিনের জন্য পল্লীগ্রামে ছাত্রদের নিয়ে যাও, যাতে দু'চারদিন ছুটি পেয়ে তারা প্রাণ খুলে হুল্লোড় করতে পারে মুক্ত প্রকৃতির বুকে।

আমি বললাম,—তাহলে লাহিড়ী মশাইও প্রকৃতির প্রয়োজন অনুভব করেন! আমাদের বক্তব্যও ঐটুকু—আমরা একথা বলছিনা সেই প্রাচীন যুগে ফিরে চল,—নিভৃত নিকুঞ্জে আম্রতলে শিষ্যপরিবৃত গুরুর কল্পনা আমরা কেউ করছিনা। আমরা অতি আধুনিক যুগের বর্তমান প্রয়োজনকে মেনে নিয়েছি, ল্যাবরেটরী-কমনরুম-লেকচার থিয়েটার অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। শুধু এই কথা বলি, এর জন্যে আজিনা, আনাচে কানাচে একটু আধটু জায়গা কি পাওয়া যায় না, যেখানে দুটো ফুলের গাছ পোঁতা যায়—যেখানে শিশুদের বাগান করতে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া যায়? লোকে ফ্ল্যাট বাড়ীতে বাস করে বাগান করবার জায়গা না পেলে জানলার ধারে প্যাকিং বাক্স লাগিয়ে window box-এ ফুলের চারা লাগায়, আর এত বড় একটা স্কুল বাড়ীতে দুটো গাছের টব রাখবার জায়গা নেই? আর লাহিড়ীমশাই যে বললেন মাঝে মাঝে পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়ে এনে ছেলেপিলেদের মনে রঙ ধরাবার কথা,—আমিও ঠিক ওই জিনিসই একটু ছোট আকারে করতে বলছি। সারা বছরের পর কয়েকদিন পাড়াগাঁয়ে বাস—বছরের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দেবে, আর সারা দিনের পর প্রকৃতির একটু খানি সান্নিধ্য দিনের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দেবে। এই প্রসঙ্গে একটা স্কুলের স্মৃতি মনে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল, স্থানীয় মিশনারীদের দ্বারা চালিত। সহরের এই অংশে খ্রীষ্টানদের একটা কলোনীমত ছিল, তাঁদের শিশুরা এবং আসপাশে দু'চারটি বাড়ীর ছেলেপিলেরা ওখানে পড়ত। কলকাতা সহরে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেও স্থানের অসংকুলান কিছু কম ছিলনা। তবুও সেই একতলা স্কুলঘরের পাশে শিক্ষয়িত্রীরা সামান্য একটু জায়গায় ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলের শেষে ছেলেমেয়েরা সেখানে বাগান করত। তারা বাগান করতে যাবার সময় সারি বেঁধে গাইত—

'আয় রোদ কোথাও নাই,—
চল, বাগানেতে যাই।
এই আমার কলসী
তোমার খুরপি কোদাল ভাই?'

দৃশ্যটা যেন চোখের ওপর ভাসছে। শহরের মধ্যে থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, তা সে যত সামান্যই হোক, তাদের এভাবে হত। আমার তাই অনুরোধ, বিদ্যালয় তথা শিক্ষাকর্তৃপক্ষ যেন এই এতটুকু একরত্তি বাগানের বন্দোবস্ত রাখেন যাতে প্রকৃতির ডাক শিশুরা শুনতে পায়, বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করে।

কা—দা তাঁর হাতের আঙুলগুলি চিরুণীর মত দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে বললেন—ঠিক কথা। আমার আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে। অতি আধুনিক ছবি, অতি আধুনিক কবিতা আর অতি আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের ভাল করছে না মন্দ করছে তাও বিচার করবার সময় এসেছে। আমি প্রাচীন লোক, অতি আধুনিক ছবি বা কবিতা বুঝতে পারি না, সেগুলোকে যা মনে হয় লোকসমাজে না হয়

তা না প্রকাশ করলাম। কিন্তু প্রকৃতিকে না ভালোবেসে তাকে জয় করবার এই অন্ধ প্রচেষ্টার ফল কি শুভ হচ্ছে? আগে কল্পনায় চাঁদে যাবার কথা ভাবতাম না,—এখন হয়তো দুচার বছর পরে তা সম্ভব হবে। কিন্তু তাতে কি শান্ত হবে যদি হাইড্রোজেন বোমায় পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যায়? বিজ্ঞানের শুধু Dr. Jekyll এর মূর্তিটা দেখলেতো চলবে না, Mr. Hyde এর রূপটাও তো দেখতে হবে। সেইজন্যই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর কথা, তাঁদের অনুসৃত পথই এখন বাঁচবার ও বাঁচাবার একমাত্র উপায়। তাই—

তাঁর কথা শেষ না হতেই ই-বাবুর ইঙ্গিতে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী এসে উপস্থিত হল। আমরাও আপাততঃ আলোচনা ছেড়ে অধিকতর সার পদার্থের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

———

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীহরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী, পাঠভবন

দ্বিতীয় বর্গ (ক) দশম শ্রেণী, ১৯৫৯ বয়স ১৪

আজ একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে স্মরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। সেই পুরুষ শিক্ষাব্রতী স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এখানকার সকলেই তাঁহাকে জানেন ও প্রায় সকলেই তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। আমার অতি শৈশব হইতেই তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এক বৎসর বয়স হইতেই আমি শান্তি-নিকেতন-বাসী। সেই সময় হইতে নয় বৎসরের অধিক কাল আমরা তাঁহার প্রতিবেশীরূপে ছিলাম। সুতরাং আমার পাঁচ বৎসর বয়স হইতে একাদিক্রমে চারি বৎসর প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি কেবল আমাদের প্রতিবেশীই ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আমার পিতামহী ঠাকুরাণীর সমবয়স্কা, সেইজন্য আমার পিতৃদেব মহাশয় তাঁহাকে 'দাদা-মহাশয়' বলিতেন, আমিও তাঁহাদেরই নির্দেশে তাঁহাকে 'বড়-বাবা' ও তাঁহার পত্নীকে 'বড়-মা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম। সুতরাং তাঁহার পরিবারের সকলের সহিতই আমাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল।

যখন হইতে তাঁহার কথা আমার মনে আছে, তখন তিনি অতি বৃদ্ধ। এত বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার শরীরে ও মনে কিছুমাত্র আলস্য দেখি নাই। এই সময়েও তাঁহার নিয়মাদির তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। অতি ভোরে ঘুম হইতে উঠা তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ী ফিরিতেন। যখন তিনি বাড়ী আসিতেন, তখন সূর্যোদয় হইত। তারপর মুখহাত ধুইয়া আহ্নিক করিতে বসিতেন। আহ্নিক শেষ হওয়ার পর প্রতিদিন দুই এক অধ্যায় গীতা পাঠ করিতেন। যখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন তখনও এই গীতাপাঠের ব্যতিক্রম হয় নাই। তখন তিনি তাঁহার কণ্ঠস্থ গীতা আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। ইহার

পর তিনি জলখাবার খাইতেন। আধুনিক লোকেদের মত চা, পাঁউরুটী, বিস্কুট তিনি খাইতেন না। মুড়ির ঘুঁড়া, নারিকেলের সাড়ু, কিস্‌মিস্, কলা, পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং কিছু ছানা তাঁহার প্রাতরাশের উপকরণ ছিল। চা, সিগারেট প্রভৃতি কোন প্রকার নেশা তিনি জীবনে কোন দিনই করেন নাই। শুধু দুইবেলা ভাত খাওয়ার পর পান চিবাইতেন। জলখাবার খাইয়াই তিনি নিজের কাজে বাহির হইতেন। সাধারণতঃ এই সময়ে লাইব্রেরীতেই যাইতেন। দৃষ্টিশক্তি থাকার কালে তিনি নিজেই বই পড়িতেন, পরে তাঁহাকে অনেক বই পড়িয়া শোনান হইত। জীবনের শেষ সপ্তাহ অবস্থার দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই তিনি কোন-না-কোন বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। নিজে লিখিতে না পারিলেও তিনি বলিয়া যাইতেন ও অন্যেরা লিখিয়া লইতেন। লাইব্রেরী হইতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আধ ঘণ্টা সময় গায়ে সর্ষপ তৈল মাখিতেন। তাঁহার স্নানের জল সকাল বেলা হইতেই সূর্যালোকে রাখা হইত। বারান্দার ধারে বসিয়া সেই জলে তিনি স্নান করিতেন। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পান চিবানোই ছিল তাঁহার সমস্ত দিনের মধ্যে একমাত্র নেশা। খাওয়ার পর তিনি বিছানায় বেলাদ দিয়া একটু বিশ্রাম করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনান হইত। আমি যতদিন দেখিয়াছি, সকল দিনই 'বড়-মা' এই কাজ করিতেন। দিনের মধ্যে এই সময়ই ছিল তাঁহার একমাত্র বিশ্রামের সময়। বিশ্রামের পরে তিনি কোন বই পড়িতেন বা কোন প্রবন্ধ লিখিতেন। পরেও তিনি সেই সময় আদৌ কাটাইতেন না। অন্ধ হওয়ার পর হইতে তিনি এই সময়ে নিজে চিন্তা করিয়া কিছু বলিয়া যাইতেন ও অন্যেরা তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এইভাবেও তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনা রহিয়া গিয়াছে।

বিকালে রোদ পড়িলে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার প্রতিবেশী বাল্যকালীন আমার পিতৃদেবও এই ভ্রমণের সঙ্গী হইতেন। এই ভ্রমণে বাহির হওয়ার অভ্যাসটি জীবনের কোন সন্ধ্যায় দিনে বাদ যাইতে আমি দেখি নাই। অন্ধ হওয়ার পরেও সকালে সাধারণতঃ তাঁহার কোন কন্যা ও বিকালে অন্য কাহারও হাত ধরিয়া তিনি ভ্রমণ করিতেন। যদি কোনদিন বৃষ্টি অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতে না পারিতেন, তবে তাঁহার ঘরের বারান্দায় অতি দ্রুতবেগে পায়চারি করিতেন। ইহার ফলেই তাঁহার ভ্রমণের কাজ হইয়া যাইত। ভ্রমণের পর বাড়ী আসিয়া তিনি কাপড় বদলাইয়া আহ্নিক করিতে বসিতেন। প্রতিদিনই তিনি দুইবেলা ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাপড় বদলাইতেন। ইহা তাঁহার একটি নৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। সন্ধ্যার আহ্নিকের পর তাঁহাকে কোন বেশপরিবর্তন করিতে আমি দেখি নাই। তখন তিনি লোকের সহিত গল্পগুজব ইত্যাদি করিতেন। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তিনি রাত্রির আহার করিতেন। আহারের পর তিনি একটু পায়চারি করিয়া নিজের বিছানায় আসিয়া বসিতেন ও ঘণ্টাখানেক নানা পারিবারিক গল্প করিতেন। গল্পের সহিত অনেক উপদেশের বাক্য বলিতেন। আমার পিতৃদেবও এই সময় তাঁহার কাছে বসিতেন। ইহার পরে তিনি শয্যা গ্রহণ করিতেন। আমি যতদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি, ততদিন তাঁহার দৈনিক কার্যাবলীর একটি নমুনা দেখাইলাম। মিতাচার ও মিতাহারই তাঁহার সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন লাভের কারণ বলিয়া বোধ করি। একাশীবর্ষ ছয় মাস আঠার দিন বয়সে বিগত ২৮শে পৌষ মঙ্গলবার এই শান্তিনিকেতনেই তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহার প্রতিবেশীরূপে না থাকিলেও গড় সপ্তাহে একবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম।

তিনি একজন গৃহস্থ-যোগী, অতি সদাশয় ও পর-হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার গুণ-গ্রাম বুঝিবার মত ক্ষমতা আমার নাই। আপনার কীর্তিতেই তিনি বাঙালী হৃদয়ে স্থায়ী আসন রাখিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গীয়শব্দকোষ' ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত দুইখানি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি শিশুদের জন্য 'শিশুরঞ্জন সংস্কৃত প্রবেশ' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ শব্দিক বলিয়াই বাঙালী শিক্ষিত সমাজ জানেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণের তৎকৃত বাঙালা পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে কবিরূপে জানিবারও সুযোগ ঘটিবে।

আমার আরও একটি বিশেষ সৌভাগ্য যে, তিনিই তাঁহার নামের সহিত যোগ রাখিয়া আমার নামকরণ করিয়াছিলেন। আজ আমার বড় বাবার বিদেহী চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া এই তর্পণ সমাপ্ত করিলাম।

——

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারেরপ্রয়োজনীয়তা

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

শিশুই জাতির জনক। শিক্ষায় তাহার জন্মগত অধিকার। প্রতি শিশু কোন প্রতিভাযুক্ত। বৈশব শিক্ষার সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তাহাদের প্রতিভার বিকাশ। আমাদের দেশে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা চলিতেছে। অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে শিশুর ৭ হইতে ১১ বছরের মধ্যে সে যে শিক্ষা লাভ করিবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেই আদর্শে প্রেরণায়ই উদ্বুদ্ধ হইবে। সুতরাং অভিনব শিক্ষার সঙ্গে এই কয়বৎসরের শিক্ষাব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অধ্যয়নকাল ৬ হইতে ১১ বৎসর। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে। কিন্তু শিশুদের প্রতিভার যাহাতে উপযুক্ত বিকাশ হয়, নানা গুপ্ত বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, নানা গুপ্ত প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ পায়, সেবিষয়ে আমাদের কোন লক্ষ্য নাই। এত অল্প বয়সে শিশুমন অভিনব রুচি থাকে, তাহার প্রতিভা যে দিকেই থাকুক না কেন, বিকাশের সহায়তা না করিয়া জোর করিয়া বাধ্যবাধক প্রাথমিক শিক্ষার ছাঁচে তাহাদের গড়া হইলে শিশু প্রতিভার সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষার আনন্দ আর তাহারা পায় না। ফলে শিক্ষা কার্যকরী হয় না। বিদ্যালয়ে ধরাবাঁধা শিক্ষা ছাড়া শিশুদের অন্যকিছু জানিবার ও শিখিবার স্পৃহা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেইজন্য প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া গ্রন্থাগার রাখা প্রয়োজন। কারণ বাধ্যতামূলক পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সেখানে আনন্দ লাভের জন্য এবং অধিক জানিবার লোভে তাহারা অন্যান্য পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইবে। তাহাদের পড়িবার উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। ভয়ে ভয়ে পড়া আর মজা করিয়া পড়া এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ কত!

কেহ কেহ বলেন শিশুরা তো পড়তেই চায় না। কেবল খেলা খেলা। তাহাদের পড়ায় ইচ্ছা এবং

অভ্যাস জাগাইতে হইবে। শিশুরা খেলিতে ভালবাসে। শিক্ষক শিশুদের কাছে মজাদার গল্প করিয়া খেলার ছলে প্রথমে গ্রন্থাগারে আসার নেশা সৃষ্টি করিবেন তবে দেখা যাইবে, শিক্ষক যখন সুন্দর সুন্দর গল্প বলছি বলিয়া গল্প বলিতে আরম্ভ করিবেন শিশুরা ঠিক সেই সময়ে গ্রন্থাগারে আসিয়া হাজির হইবে। এরপর একটা মজার হাসির গল্প আরম্ভ করিয়া মাঝ পথে ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে শিশুরা বাকীটা শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিবে। এই অবস্থায় শিশুদের কাছে বইখানা দিয়া বলিতে হইবে "যদি তোমরা বাকীটা জানতে চাও তবে নিজেরা পড়ে নেও।" তখন দেখিবেন শিশুদের মধ্যে বই নিয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। এই রকম কয়েকখানা বইয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

১। ছোট রামায়ণ—উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

২। ছোটদের মহাভারত—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

৩। আবোল-তাবোল—সুকুমার রায়।

৪। হাই খাই—সুকুমার রায়।

৫। শিশু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬। ঠাকুরমার ঝুলি — দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

৭। ছবি ও ছড়া—শিশু সংসদ।

৮। গল্প আর গল্প—সুখলতা রাও।

৯। নিজে পড়—সুখলতা রাও।

১০। নিজে শেখ—সুখলতা রাও।

১১। ক্ষীরের পুতুল—অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

এই ভাবে ধীরে ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে শিশুমনে পড়িবার উৎসাহ ও আগ্রহ জাগাইতে হইবে। সাত হইতে এগার বৎসরের শিশুরা নিম্নলিখিত পুস্তক পড়িতে ভালবাসে।

১। জীবজন্তুর গল্প।

২। রামায়ণ মহাভারত ও রূপকথার গল্প।

৩। প্রকৃতির কথা।

৪। খেলাধূলার গল্প।

৫। ভ্রমণ কাহিনী।

এই জাতীয় পুস্তকাদি যথাসম্ভব শিশুদিগের গ্রন্থাগারে রাখা উচিত পুস্তকগুলির মলাট যাহাতে রঙীন ও ঝকঝকে হয় এবং ছাপার অক্ষরগুলি বড় বড় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগারে সুন্দর সুন্দর ছবির বই রাখিতে হইবে। শিশুরা ছবি দেখার জন্য বই নেয়। শিশুগ্রন্থাগারে যথাসম্ভব কম বাধ্যতামূলক আইন কানুন থাকিবে। একটা ঘরোয়া আবহাওয়া সেখানে বিরাজ করিবে। গ্রন্থাগারের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট করিবার জন্য গ্রন্থাগারটি নানাপ্রকার ছবি, পুতুল খেলনা দ্বারা সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

শিশুদের গ্রন্থাগারে আসবাবপত্র এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে শিশুরা সহজে ও আরামে বসিয়া পড়িতে পারে। শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে পড়ার নেশা জাগাইতে হইবে। সেই জন্য যিনি গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে থাকিবেন তিনি হইবেন অসীম ধৈর্যশালিনী, ধীর স্থির, জ্ঞানী, গুণী এবং তাঁহার হইতে হইবে সদা হাস্যময় ও প্রফুল্ল।

পড়ার আগ্রহ ও নেশা জাগাইলেই কার্য শেষ হইল না। নেশা জাগাইবার পর প্রকৃতি ও পরিবেশ বিচার করিয়া রুচির মান ধীরে ধীরে উন্নত করিতে হইবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী কয়েকমাস যাবত রূপকথা বা রোমাঞ্চকর গল্প পড়িতেছে। ইহাতে তাহার রুচি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এমত অবস্থায় শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিক অতিশয় সতর্কতার সহিত রুচি বদলাইবার চেষ্টা করিবেন। ছাত্রছাত্রীরা কি কি বই পড়িতেছে গ্রন্থাগারিকের তাহার হিসাব ও তালিকা রাখিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা তাড়াতাড়ি বই প [illegible]

কিন্তু পড়ার পর তাহাদের আর কিছু মনে থাকে না। এর কারণ তাহারা ভাল করিয়া অভিনিবেশ সহকারে পড়ে না, যাহা পড়ে তাহা বোঝে না। এ রকম পড়ার ফল প্রীতিপ্রদ হয় না। সেইজন্য শিশুরা যে বই পড়িল তাহা হইতে গল্প বলিতে বলিলে ভাল হয়। কবিতার বই হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিতে হইবে। তবে এই সমস্তই হাসিখুশীমনে করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, গ্রন্থাগারে পড়ার নেশা জাগাইতে মাসান্তে বা বৎসরান্তে যাহারা অধিক পুস্তক পড়িবে, গল্প বলিতে বা অতিরিক্ত পড়ার বই হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিবে তাহাদের পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের মারফতে নানাপ্রকার শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার পরিচালনার ভার দিতে হইবে। ফলে শিশুরা বেশ শিক্ষক হইবার সুযোগ পাইবে। শিশুশিক্ষাকে কতিপয় পাঠ্যপুস্তকের ভিতর সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিশুরা যাহাতে গ্রন্থাগারে অল্প বয়স হইতে নানা প্রকারের বই পাঠ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা লাভ করিবার সুযোগ পায়, দেশ ও জাতির কল্যাণকামী শিক্ষাবিদ্‌দের সেই ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

পারিজাত

শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

শীতের সোনালী রোদ্দুরে ঝাঁঝা পৃথিবী। গাছের আগায়, মুক্ত বাতাসে, ফসলের সবুজ ক্ষেতে সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত মায়ার খেলা! শিশুদের হাততালিতে বাতাসের কিরিঝিরিতে প্রাণ বিহ্বল হয়ে ওঠে, অনন্ত বিশ্ব-মানবের দুঃখ বেদনায় অন্তরের অন্তঃস্থলে আকুলি বিকুলি করে ওঠে।

মিছক একটা ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই পথে বেরিয়েছি ক্লান্ত শরীরমনকে দুঃখের হাত থেকে দু'দণ্ড নিষ্কৃতি দিতে। মেঠো পথ, রিক্ত চাষী, পাঁজরাবেরোনো বলদ, পরিত্যক্ত ঘর, জীর্ণ-কুটির, বাঁশবন, সবগুলোই একটা নতুনত্বের গন্ধ দিয়ে মনকে নাড়া দিয়ে গেল। সহরে আবহাওয়ায় বাঁধাছাদা যুদি বলে, যাপাঞ্জোকা হাসি হেসে বড়ই হাঁপিয়ে উঠেছি। বাংলার গ্রাম এই যে গ্রাম এর মর্মকেন্দ্রে লুকান রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনার খোরাক। ঐগুলো এত মিষ্টি ভাবানুভূতির ধারক ও বাহক তা আগে কখন ভাবিনি। বাংলার বৈশিষ্ট্যই এইখানে—এই দীর্ণ শীর্ণ ভাঙা-চোরা অবহেলার মধ্য দিয়েই প্রাণের শাশ্বত ভাবধারাকে বইয়ে নিয়ে চলেছে বিস্মৃতির কোন উদাসলোক হতে।

চলতি পথের মোড়ে দৃষ্টি হ'ল নব-ভারতের শিক্ষাধারার উৎসমুখ। শ্রীহীন পরিবেশে নিরানন্দের আওতায় জাতীয় কুসুম কোরকগুলোর বিকাশের ব্যর্থ প্রয়াস। বঞ্চনার আবরণে জীবনের অবসাদ করাকেই বলি উন্নতি, বলি শিক্ষা, বলি অগ্রগতি। চিন্তান্তরে অনেক দূর এসে পড়েছি। এবার থামতে হল। আনন্দমুখর শিশুদের দুর্বার আকর্ষণে এগুতে হল সেখানে। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, তবে সাধারণের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ পরিলক্ষিত হ'ল। দাঁড়াতেই কয়েকটি শিশু স্মিতমুখে নমস্কার করে পরিচয় নিল আমাদের। অতিথি জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্বারা আদরআপ্যায়ন করে কয়েক মিনিটেই আপন করে ফেলল। নানান আলাপ আলোচনার মধ্যে

আমরা ভুবে গেছি। কচি মনের কচিকচি প্রশ্নে আমন্ত্রের প্রচুর খোরাক পেল খুদুকুড়ো আমরা। কয়েকটি ছাত্র এরই মধ্যে নিয়ে এলো প্লেটে করে তাজা টমেটো, গুটিকয়েক মটরশুটি ও শাঁকালু। তারা এগুলি খেতে অনুরোধ করল। একজন ছাত্র বলল—দাদা! এগুলো কিন্তু আমাদের বাগানেই আমরা নিজ হাতে তৈয়ারী করেছি। সোনার ভাইদের সোনার হাতে দেওয়া জিনিষগুলো বড়ই উপাদেয় লাগল।

ছাত্রদের অনুরোধেই স্কুলের সবকিছু দেখতে বেরোলাম। সত্যি অবাক হতে হল ছেলেদের তৈরী বাগান দেখে। বিস্ময়ের সুরে শচীন জিজ্ঞেস করল—এ সব তোমরা করেছ!

—হাঁ দাদা আমাদের স্বেচ্ছাশ্রমে এসব হয়েছে। তবে আমাদের মাষ্টারমশায়রা আমাদের হাতে কোদাল তুলে দিয়ে বসে থাকেন নি, তাঁরাও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে খেটেছেন। কয়েক কাঠা জমিতে সবজীক্ষেত। সুন্দর পরিপাটি করে চাষ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজান রকমারি শাক সবজী। এমনই সুন্দর ও নিখুঁত দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বেশ। সন তারিখ মাস, কি কি সার ব্যবহার করে এইসব সবজীর উন্নতি সাধন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কাঁচা হাতে চার্ট তৈরি করা আছে। ছেলেদের বহুবিধ কর্মের আলের পরিচয় দেখে বিস্মিত হলাম।

ছেলেরাই বলল—এই উৎপন্ন শাক-সবজী বিক্রি করে আমাদের কিছু পয়সা হয়, তবে সে অর্থ গরীব ছেলেদের প্রয়োজনে খরচ হয়।

দামোদর পরিকল্পনার আদর্শ দেখে চমৎকৃত হলাম। স্কুলের পাশে আছে নলকূপ সেখান থেকে নালা কেটে জলধারা আনা হয়েছে ক্ষেতের মধ্যে।

৪র্থ শ্রেণীর একজন ছাত্র বোঝাতে লাগল "এই হচ্ছে দামোদর নদ। গ্রীষ্মকালে জল থাকে না, বর্ষাকালে এলো প্লাবন।" দেখি সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ছেলে কল পাল্প করতে লাগল আর কলের জল হড় হড় করে আসতে লাগল সেই নালা দিয়ে। "যাতে বন্যার বেগ ভেসে না যায় অথচ এই জলই আবার আমাদের উপকারে লাগে তারই জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে পর পর সাতটা বাঁধের। কাঠ ইট ও কাদার সাহায্যে নিখুঁত ভাবে তৈরি হয়েছে বাঁধগুলো। জলধারা থেকে কি উপায়ে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে তা রূপায়িত হয়েছে ছোট ছোট নালা কেটে সবজী ক্ষেতে বিভিন্ন বিভাগে জল সরবরাহ করে। এই বাঁধের আরও উপকারিতা সম্বন্ধে ছেলেরা জানাল। জল বিদ্যুৎ কুটীরশিল্প ও নতুন নগরের পত্তন প্রভৃতি নিয়ে এই আদর্শের কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। শিক্ষক মহাশয়রা আমাদের পাশেই ছিলেন। ছাত্রদের গৌরবে তাঁদের মুখ ঝলমল করছিল খুসিতে। বিদ্যালয়টি পাকা। গ্রামের এক সুসন্তানের প্রাণের অর্ঘ্য এটা। হল ঘরে প্রবেশ করে আমরা আরও প্রেরণা পেলাম। দেওয়ালের চারিদিকে টাঙান আছে বিভিন্ন মাসের, বিদ্যালয়ের নিজস্ব, হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা "পারিজাত"। অপূর্ব্ব অদ্ভুত! সার্থক হয়েছে এর নামকরণ। যেমন কারুকার্য তেমনই বিষয়বস্তু। এর প্রতি ছত্রে আছে শুচিতার আভাস। সম্পাদক শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক। তবে কবি ও লেখক হিসাবে তাঁর নাম আছে। তিনি মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে সৃষ্টির নব নব প্রেরণায় নিজেকে শিশু মনের কাছে ব্যক্ত করেছেন এক অভিনব পন্থায়। কাঁচা হাতের কারিকুরি বিভাগটাও একটি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিশুমনকে গড়ে তুলবার কি সুন্দর প্রচেষ্টা, তা দেখে শিক্ষকমহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। দধীচির আত্মত্যাগের মহিমা আমরা জানি কিন্তু এই সব আত্মভোলা দধীচিদের কথা আমরা জানতে চাইনা; সম্পাদক মশায় শারদীয় সংখ্যাটি দেখালেন। আমরা হতবাক।

১০ পাতায় আট পেপারে ছাপান একখানা বই। তার প্রতি পাতায় পাওয়া যায়ে ছবিসহ নেতাদের পরিচয়। এমন সুন্দর হাতের লেখা কাগজ বাংলা দেশে খুব বেশী নেই।

মাটি ও কাগজের কাজও দেখলাম। যত দেখি তত দেখতে ইচ্ছা করে। ছেলেদের নিজস্ব পরিচালিত লাইব্রেরিটা দেখলাম। ছোটদের উপযোগী বই কিছু কিছু আছে তবে যথেষ্ট নয়।

ছেলেরা নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন উৎসব, জন্মতিথি, জাতীয় দিবস প্রভৃতি পালন করে থাকে, তার নিদর্শন বহু পাওয়া গেল। হারোনরা জিজ্ঞেস করল ছেলেদের "তোমাদের স্কুলে আসতে কেমন লাগে।"

উত্তরে ছেলেরা জানাল—আমরা ত স্কুলে এসেই আনন্দ পাই। এখানে শুধু বইএর মধ্যে আমাদের আটকে রাখা হয় না। কাজ, ছড়া গল্প, খেলাধুলা, ভ্রমণ, বন-ভোজন পরিদর্শন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষকরা আমাদের অনেক কিছু জানিয়ে দেন। স্কুলে না আসতে পারলেই আমাদের দুঃখ হয়।"

চলতে ফিরতে হঠাৎবাঁকির কোনায় লেগে গোপালদার হাতটা একটু ছড়ে গেল। রক্তও বেরুল একটু। গোপালদা ভারি ভীতু লোক, কি করবেন তাই ভাবছেন এমন সময় চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র তুলো আয়োডিন ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে হাজির। সে নিজেই ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে তাত্ত্বিক চালে বলল—খুলে ফেলবেন না যেন।" আমরা শুধু একটু হাসলাম।

এবার শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হল। তাঁরা বললেন দেশের মতের সেবা করবার মত পুঁজিপাটা আমাদের কিছু নেই তবে স্বাধীন দেশের নাগরিকের কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছি মাত্র। করতে ত চাই অনেক কিছু কিন্তু প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাঠামোটা বড় দুর্বল তবু এর উপর ভরসা করে অনাগত আনন্দময় দিনের আশায় যাত্রা করেছি, জানিনা আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে কি না?

এই সমস্ত শিক্ষক দেশ ও জাতির কত বড় মহা সম্পদ তা ধারণা করা যায় না। এদের সঙ্গে জন-সাধারণের সহযোগিতার অভাব দেখা গেল না। এ অঞ্চলে এরা সত্যিকারের আদর্শ প্রচার ও পাত্র।

নরেশ বাবুই বললেন, বুদ্ধুরা কোন কর্মক্ষমতা থাকেনা। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি ফেরান, দেখতে পাবেন যাদের জঠরাগ্নি নির্বাপিত তারাই আজ সভ্যতার পৌরীবৃন্দে আসীন। এই সব ছেলে দিয়ে আরও কাজ করাতে পারতাম যদি এদের মুখে দুটো পুষ্টিকর কিছু খাদ্য টিফিনে তুলে ধরতে পারতাম। তবে আমরা একটা স্কীম নিয়েছি। স্থানীয় কয়েকজন সদাশয় অভিভাবক এ বিষয়ে কয়েক বিঘা জমি দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। চাষ করে আমরা তার থেকে কিছু করতে চাই। গোপালদা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—আপনাদের এ মহৎ ব্রত নিশ্চয়ই সফল হবে একদিন।

শচীন প্রশ্ন করল—কিছু মনে করবেন না, অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়দের বলতে শুনেছি যে যারা অভাব অনটনের দৈন্যের তুপে ডুবে আছে তারা শক্তি পাবে কোত্থেকে যে জাতি গঠনের কার্যে মন প্রাণ ঢেলে দেবে।" আপনাদের এ সম্বন্ধে মতামত কি?

নরেশবাবু জবাব দিলেন—দেখুন আমরা ত মনে করি আমাদের বেতন যাহোই হোক আর যাহাই হোকনা কেন তার জন্যে কিছু যায় আসে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিকের প্রবে, ত্যাগে ও কর্তব্যে এই মহান ভারত গড়ে উঠবে একদিন। আমাদের উপর যে দায়িত্ব পড়েছে তা যথাযথ ভাবে পালন করাকে একান্ত ধর্ম বলে মনে করি আমরা।

শিক্ষক মহাশয়দের উক্তিতে মনটা খুসিতে

ভরে উঠল। একটা আদর্শ বিদ্যালয়ের সন্ধান পেয়ে মনে আশার সঞ্চার হল। বেলা পড়ে এসেছে। ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হলাম। সভাস্থল ভেঙে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি ছেলেরা দাঁড়িয়ে সার বেঁধে। তারা আমাদের বিদায়অভ্যর্থনা জানাল তাদের বাগানের তাজা ফুলের তোড়া দিয়ে। অভিভূত হয়ে পড়লাম আমরা। সত্যি এরা নন্দনকাননের পারিজাত। এদের কথা ভুলতে পারবো কিনা জানিনা। সত্যিকারের একটা আনন্দ নিয়ে আবার সাইকেলে চড়লাম।

———

সঙ্কলন

বই পড়া

প্রবন্ধ সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী

• • • এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার মস্ত, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মন সাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

• • • আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা তহাবে, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা আদ্যঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। • • • আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করি দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে কিছু বেশি। • • • আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। × × × শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জাগ্রত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু করতে পারেন না। তিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়। তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা

পরিষ্কার করা যাক। এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমাগত গোরুর দুধ খেলালেই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। ... তাঁদের বিশ্বাস, ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। ... আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিটাও ঐ একই রকমের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইস্‌ক্যানটাইল লিভারে গড়াস্থ হচ্ছে, তা বলা কঠিন।

... আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়। প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আরাম রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয় গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চেয়ে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল।

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : ফাল্গুন, ১৩৬৫

সূচী

আলোচনা ৪১

জল পরিশ্রা ৫১

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়]

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পায়খানা ও বিদ্যালয়ের ব্যবহার

[শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ] ৫৩

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোজনাবদ্ধতা ৬০

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়]

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিল্পের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ কৃৎস্নং প্রপত্তিং তাত পদ্ধতি

১৭শ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৬৫ | সংখ্যা ৪র্থ

আলোচনা

পুনরায় পরীক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খলতা

এ বৎসর পুনরায় পরীক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদে আমরা স্তব্ধ হইয়াছি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শুধু বুদ্ধির নয়, আচরণেরও বটে, এবং ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত আচরণের। আমাদের ছাত্রসমাজ এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় নাই। বাদ-প্রতিবাদের কথা নয়, কোনও ছাত্রবন্ধুই এরূপ আচরণ সমর্থন করিবেন না। কারণ যাহাই হউক, এরূপ কার্য সমাজের মুখে কালিমা অর্পণ করিয়াছে।

আই এস সি পরীক্ষার কোনও প্রশ্ন পত্র অসম্ভব দুরূহ ছিল? কিন্তু অন্য উপায়েও ইহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। পরীক্ষা যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই তো অস্বাভাবিক কঠিন প্রশ্ন দেওয়া উচিত হয় নাই, এরূপ অবস্থা যাহাতে না ঘটে সেজন্য সতর্ক থাকা তাঁহাদের অবশ্য উচিত ছিল। কিন্তু প্রশ্নের বিচার না করিয়াও একথা বলা যায় যে যাহারা শুধু নিজে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, অপরকে উত্তীর্ণ হইতে বাধা করিয়াছে এবং তাণ্ডবলীলার দ্বারা পরীক্ষার কাজ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের কার্যপ্রণালী ছাত্রসমাজকে অবমাননা করিয়াছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের পরলোক গমন

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুকাল নানা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক টনি সাহেবের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পড়াইবার নীতি ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর অধিকার ছাত্রদের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় ছিল তাঁহার অনবদ্য চরিত্র ও আত্মমর্যাদা বোধ। বহু সাধু সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এবং গীতা ছিল শুধু তাঁহার নয়, পরিবারের ছেলেমেয়ে সকলের নিত্য পাঠ্য। অবশ্য মৃত্যু সকলের পক্ষেই ধ্রুব, তথাপি যাহা যায় তাহা যায়—অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের শান্ত নিরহংকার মূর্তি যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের মনে বহুদিন জাগরূক থাকিবে।

আর্ক বিশপ কিশারের ভারতে আগমন

আর্ক বিশপ কিশারের ভারতে আগমন উপলক্ষে সমাজের উচ্চস্তরে, বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টান সমাজের উচ্চস্তরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর্কবিশপ কলিকাতায় ইষ্টারের সময় থাকিবেন এবং প্রায় সপ্তাহকাল অবস্থানের পর হংকং যাত্রা করিবেন। তিনি কর্মপ্রাণ, কর্মকুশল, বিদ্যোৎসাহী, আর্তত্রাণের জন্য ব্যাকুল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় আঠার বৎসর তিনি রেপ্‌টন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকসমাজ তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিলে দোষ হইবে না। আমরা তাঁহাকে স্বাগত জানাই।

পরলোকে ডক্টর বীরেন্দ্রলাল দে

ডক্টর বীরেন্দ্রলাল দে বিদেশ হইতে ফিরিয়া মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এ জন্য তিনি Women's College নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সকল প্রকার অভাব অনটন অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হন। তাঁহার নিষ্ঠার ফলে Women's College-এর ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়ে, এবং ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলও ভাল হইতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুতে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষতি হইয়াছে, তিনি স্ত্রীশিক্ষার কাজে অক্লান্তকর্মী ছিলেন।

বিদ্যালয়শিক্ষার ব্যবস্থা

আমাদের শিক্ষাদানের কাঠামোর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্তন হইবে। বিদ্যালয়ে শ্রেণীর সংখ্যা বাড়াইয়া দশের জায়গায় এগারটি শ্রেণী করা হইয়াছে, এবং ছেলেরা যাহাতে অণুবীক্ষণের দ্বারা বিলেতি বেগুন, পেয়ারা বা পেঁয়াজের ভিতরের 'সেল'গুলি পরীক্ষা করে ও তাহাদের গঠনপ্রণালী আঁকে, তাহারও ব্যবস্থা আছে। এই এগারো শ্রেণীর স্কুল বা হাইস্কুল সেকেণ্ডারি, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৩৭৫—আগামী এপ্রিল মাস হইতে একাদশ শ্রেণী খুলিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? সরকারের টাকাতেই হউক বা বিদ্যোৎসাহী বন্ধুদের বদান্যতায়ই হউক, বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষাদান শুধু শিক্ষকের দ্বারাই হইতে পারে, অর্থ দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। বঙ্গীয় শিক্ষাজগতের সম্মুখে এই সংকট উপস্থিত।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিব, নিম্নতর শ্রেণী হইতে বিজ্ঞানের চর্চা না করিলে, হঠাৎ উপরের শ্রেণীতে বিজ্ঞান চাপাইলে সমবেখায় শিক্ষার উন্নতি হইবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আপাততঃ ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। শিক্ষকদের মোটামুটি শিক্ষাদানের শক্তি থাকিলে তাহাদের দিয়া সেমিনার, শিক্ষাশিবির, আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা একটা কাজ চালানো ব্যবস্থা করিতে চান। কিন্তু ইহাতে গোঁজামিলের চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় কি? অন্য উপায়ান্তরও নাই।

—•—

গুরুদক্ষিণা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আন্তশিক্ষক। আন্তশিক্ষককে চিন্‌তে বেগ পেতে হয় না। নৈতিক আদর্শগুলির প্রতি একটা ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাঁকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। আন্তশিক্ষক মনে প্রাণে কামনা করবেন, তাঁর ছাত্রেরা অনুপ্রাণিত হবে সেই সকল আদর্শের দ্বারা যা যুগ যুগ ধ'রে জাতির অন্তরের মণিকোঠায় জ্বলছে হোমশিখার মতো। তাঁর সবল ব্যক্তিত্বের দ্বারা অকুণ্ঠ আচরণের দ্বারা তিনি সাহায্য করবেন ছাত্রদের আদর্শনিষ্ঠ হতে। আমরা যে-রকমের আদর্শ আমাদের মনের মধ্যে লালন করে থাকি আমাদের জীবনও সেই রকমের হয়ে ওঠে। আমাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের রঙে আমাদের সমস্ত সত্তা রঙিয়ে যায়। আন্তশিক্ষকের লক্ষ্য হ'চ্ছে ছাত্রদের জীবনের কুঁড়িগুলিকে দলে দলে ফুটিয়ে তোলা। তাদের নৈতিক চরিত্রকে গড়ে তোলাই সঙ্গে আন্তশিক্ষকের জীবনব্রত।

অন্তরের গভীরে মহৎ আদর্শের ডাক যিনি কখনো শোনেন নি, 'আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে' এই ব্যাকুলতা যিনি কখনো অনুভব করেন নি মর্মের শোণিত ধারায়, একটা দীপ্তিযুক্ত মহাজীবনের কল্লোলধ্বনি যাঁকে আহ্বান করেনি বৃহৎ বিশ্বের পানে, তাঁর পক্ষে কোন মতেই উচিত হয় না শিক্ষকের পদ গ্রহণ করা।

আমাদের প্রধান শিক্ষকের কাছে আমরা চিরদিন ঋণী থাকবো। সে ঋণের অন্ত নেই। আমাদের জীবনের কুঁড়িগুলিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে তাঁর সে কি ক্লান্তিহীন পরিচর্যা! সেদিন ছিলাম অজ্ঞাতশ্মশ্রু বালক। তাঁকে ঠিক মতো বুঝবার মতো বয়স হয়নি। অনেক সময়ে তাই বিরক্ত বোধ করতাম। আজ আয়ু:-সূর্য যখন মধ্যগগন পেরিয়ে পশ্চিমে হেলেছে তখন বুঝতে পারছি, নিয়মের মধ্য দিয়ে জীবনকে চালানো কঠিকর, আর কষ্টকে এড়িয়ে যাওয়ার দিকেই মানুষের ঝোঁক। তিনি চাইতেন নৈতিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে। তখন কে বুঝতো জীবন একটা আর্ট, আর্ট মানে সংযম, আর সংযম মানে দুঃখ?

বেডেনপাওয়েলের আদর্শে তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম স্কাউটবাহিনী গঠন করেন এবং আমরা কৃষ্ণনগর সেণ্ট্ জন্‌স্ হাই স্কুলের ছাত্রেরা ছিলাম ভারতবর্ষের প্রথম স্কাউট। খাকিশার্ট পরে আর নীল রঙের kerchief গলায় বেঁধে আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি! আমাদের সঙ্গে থাকতো তাঁবু। তাঁবু খাটিয়ে রান্নাবান্না আমরা নিজেরাই করতাম। পেটে জ্বলতো ক্ষুধার আগুন। আনাড়ি হাতের রান্না লাগ্‌তো অমৃতের মতো। মনে পড়ে, কিশোর আমরা তাঁবু গুটিয়ে চলেছি হরিণপুর থেকে শান্তিপুরে। শেষরাত্রের অন্ধকারে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে গাছে গাছে। আকাশের প্রান্তরে ফুটে আছে অগণিত নক্ষত্রের কুসুম। ঝিরঝির ক'রে স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, আর আমাদের মনের মধ্যে বাজছে পথের বাঁশি। সেই দিনগুলিকে কোথায় ফেলে এসেছি!

মহৎপুরে পড়েছে আমাদের তাঁবু। অদূরে জলঙ্গী নদীর নীল জলধারা। সে জল আজও

তেমনি কাকচক্ষু। শুভ্র বালুচর ক্রমশঃ ঢালু হ'য়ে জলের সঙ্গে মিশেছে। স্নানের সে কী ধুম! ঝাঁপিয়ে পড়ছি, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, পাল্লাপাল্লি দিচ্

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পায়খানা ও বিষ্ঠাসারের ব্যবহার

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ (বিশ্ব-ভারতী)

এ দেশে পায়খানার সমস্যার কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত। এ সম্বন্ধে দেশের সর্ব-সাধারণের চিত্ত ও চিন্তাকে উদ্বোধিত করার প্রয়োজন আছে এবং তাহা সমাজসেবী তথা সমাজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই কর্তব্য। কারণ পায়খানার ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ নিবিড়তিশয় ঘনিষ্ঠ। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি-শিক্ষাদান কালে বিভিন্ন রকমের পায়খানা ও ইহাদের ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে পায়খানার মল অল্পের ধারায় পরিকৃত হয়। সেখানে পারিবারিক মল ব্যবহারের প্রশ্ন আসে না। আজকাল সেনেটারী পায়খানা স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এই পায়খানার মলও সাররূপে ব্যবহার করা যায় না। কুয়া পায়খানার (Dugwell Latrine) মলও ব্যবহার করা চলে না। অথচ বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্ট সার।

ইদানীং দেশের নানাস্থানে চলন্ত পায়খানার প্রথার বাড়িতেছে। কৃষিবিদ্ স্বর্গীয় রাসেলের সিংহ "কৃষি প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে আমার উদ্ভাবিত চলন্ত পায়খানার যে বিবৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—"সম্প্রতি আমার পুত্র শ্রীমান লক্ষ্মীশ্বর মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে একটি চলন্ত পায়খানা উদ্ভাবন ও নির্মাণ করিয়াছে। ইহাকে বিষ্ঠাসার ব্যবহার করিবার অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইহা চাকার উপর এমনভাবে তৈরী যে, অতি সহজে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই চালাইয়া লইয়া বসানো যায়। প্রবল ঝড়ও ইহার ক্ষতি করিতে পারে না। ইহাতে বসিয়া মলত্যাগ করার পর মলের উপর বড় এক চামচ মাটি দিতে হয়। সেজন্য মাছির উপদ্রব একেবারেই হইতে পারে না। বাড়ীর যে কোন স্থানে ইহা বসাইয়া মলত্যাগ করিলেও কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। বিষ্ঠাসার ব্যবহার করিবার জন্য ইহা শাক-সবজীর বাগানের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বসাইয়া মলত্যাগ করিতে পারা যায়। উপরন্তু স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার পক্ষেও উহা উৎকৃষ্ট উপায়।"

"কৃষি-প্রবন্ধে" তিনি চলন্ত পায়খানার আকারের ও ব্যবহারের যে বর্ণনা দিয়াছেন আজ পর্যন্ত সে ব্যবস্থাই সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে। ১৯৪৩ সালে ইহার গঠনের একটি বড় পরিবর্তন করা হয়। পূর্বে ইহা শুধু 'চলন্ত' ছিল; পরে ইহাকে সেই সঙ্গে পোর্টেবল (Portable) করা হয়, যাহাতে ইহাকে সঙ্গে করিয়া ক্যাম্পজীবনেও ব্যবহার করা চলে। বলা বাহুল্য এই পায়খানা উদ্ভাবনের পিছনে রহিয়াছে আমার আজীবনের চিন্তা। পল্লীর গণ-প্রতিভা পায়খানার সমস্যা ও বিষ্ঠা-সারের ব্যবহার সম্বন্ধে সক্রিয় হইয়া উঠুক, সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমানে এ প্রবন্ধের অবতারণা।

পোর্টেবল ও চলন্ত পায়খানা মিলিটারী ক্যাম্পে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। পশ্চিম-জার্মাণীর ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত এক সময়ে সৈন্যবিভাগে কাজ করিতেন। তিনি বিনয়ভবনে এই পায়খানা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন, এবং মিলিটারী ক্যাম্প-জীবনের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী বলিয়া মন্তব্য করেন।

বিষ্ঠা সারের গুণ

আমি ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিতে-ছিলাম বিষ্ঠাসার প্রয়োগে পিতাঠাকুরের অদম্য

উৎসাহ ; সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই পায়খানা স্থানান্তরিত করিতেন। "কলি প্রবর্ত" গ্রন্থে বিষ্ঠাসার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা চল্লিশ বৎসরের উর্ধ্বকাল যাবত সবজীর জমিতে সারের কাজে রীতিমত প্রণালীবদ্ধভাবে বিষ্ঠা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, বিষ্ঠাসারের জমির কপি, শালগম, বেগুন, লাউ, কুমড়া, শীম, ঝিঙা, বারমেসে লঙ্কা ইত্যাদির গাছগুলি যেমন নিখুঁত চেহারা, দ্রুত বৃদ্ধিশীল ও ফলবান হয় এবং সে সব খাইতে যেমন সুস্বাদু হয়, অন্যান্য সার দিয়া সেরূপ করিতে একটু অধিক যত্ন ও আয়াস স্বীকার না করিলেই চলে না।.....

"যে সূত্র অবলম্বনে সবজী চাষে বিষ্ঠাসার ব্যবহারে আগ্রহ বাড়িয়াছিল তাহাও একটু বলা আবশ্যক মনে করি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা, যখন আমরা বিষ্ঠা সারের গুণাগুণ কিছুই অবগত ছিলাম না, তখন আমাদের একটি মেটে পায়খানা, সেখানে এক বৃহৎ পরিবারের লোক ক্রমাগত ৩০।৪০ বৎসর মলত্যাগ করিয়াছিল তাহা স্থানান্তরিত করা হয়। মেটে পায়খানা মানে সেখানে জমিতে বসিয়াই মলত্যাগ করিতে হয়।" .....সে সব পায়খানার মল ও দু'চারদিন পর কোদাল দ্বারা কতক মাটীসহ চাঁচিয়া তুলিয়া কোন একবারে স্তূপাকারে রাখিয়া দেওয়াই রীতি।".....

.....আমাদের পায়খানাটা বহুকালের হওয়াতে ইহার মজলা কেন্দ্রিয় স্থানটাও ৩০।৪০ ফুট লম্বা ও ৪৫ ফুট উচ্চ এক বৃহৎ মেটে দেওয়ালের মত হইয়া গিয়াছিল। ঐ মাটী কাটাইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া ভিন্ন কাঠায় মত জমি সমতল করিয়া লওয়া হয়। তথায় রীতিমত হালচাষ করাইয়া সতাধিক বারমেসে বেগুনের চারা রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাতে গাছগুলি যেরূপ সতেজ ও নিখুঁত এবং অজস্র ফলবান হইয়াছিল তেমন বৃক্ষ আমি ইতিপূর্বে বাজারে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

পিতাঠাকুরের উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বৃক্ষ আমিও বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছিলাম। তরুণ বয়সেই তিনি আমাকে তাঁহার প্রধান মালী ও সেক্রেটারীর কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বাড়ীর কলমূলের ও বাগিচার পরিচর্যা ও তাহার প্রত্যক্ষ দর্শনের দৈনন্দিন নোট তিনি আমাকে দিয়াই লেখাইতেন এবং ইহাতে আমি প্রচুর আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিতাম। বিষ্ঠাসার ব্যবহার প্রসঙ্গে আমার প্রথম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অপূর্ব।

বাড়ীতে গোটা তিনেক বারমেসে বেগুন গাছ বৃদ্ধ হইয়া ফলদানের ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছিল। একদিন আমার উপর আদেশ হইল, গাছগুলির ডাল গোড়া ঘেঁসিয়া ধারাল দ্বারা ছাটিয়া দিতে। তাহাই করা হইল এবং সমগ্র বেগুন ক্ষেতে পায়খানার মাটি ছড়াইয়া কোদালী করিয়া দেওয়া হইল। পরে সেই গাছ ও তাহাদের অজস্র নিখুঁত ফলের বৃক্ষ যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তখনও ভুলিবার নহে। কিন্তু সেই সকল গাছের ফল বাড়ীর কেহ কেহ ঘৃণা করিয়া তখনকার দিনে খাইতেন না।

যত্রতত্র পায়খানা করার অপকারিতা

মানুষের বিষ্ঠা মানুষের যে কি উপকারে লাগিতে পারে, সে সম্বন্ধে তখন আমার একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছিল। অধিকন্তু পিতাঠাকুর সে বিষ্ঠাকে সাররূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অবসরতঃ সংগ্রহ করিতেন, তাহা আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু আমি উৎসুক হইয়া যত্রতত্র হাটে-মাঠে-ঘাটে পায়খানার অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলাম। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করার ফলে কত দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে মানুষ নিপতিত হয় তাহা পিতাঠাকুরের অনুগ্রহে আমার দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল। যেমন :—

(১) গোয়ালারা দই দুধের ভাণ্ড লইয়া গ্রামে ঘাতায়াত করিত। এই দই দুধে প্রায়ই গাছি

পাইতাম। পল্লী অঞ্চলে রাস্তার পাশে অনেকে পায়খানা করে। সেই পায়খানার উপরের মাছির যে দু'চারেটি দই দুধের অমৃতসাগরে ডুবিয়া মরিত সেই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দিহ রহিল না।

(২) জল-শৌচের সুবিধার জন্য বহুলোকে পুকুরপাড়ে মলত্যাগ করে। বৃষ্টির জলে সেই মল পুকুরের জলে মিশিয়া যায়। আবার সেই জলেই মানুষ হাত-মুখ ধোয়; সেই জলই পূজা-পার্বণাদির কাজে ব্যবহার করে। এই অসঙ্গত আচরণের মূলে মূর্খ্যত মানুষের অজ্ঞতাই কাজ করিতেছে বলিয়া আমার স্থির ধারণা জন্মিল এবং ইহার প্রতিকার অবশ্যকরণীয় এইরূপ একটা বোধ অনবরত আমার মধ্যে কাজ করিতে লাগিল।

(৩) অনেককে দেখিতাম পুকুরে জলশৌচ করিয়া সেই জলেই আবার স্নানাদি করিতেন। স্বাস্থ্যবিধির অনুশাসন লঙ্ঘনের এরূপ দৃষ্টান্ত বোধহয় অন্য জীবজন্তুর মধ্যেও দেখা যায় না।

(৪) যে অঞ্চলে আমার জন্ম সেখানকার রান্না ঘরের পেছনেই সাধারণতঃ বাড়ীর পায়খানা থাকিত, এখনও থাকে। রান্নাঘরের মাছির সঙ্গে পায়খানার মাছির সম্বন্ধ যে নিরবিচ্ছিন্ন, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। পিতৃদেব দুঃস্থ পল্লীবাসীর অবৈতনিকভাবে চিকিৎসাদি করিতেন। গ্রামে কলেরা লাগিলেই তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন; যাহাতে খাদ্যবস্তু ঢাকা থাকে এবং মাছি তাহার উপরে না বসিতে পারে। আমাদের বাড়ীতে সে সম্বন্ধে কড়া নির্দেশ ছিল, শুধু তাহাই নহে, ভাত থালায় সাজাইয়া ভাতের উপরে গরম ঘি মাখাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঘৃতসিক্ত ভাতের উপরে মাছি বসে না।

উপরোল্লিখিত ঘটনার সমাবেশ আমার চিন্তার ধারাকে পায়খানার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ আলোড়িত করে। আমি দেখিলাম যে অনেক জায়গায় পায়খানা করিয়া তাহা ঢাকিয়া দেয়। এমন সময় পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটিল।

আমাদের পল্লীর বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আমরা খেলাধূলা করিতাম। বিদ্যালয়ের পশ্চিমে একটি প্রাচীন বৈষ্ণব আখড়া ছিল। উৎসবাদি উপলক্ষে তথায় বহু বৈষ্ণবের সমাবেশ হইত। এই আগন্তুকের দল সাধারণতঃ মাঠে-মাঠে পায়খানা করিতেন। একদিন দেখিলাম, একজন বৈষ্ণব লোটা ও একটি কোদাল হাতে মাঠে পায়খানা করিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার কোদালটি আমার উৎসুক্যের সঞ্চার করিল। আমি দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তিনি মাঠের একস্থানে যাইয়া বসিলেন, তৎক্ষণ কোদালী মাটি কাটিয়া গর্ত করিলেন, গর্তে মলত্যাগ করিয়া আবার মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। ঘটনাটি পাঠকের নিকট হয়ত নগণ্য হইতে পারে কিন্তু তাহাই আবার নূতন করিয়া পায়খানার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার চিন্তাকে আলোড়িত করে।

একবার এক উৎসব উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে বহু অতিথির সমাগম হইয়াছিল। অতিথিদের জন্য পল্লীর বহির্দেশে একটা নালার উপর পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে দেখিতে পাইলাম, সেই পায়খানার স্তূপের উপরে যে কচু গাছ হইয়াছে, তাহা আকারে পার্শ্ববর্তী কচুবনকে ছাড়াইয়া বহু উচ্চে উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের তল এ ভাবে আমার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

পায়খানা সম্বন্ধে আমার পরবর্তী জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শ্রীনিকেতনের পল্লী-সংগঠন বিভাগে আমার যোগদান করা। ইহা ১৯২৮।২৯ সালের কথা। এল্‌মহার্স্ট সাহেব Leonard K. Elmirst তখন শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টর। ছাত্ররূপে শ্রীনিকেতনে ঢুকিয়াই দেখিলাম যে ছাত্ররাই পায়খানা পরিষ্কার করেন; ডিরেক্টর এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন এবং পায়খানার সমস্যার কথাও

আলোচিত হইত। ইহাতে আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল কিন্তু মুগমুগান্তরের অন্ধ সংস্কার সহজে কাটিবার নহে। এখানেও দেখিলাম যে ছাত্ররা পায়খানা পরিষ্কারে খুব উৎসাহী নন এবং এই কাজকে সকলে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে শ্রীনিকেতনে পিতৃগৃহের অনুরূপ একটি দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ হইল। তখন আমার বয়স আঠার কি উনিশ।

শ্রীনিকেতনে কাচাহারা সেন নামক একজন সুদক্ষ জাপানী শিল্পী ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব বাগান ছিল। তরকারী ফলমূল তিনি প্রচুর উৎপাদন করিতেন। ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার ছাত্র হই এবং রোজ সাত আট ঘণ্টাকাল তাঁহার বাড়ীতে কাজ শিখিতাম। শাক, সবজীর ক্ষেত্রে বিষ্ঠাসার প্রয়োগে তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য দেখিয়া আমার কেবলই পিতৃগৃহের কথা মনে হইত। কাচাহারা সেন প্রত্যুষে বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন পাত্রে জলের সঙ্গে বিশেষ তরল করিয়া লইতেন, এবং বড় চামচে হিসাব করিয়া গাছের গোড়ায় ব্যবহার করিতেন। ইহার সুফল প্রত্যক্ষ ছিল, কিন্তু এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে এ প্রথা চালু করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় নাই। তখনই প্রথম আমার ধারণায় আসে যে পায়খানা এমন হওয়া দরকার যে তাহা বিষ্ঠাদারের ব্যবহারকে আরও সহজ করিয়া তোলে, এবং তাহা জলবায়ুর প্রতিকূল না হয়!

১৯২৮ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বহুদেশে এমন কি সুদূর আইসল্যাণ্ডেরও পল্লী অঞ্চলে বহু সহস্র মাইল ঘুরিয়া বেড়াই। সর্বত্রই আমি পায়খানার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতাম। ডেনমার্ক বা বাল্টিক দেশ সমূহের পল্লী অঞ্চলের স্থানে স্থানে পায়খানার দুরবস্থা চোখে পড়িয়াছে এবং তাহা তখন দেশের পল্লী অঞ্চলের দুরবস্থার কথা মনে করাইয়া দিত। আমার মাঝে মাঝে মনে হইত, ইহা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে এবং বিষ্ঠাকে সেই সঙ্গে মানুষের উপকারে লাগাইতে পারিলে মানব সমাজের একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়। এই নীতি অনুসরণ করিয়া পায়খানার গঠন কি হওয়া উচিত তাহা আমার প্রধান বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আমি কয়েকটি মূল নীতি মনে মনে স্থির করিয়া লই। যথা—

(ক) পায়খানা এমন হইবে যে তাহা স্বাস্থ্য নীতির অনুকূল হয়, উপরন্তু পুকুর, কুয়ার জল এবং বায়ু দূষিত না করে।

(খ) পায়খানার সঞ্চিত মল সহজে বাগানে ও কৃষিক্ষেত্রে সারস্বরূপে ব্যবহার করা চলে।

(গ) এক স্থানের সঞ্চিত মল উত্তোলন করাও শ্রম এবং ব্যয় সাপেক্ষ। পায়খানা এমন হওয়া চাই যেন এই শ্রম ও ব্যয়কে সঙ্কুচিত করে।

(ঘ) পায়খানা এমন হইবে যে সকলের পক্ষে তাহা তৈরি করিয়া বা করাইয়া লওয়া সহজ হইবে।

এই চতুর্বিধ গুণের সমাবেশ করিতে যাইয়াই এই চলন্ত পায়খানার উদ্ভাবন। ইহার চারটি চাকার কথা যে কারণে আমার মনে জাগিয়াছিল তাহাও উল্লেখযোগ্য। আমাদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর রথযাত্রা হইত। রথযাত্রার দু একদিন পূর্বে ছুতার আসিয়া বাঁশ দিয়া রথ তৈরি করিত এবং চাকাগুলি খুলিয়া দিত। এই রথের কাঠের চাকাগুলি বোধ করি ঠাকুরদাদার আমলের তৈরি ছিল। পায়খানাটিও চারটি চাকার উপর চালাইয়া দিলে সহজে স্থানান্তরিত করা যাইবে এবং মল উত্তোলনের শ্রম বাঁচিয়া যাইবে এই চিন্তার বশবর্তী হইয়াই আমি চলন্ত পায়খানার প্রথম প্ল্যান করি।

১৯৩৬ সালের শেষাংশে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়া আমার পায়খানার এই প্ল্যান পিতা-ঠাকুরের নিকট পেশ করি এবং তাঁহার মতামত জানিতে চাই। তিনি আমাকে এ কাজে উৎসাহিত করেন, কিন্তু ইহা ব্যবহার না করিয়া ইহার গুণাগুণ সম্পর্কে মতামত দিতে অসম্মত হন। কিন্তু তিনি

চলন্ত পায়খানা তৈরীর জন্ত একটি ছুতার ডাকিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন। এই প্রথম চলন্ত পায়খানা রূপ পরিগ্রহ করে। ইহা তৈরি হইলেই বাড়ীর সকলকেই আমি ইহার ব্যবহারপদ্ধতি শিখাইয়া দিই। একটি বড় চামচ (trowel) করিয়া দিই, যাহাতে মলত্যাগের পর সকলেই এক চামচ মাটি দিয়া তাহা চাকিয়া দেন। বাড়ীর সকলকে উনানের ছাই এই কাজে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলি। বাড়ীর সেই পায়খানা আজও কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ কার্যকরী আছে। প্রথম পায়খানাটির ভিতরে বসিবার জায়গার পাশেই একটি ছাই বা মাটি ভর্তি বাক্স রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরবর্তী পায়খানায় এই বাক্স উঠাইয়া দিই। এই পায়খানা তৈরির পর কিছুকাল আমি শ্রীনিকেতনে কাজ করি। ১৯৩৭ সালের শেষার্ধে আমি বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম সম্মিলনীতে যোগ দিই। ১৯৩৮ সালে বর্ধমান সহরে বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইলে সেখানে আমি শিক্ষাশিল্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে যোগদান করি। ১৯৪২ সালে সেবাগ্রামে নয়ী তালিম ভবনের উদ্যোগে শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর মহাত্মাজী আমাকে আহ্বান করেন। ইহা ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পূর্বের ঘটনা। আমি সেবাগ্রামে যোগ দিবার অল্প কয়েকদিন পরই মহাত্মাজী বোম্বের সেই বিখ্যাত অধিবেশনে যোগ দিবার জন্ত চলিয়া যান। আগষ্ট আন্দোলন সুরু হইবার পর দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকার কথা। কিন্তু নয়ী তালিম শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র তাহার পূর্বে সুরু হইয়াছিল। শিক্ষক-শিক্ষণ অধ্যাপকদের প্রথম মিটিংয়ে সেবাগ্রাম আশ্রমের ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন এবং নয়ী তালিমের ছাত্রাবাসের পায়খানার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। আমার তখন মনে হইয়াছিল, আমার উদ্ভাবিত পায়খানা সেখানে চালু করার প্রকৃষ্ট সময় আসিয়াছে এবং সেই প্রস্তাব অতি সংকোচের সঙ্গে আমি শ্রীআর্যনায়কমের নিকট উত্থাপন করি। তিনি আমাকে পৃথকভাবে একটি পায়খানা নির্মাণের অনুমতি দেন। সেই প্রথম "চলন্ত" পায়খানা আমার পিতৃগৃহের বাহিরে সেবাগ্রামে চালু হয়। আমি বৎসরকাল সেবাগ্রামে ছিলাম। আমার তত্ত্বাবধানে কয়েকটি পায়খানা তথায় তৈরী করা হইয়াছিল। ইহা সেবাগ্রাম আশ্রম, আচার্য বিনোবা ভাবের নালবাড়ী আশ্রম এবং ওয়ার্ধা সহরে সিন্ধি ভারত পল্লী শিল্প প্রতিষ্ঠানে চালু হয়। দেশের সেই দুর্যোগের দিনে এই পায়খানা ছাড়া আমি তথায় একটি নূতন ধরণের গরুর গাড়ী তৈরী করিয়াছিলাম; জানিনা, তাহা এখন আছে কি না? ভারতীয় পল্লীর পায়খানার অবস্থা ও চলাচলের অসুবিধা বহুকাল আমার চিন্তার খোরাক যোগাইয়াছে।

১৯৪৪ সালে আমি সিংহগড়ে নিজের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি, এবং সেখানে পায়খানার গঠনে কিছু পরিবর্তন সাধন করি।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমি বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে যোগদান করি এবং বিনয়ভবনের ফলবাগ রচিত হইবার পর বিশ্ব-ভারতীতে এই পায়খানা প্রবর্তন করি। এই নব প্রবর্তিত পায়খানার একটি মডেল ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এখন ইহা শ্রীনিকেতনের গ্রাম শিল্প-বিভাগের মিউজিয়ামে স্থান পাইয়াছে। এখানে পায়খানার একটি ফটো দেওয়া হইল। ইহার সাহায্যে প্রয়োজনমত যে কেহ পায়খানা তৈরী করিয়া লইতে পারেন। পূর্বেই বলিয়াছি ক্যাম্পজীবনের সুবিধার জন্ত ইহাকে পোর্টেবল্ করা হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে এখন ইহার সকল অংশই পৃথক করিয়া ফেলা যায় এবং যে কোন স্থানে সহজে বহন করা যায়।

ইহার গঠনের বিবর্তন

(ক) প্রথমে পায়খানাটির কাঠামো চৌকোন ছিল।

(খ) পরে অভিজ্ঞতার ফলে ইহাকে মোচাকৃতি করা হইয়াছে।

(গ) ইহা বরাবর কাঠের ফ্রেইম করিয়াই করা হইয়াছে। কিন্তু আবরণের জন্য বাঁশ, কাঠ, টিন যেখানে যাহা সুলভ তাহাই ব্যবহার করা হইয়াছে।

(ঘ) ইচ্ছা করিলে টিনের অথবা এলুমিনিয়ামের দ্বারাও ইহার কাঠামো তৈরী করা যায় এবং চাকাগুলি কেরো কনক্রিটের হইতে পারে।

ইহার ভবিষ্যত

ভারতের বিভিন্ন স্থানের জমি, আবহাওয়ার পার্থক্য মালমসলার উপাদানের প্রাচুর্যের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রথম ইহা করা হইয়াছিল। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথা প্রতিষ্ঠান মেলা প্রভৃতি স্থানে বিশেষ ধরণের পায়খানার প্রয়োজন আছে এবং তদুপযোগী পায়খানার দু-তিনটি প্ল্যানও আমার মাথায় আছে। কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া তাহা করা আজও আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া দেশের জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নত হইলে বর্তমান পায়খানার মান উন্নত করা সম্ভব। ইহা সত্য যে সেবাগ্রামে চলন্ত পায়খানার প্রবর্তনের ফলে সারা ভারতেই মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে প্রতিষ্ঠানে সমূহে উহা অতি সহজে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা অপেক্ষাও সুখের কথা এই যে, আজ এই সূত্রে অনেকেই বিষ্ঠাকে সাররূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

ক্ষেতে যেমন অন্যান্য সার ব্যবহার করা হয়, তেমনি বিষ্ঠাসারও ব্যবহার করা যায়। গোময় সার বেশ ভাল দরে বাজারে বিক্রী হয়। অনুরূপ বিষ্ঠাসারও বিক্রী হইতে পারে ও অদূর ভবিষ্যতে হইবে এরূপ চিন্তা করা যায়। নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যও সার সংরক্ষণ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিষ্ঠাসারের সংরক্ষণব্যবস্থা সেইজন্য পুষ্ট হওয়া চাই। চলন্ত পায়খানাতে তাহা সহজে করা সম্ভব।

ব্যবহারের তারতম্য

প্রথমেই বলিতে হয় যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইহার ব্যবহার-পদ্ধতিরও পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে সম্বন্ধে এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) পল্লীতে যাহাদের গৃহে জমি অল্প অর্থাৎ পায়খানা বারবার স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়, তাহাদের দুটি গর্ত থাকিলেই হয়। গর্তটি গভীর হওয়া উচিত। তিন চার ফুট লম্বা ও বার চৌদ্দ ইঞ্চি চওড়া এবং দেড় ফুট নাগাদ গভীর গর্ত করিতে পারেন। একটি গর্ত ভরিয়া গেলে অন্য গর্তের উপর স্থানান্তরিত করিলেই চলিবে।

দ্বিতীয় গর্তটি ভরিবার কালে প্রথম গর্তের ময়লা মাটিতে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তাহা তুলিয়া জমিতে বিছাইয়া বা গাছের গোড়ায় দিলেই চলিবে। গর্তের মাটি গর্তের চারিদিকে একটু উঁচু করিয়া দিতে হইবে—যেন বর্ষার জল গর্তে প্রবেশ না করে। কারণ গর্তে জল বসিলে বিষাক্ত জীবাণু ছড়াইতে পারে এবং নিকটবর্তী পুকুরের ও কুয়ার জল দূষিত হইতে পারে। গর্ত না করিয়া তৎপরিবর্তে দুটি কাঠের বাক্সও ব্যবহার করে চলে।

(২) যাহাদের জমির অভাব নাই তাহাদের পক্ষে লাঙলের লাইন কাটিয়া তাহার উপর পায়খানাটি স্থাপন করিয়া প্রতিবার পায়খানা করিয়াই পায়খানাটি সরাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে জমি বিষ্ঠাসারে সমৃদ্ধ হইবে। এরূপ হইলে বিষ্ঠাও সহজে মাটিতে পরিণত হইবে।

(৩) যাহাদের ফলবাগান আছে, তাহাদের পক্ষে পায়খানাটি ফলবাগানে রাখা খুবই সঙ্গত। ইহাতে ফলবাগানও বিষ্ঠাসারে সমৃদ্ধ হইবে এবং গাছের

কলদান অসাধারণ বাড়িয়া যাইবে। এইভাবে পায়খানা ব্যবহার করিলে ফলবাগের প্রভূত উন্নতি হইবে। এবং অন্য সার কিনিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন বিশেষ থাকিবেনা।

যাহারা নূতন ফলবাগ করিতে চান তাহাদের উচিৎ গাছের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেড়হাত লম্বা গভীর গর্ত্ত করিয়া প্রতি গর্ত্তের উপর পক্কাল পায়খানাটি বসাইয়া ব্যবহার করা। এ ভাবে গর্ত্ত সমূহ বিষ্ঠাসারে পূর্ণ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পরে সেখানে গাছের চারা বা কলম রোপন করিতে হইবে।

(৪) দেশের সর্বত্র ছোট বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাগুলিতে এরূপ পায়খানা প্রবর্ত্তন করিলে অল্পসময় মধ্যে প্রচুর উৎকৃষ্ট সার বিনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহা স্বদেশীয় ধান-জমিতে ব্যবহার করিলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

সর্বোপরি চলন্ত পায়খানা সুনিয়ন্ত্রিত করিলে স্বাস্থ্যবিধি পালন সহজতর হইবে, কিন্তু তাহা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

শিক্ষণ-শিক্ষার্থীর রোজনামচা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

বুধবার

শিক্ষকদের সমস্যার পার নেই ; তাই বোধ হয় এ নিয়ে আর কেউ ভাবে না।

অথচ অসহ লাগে সমাজের পাত্রী সাহেবদের কথা। ওঁরা বেশ স্বীকার করেন, জানি শিক্ষকদের বেতন বড় কম ; ভেবেই পাইনে, গ্র্যাজুয়েট আজ-কালকার দিনে ষাট টাকা নিয়ে কি ক'রে সংসার চালান ; কিন্তু উপায় কি ? বেশ টাকা লেবে কোত্থেকে ?" সঙ্গে সঙ্গে আজকালকার শিক্ষকেরা যে আদর্শের দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছে—সেই বিষয় নিয়ে একটু ভালো করে গালাগালি জুড়ে দেন।

এই স্কুলের বাংলার শিক্ষকটির কথা শুনে সেই কথা মনে হচ্ছিল। তিনি খুব কাশছেন—

—কি হয়েছে আপনার ?

—অনাহারের চোটে টি-বি হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

বেশ সহজে বলে গেলেন। পাতুর দাঁতগুলো ভেংচি কেটে উঠলো যেন।

—চিকিৎসা করান না কেন ?

—চিকিৎসক বলেন, ভালো খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, চেঞ্জে যেতে হবে, কাজ থেকে বিশ্রাম নিতে হবে। তিনি জানেন না, আজ পাঁচ বছর বিয়ে করেছি, দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে—

পরে একটু হেসে বললেন, হয়ত ডাক্তার মনে করেছেন, আমার ঘরেও বোধ হয় কিন্নরকণ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে। হুঁ, তা হবার নয় বন্ধু। একেবারে গ্রাম্যবালা।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে কথাগুলো বললেন। মনে পড়ে গেল, ও-পাড়ার আরেকটি শিক্ষকের কথা। হঠাৎ তাঁর এক বড়লোক সহপাঠী তাঁর পত্নীকে কাপড়-চোপড় দিতে আরম্ভ করলেন। দারিদ্র্যের পীড়ন আত্মমর্যাদাকে ছাড়িয়ে উঠল। কিন্তু একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখেন, বউটি শাড়ী খুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অবশ্য এবারেও বড় লোক বন্ধুটিই তাঁকে বাঁচাল। ডাক্তারকে দিয়ে সার্টিফিকেট লিখিয়ে পুলিসের হাঙ্গামা কাটিয়ে নির্বিঘ্নে দাহ করিয়ে আনার সাহায্য তিনি করলেন।

দারিদ্র্য অপরাধ বটেই। কিন্তু উপনিষদ মানলে ভালোমন্দটা যে বিশেষ ভাবনার কিছু নয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। দরিদ্র মাষ্টারদের উপনিষদ পড়া উচিত।

এই সব কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, ছাত্র-দের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমরা এত নাড়াচাড়া তো করি, কিন্তু শিক্ষকদের মনস্তত্ত্বের খোঁজ যদি রাখতাম, তবে এই ট্রেনিং নিতে আর দিতে আমাদের ধৈর্য সত্যিই থাকত কি না।

ক্লাসে গিয়ে,আজ ছাত্রদের দুই মিয় type দেখব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু অসুস্থ শিক্ষকটি কেমন যেন সব গুলিয়ে দিলেন। 'মা যাহা হইবেন' রূপটি স্পষ্ট হল। ভয়ও হল।

ছাত্রদের অস্মিতার (personality) বিচিত্র প্রকাশ, temper, tantrums, delinquency, extrovert-introvert প্রভৃতি কত জিনিসই না দেখবার আছে। এই সব দেখলে একজন ইহুদ কিংবা এ্যাডলার হতে আমাদের বিশেষ বাকী থাকত না। কিন্তু ধৈর্য কোথায় ? দেখবার সময় কোথায় ?

ইস্কুলে Leisure বলে শিক্ষকদের রুটিনে একটা বস্তু আছে। কিন্তু খুব কম শিক্ষকের ভাগ্যেই

ঐ 'লীলায়' উপভোগ করা ঘটে থাকে। ফলে, সপ্তাহে উনত্রিশ ঘণ্টার বদলে উনচল্লিশ ঘণ্টাই খাটতে হয়। টিফিন-পিরিয়ডও অনেক সময় ভোগ করা হয় না।

সহানুভূতির অভাবে এ কাজ তাঁদের করতে হয়। একটি শিক্ষক ছুটি নিলে তার বদলী দেওয়া দরকার। যে-শিক্ষক ছুটি নিলেন তাঁর বেতন হয়ত কাটা গেল, কিন্তু সেই টাকাটা, যাকে দিয়ে ইস্কুল কাজ করিয়ে নিল তাঁকে দেওয়া হয় না। এইগুলোকে চোরা কারবার বলা যায় না। শিক্ষকদেরও এমন মনোবৃত্তি খুব বড় দরের নয়। কিন্তু এমন করে সহ্য করতে করতে ক্লাসের শিক্ষক মুমূর্ষু হয়ে পড়েন।

ঐ যে নবম শ্রেণীর রমেন একটুতেই লজ্জা পায়, কিংবা বীরেশ একাগ্র নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে আমার মুখের দিকে, শব্দ-বেরোনোর ধরণের দিকে তাকিয়ে থাকে—এদের মনের কথা আমাদের সমাজের মতো করে কে বিচার করবে?

বিচার করতে বসলেই প্রথমেই আমরা ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করব। কোনটা না মিললেও মিলাতে চেষ্টা করবই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের জ্ঞানকে আমরা এখন ভাবে স্বীকার করে বসে আছি যে, পৃথিবীর গতির দিকে উদাসীন থেকেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি—এদের মনের বিচিত্র দিকের প্রতি নির্বিকার থেকেও আমাদের বিজ্ঞান ঠিক মতো চলে যাচ্ছে।

—স্যর, একটু চক দেবেন স্যর?

ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতেই নিবারণ বললে।

—কেন?

একটু হেসে বললে, এমনি স্যর।

অন্য ছেলেরা বললে—না স্যর, দেবেন না স্যর, বোর্ডে ঐ চক দিয়ে—

আমি চকের টুকরোটা দিলাম।

নবম শ্রেণীর ছাত্র নিবারণ। লেখার প্রতি তার আগ্রহ বেশী নাকি? কালি-কলমে-পেন্সিলে তো যথেষ্ট লিখতে পায়! তবে? কালো বোর্ডে সাদা খড়ির কাটতেই কি ওর ভাল লাগে? এর সৌন্দর্যজ্ঞান কোথায় লুকিয়ে আছে আমি না—হয়ত বিকৃতিই। কেউ হয়ত বলবেন, ওদের দিয়ে কাজ না করানোর কাজের উৎসাহ বাড়তি শক্তির (superfluous energy) একটা লক্ষণ। এরা সকলেই হয়ত তিন-সত্যি করে তাঁদের মতবাদ জানাবেন। কিন্তু অত সহজে মনুষ্যের তরঙ্গ-লীলার ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা আমার নেই।

নিবারণেরই মতো নবম শ্রেণীতে সুবিকাশকে দেখলাম। ম্যাপ দিয়ে যাওয়ার সময় সে সকলের আগে দৌড়ে আসবে: লাফিয়ে লাফিয়ে ম্যাপটা হুক থেকে খুলবে. জড়াবে—সুন্দর করে জড়াবে, তারপর একদৌড়ে লাইব্রেরী ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জানি না এর ছবির প্রতি আকর্ষণ, না কিছু একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতি একান্ত আগ্রহ, না কোন এক নিয়তির এই বিচিত্র প্রকাশ!

দায়িত্ব তো বাড়িতে ওরা যথেষ্ট নিয়ে থাকে। তবু এই সামান্য খেলার দায়িত্ব ওদের এমন আকর্ষণ করে থাকি?

আমি জানি না।

শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়,

'জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা'

আমি শুধু এদের তাকিয়ে দেখি।

কিন্তু দেখারই কি সময় আছে ছাই! কাজ যে অনেক।

বৃহস্পতিবার

শিক্ষকদের গুলপট্টা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। বিদ্যা, বিদ্যা, বচন, বপু, বই, বউ। এ কয়টি তাদের থাকতেই হবে। বউ থাকবে 'বই'য়ের একেবারে পরেই।

তা ভালো হোক, মন্দ হোক বউ আজকাল সকলেরই থাকে। তবু যে উদ্দেশ্যে কথাটা বলা তা সিদ্ধ হচ্ছে না। কাজেই ওর পর একটু

বোধশক্তি করে নরতে ইচ্ছে হয়. মাষ্টার মশায়ের একটু-আধটু প্রেমে পড়া উচিত। প্রেমের নানা দিক আছে—উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রাইভেট টিউটর বলেও প্রেমের একটা চরিত্র দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উজ্জ্বল মধুর সেন্টারের ভাবগুলো ছিঁড়ে অর্থনীতির সঙ্গে জট পাকিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যাপ্রদাদের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বাস্তু ঘুঘু-তেই এ কথা খোলাখুলি স্বীকার করা হয়েছে। আমি কিন্তু সে প্রেমের কথা বলছি নে। আমি বলছি একেবারে খাঁটি প্রেমের কথা, যাকে বলে বিনয়-নম্রিতা প্রেম, গোয়া-সুচরিতা নয়—মিহেনপন্থে হরা-হরেণ।

খুব খুশী হয়েছিলাম শুনে যে, আমাদের ক্লাসের একটি শিশুপ্রাণ ছাত্র-শিক্ষক আর একটি ছাত্রী-শিক্ষিকাকে ভালোবেসে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে 'তছনছ' হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবু হৃদয়বৃত্তির এই যে সদ্যোজাগ্রত একমুখী জাগরণ এইটেই সমস্ত দৃষ্টিকে মেলে দেয়। ঐ যে দূর থেকে মেয়েটির হাত-ছানি আর কাছে এসে কর্কশ ব্যবহার, আবার দূর থেকে ছেলেটির অন্ধ আবেগ, কাছে গেলে মূক অথচ সতর্ক ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি—মনের এই সব বিভিন্ন দিককে এমনি করে একটু আধটু ব্যবহার করা ভালো। সাহিত্য করতে গেলে তাদের যে কাণ্ডাকাণ্ডের জ্ঞান থাকা অবশ্য উচিত—সে কথা তো সংস্কৃত শাস্ত্রেও বলে থাকে।

বিপদ আছে অবশ্য। কারণ এই স্তরে মেয়েদের আর ছেলেদের মধ্যে সাধারণতঃ ব্যবসায়িক প্রেমই বেশী করে দেখা দেয়; খেলার চেয়ে অত্যাচার, আনন্দের চেয়ে বিকৃতি বেশী আসে। তবু, এত উঠতি-পড়তির মধ্য দিয়েও এক সময় তো ক্রিস্তফের প্রতিভা জাগতেও তো পারে।

মনের এই শক্তি যখন জাগবে, তখনই ছেলেদের প্রতি সুবিচার করা সহজ হবে। সহানুভূতি-মধুর-মর্যাদাবোধ সব কিছু প্রস্তুত থাকবে যখন শিক্ষক আসবে ছাত্রদের সাহচর্যে।

সুধেন্দুর সঙ্গে আমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? সুধেন্দু নিরীহ, ভীরু, সব কিছুতে সঙ্কোচ, ত্রস্ত ভাব। শরৎচন্দ্রের রমাকে ভগবান পুরুষ গড়তে গড়তে মেয়ে করে গড়েছেন—সুধেন্দুর বেলাতে একেবারে উলটো। ক্রন্দনমুখী তার চেহারা, চোখ দেখলে স্বভাবতই মনে হবে, পরের উপর নির্ভর করবার জন্যে সে কাতর দৃষ্টি মেলে আছে। কাজ দিলে 'পারব না' বলে করে ভীত হয়; আর ভীত হয় বলেই ঠিক মতো করে। ছাত্রদের বিদ্রূপ তাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু প্রতিবাদ তার কণ্ঠে একেবারেই নেই; অথচ apostropho চিহ্নের মতো একটা অস্তিত্ব জানিয়ে দেয় প্রতি-বাদের। পড়ে সপ্তম শ্রেণীতে।

আমি দেখেছি একে। কিন্তু আমার ভাববার সময় নেই। আমি জানি কি করে একে শোধরাতে হবে। অভিজ্ঞেরা বলেন, সহানুভূতির ইঙ্গিত দিতে হবে, কিন্তু সহানুভূতি দেখানো চলবে না, বিপদে শিক্ষকের কাছে আশ্রয় সে পাবে বলে মনে করবে, কিন্তু আশ্রয় তাকে সত্যিই দেওয়া হবে না; অল্প করে সুদীর্ঘ সময়ে তাকে ছাত্রদের দলের স্তরে টেনে আনতে হবে।

পদ্ধতিটি যেরূপ তাতে প্রেম এবং ধৈর্য দরকার। অথচ জলো প্রেম নয়। কাণ্ডাসম্বিতত্বের উপদেশ মূল্যে। আমার সেরূপ নেই। অনেক শিক্ষকেরই এ ধৈর্য নেই। থাকলেও, এ বয়সে এই ছেলেদের কোনো উন্নতি হবে কিনা সন্দেহ।

এদেরই জন্য দরকার ছিল সার্দারী ইস্কুল, কিণ্ডারগার্টেন। আর সেইগুলিই আমাদের শিক্ষাজগতে একেবারে উহ্য।

ছেলে বাড়লে হাই-ইস্কুল বাড়ে। হাই ইস্কুলের জন্য সরকার অযাচিত টাকাও হয়ত দেবেন—কিন্তু সার্দারী কিংবা কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল আজ পর্যন্ত

কটা বাংলাদেশের ভাগ্যে জুটল ? অন্ধ, পঙ্গু, অথর্ব, মানসিক রোগগ্রস্ত আর ব্যাধিগ্রস্ত ছেলেরা এসে তাই হাই ইস্কুলে ভীড় করে, তাই তারা সকল ক'রে পাস করে, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দল বাঁধে ; মাঠের পেটে (অনাস্থিকে ব'লে রাখি শিক্ষকেরা আত্মরক্ষার জন্যে ওদের ক্রিকেট-পেটানো হাতটা, শিক্ষাজগতে গলদ ঘটাচ্ছে যারা তাদের দিকে যাতে ওঠে সেইদিকে তৎপর হোন)।

সুখেন্দুর মতো অনেক ছেলে আছে। তাদেরকে সুখ করে তুলবার মতো অনেক শিক্ষকও আছেন। কিন্তু এসবের হিসেবই বা নেবে কে, আর সে সব করবার সুযোগই বা দেবে কে ? কেন, মাগগীভাতা তো শিক্ষকদের দশটাকা ক'রে দেওয়া হয় ! সরকারী কর্মচারীদের চল্লিশ টাকা বটে, কিন্তু তাদের চেয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব তো রাষ্ট্রের দিকে বেশী নয় ! সেই দশটাকার কাজই বা তাঁরা কতটুকু দেখান ! লোকেও সরকারের যুক্তি শুনে মনে করেন, বাহা-বাহা ! একটাকা সেরের দুধেও যদি জল থাকে তবে সে নির্ঘাৎ গোরুরই দোষে।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। আমাদের শিক্ষাজগতটা একবার দেখুন। প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা উঠলেই, সরকারী বিভাগ পণ্ডিতের মতো মন্তপূর্ণ নাসিকা তুলে উদাসিক হয়েন। অথচ হাই-স্কুলের খবরদারী কে করবেন তাই নিয়ে মারামারি। গাছের ফলটা কে খাবে তাই নিয়ে ভাবনা। অথচ গাছে জল দেবার নাম নেই। আসল কথা, ঝগড়া বেধেছে নিয়মিত কর্মচারীর সঙ্গে পেন্সনভোগীদের। পেন্সন নিয়ে সংসার আর চলছেনা, তাই বাড়তি-কাজ জোটানোর কর্মী-আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ থাকলে, হরচন্দ্র রাজার রাজ্যে 'জুতা আবিষ্কারের' বদলে এখন 'শিক্ষা আবিষ্কার' লিখতেন।

শুক্রবার—

নাচনা হচ্ছিল, মানে নৃত্য।

রাস্তার ধারে একটা ইস্কুল। সন্ধ্যাবেলা কি একটা উপলক্ষে ওখানে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওখানে ছোট ছোট মেয়েরা নানা রকম নৃত্য দেখালো আর ছেলেরা করল আবৃত্তি। কারখানার মতো এই ইস্কুলটার দুটো শিফ্‌ট আছে, সকাল আর দুপুর। সকালের পড়াবার ঘণ্টাগুলো আধঘণ্টায় কম ক'রে, তিনঘণ্টায় সাতটা পিরিয়ড, মাঝখানে দশমিনিটের টিফিন পিরিয়ড আছে। দেয়ালে টাঙানো নোটিশবোর্ডেই দেখতে পেলাম।

অনেক লোক জমায়েত, অভিভাবকেরাই বেশী, বড়-মেয়েদের দিয়ে নৃত্যাদি করা যায়নি। সেরকম করলে আজকাল, সমগ্র লালবাজার থানাটা অনুষ্ঠানে উঠিয়ে নিয়ে এসে বসাতে হয়। সেদিন এক 'ইনস্টিটিউটে' যে কাণ্ড ঘটে গেল, তারপর থেকে আগুন নিয়ে আর কেউ খেলা করে না।

অনেকে বলাবলি করলেন 'অমুক মেয়েটি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে' কিংবা 'অমুক ছেলেটি বেশ talented' ইত্যাদি।

শুকমুখে হাসলাম।

সব ইস্কুলেই দুচারটে talent থাকে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যায়, কোথায় যেন তারা হারিয়ে গেল। নিজেদের শৈশবের কথা জানি, সহপাঠিদের শৈশব দেখেছি। জীবনের সুদীর্ঘ কালে ঘটনার পারম্পর্য অজ্ঞাতসারে যেসব ব্যাখ্যা রেখে গেছে, তাতে মনে হয়, প্রতিভা ব'লে আসল কোন বস্তু নেই—ওটা অপর মানুষদের সাময়িক দুর্বলতা আর সহানুভূতির স্বীকারোক্তি। দশটা ব্যক্তির গুণ নয়, তার চেয়ে বেশীটা দর্শক আর অভ্যাগতদের দয়া।

তবু হাতে পানি পেতেই হবে। আমাকে প্রশ্ন জুড়ে জুড়ে ইস্কুলের আগাগোড়া রঙীন ফানুস পড়তেই হবে।

ছেলেদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে ইচ্ছে করে ; সময় নেই। ইচ্ছে করে, ওদের নিয়ে কোনো এক অখ্যাত যুগের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গিয়ে, নারদাবে দিয়ে ইতিহাসে পড়িয়ে আসি, পড়ানো নেই। ইচ্ছে করে, ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো চিঠি লেখালেখি ক'রে চিঠি লেখার আসল কথাটা বুঝিয়ে দিই ; কিন্তু রেশনের দোকানে দৌড়োতে হবে। শান্তিনিকেতনের গাছ-পালা হাতছানি দেয়, মনে হয় অমনি ক'রে যদি একটা ইস্কুল গড়তে পারতাম ; কিন্তু চাত্র হত না।

ইস্কুলগুলো গড়ে উঠেছে, চাকরীর আশ্রয়স্থল হিসাবে ; জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণের জন্যে নয়। যত ইস্কুল বেশী হবে তত বেকারের 'হাতের পাঁচের' হিসেব পাবে। শিক্ষা পাওয়া বড় কথা নয়, ইস্কুলে Employment পাওয়াই বড়ো কথা। তাই চুরি করতে হয় ছাত্রসংখ্যা, তাই দরকার গভর্নিং বডির—

সেই চাকরীকে কন্টেন করবার জন্যে আছে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। এই ট্রেনিং যাতে সকলে না পায়, তারই জন্যে ব্যবস্থা হল, দিনের বেলাতে সকল কাজ কর্ম ছেড়ে উপোস ক'রে ট্রেনিং নেওয়া। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। তবু বাবা মানলনা। চাকরীর তাগিদ বড় তাগিদ। অতএব নেও শিক্ষার এম-এ ডিগ্রী। আরও দুবছর টালীগঞ্জের খালে হাবুডুবু খাও।

ছোটবেলা প্রথম যখন পয়ার টায়ারে উঠি, তখন কেবিনে সাদাসাদা চাকার মতো বস্তু টাঙানো থাকতে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—ওগুলো কি ?

—ওগুলো বয়া।

—কি হয় ?

—জাহাজ ডুবলে, বুকে বেঁধে সাঁতার কাটতে হয়।

সাঁতার তা হলে জানতেই হয় ?

—হুঁ।

সাঁতার না জানলে বয়ার কাজ হয় না। যত কোয়ালিফিকেশনই বুকে ঝুলাই না কেন, চাকুরী ক্ষেত্রে বুকনি থাকা চাই। এম-এ পাশ ক'রেও শিক্ষা জগতে যে আপনার ভালো চাকরী হবেই একথা বলা যায় না।

কাজেই, অনেক talent এমনি করে ইস্কুলের বার্ষিক উৎসব পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। আর শিক্ষকও তেমনি চাকরী হিসেবেই শিক্ষকতা গ্রহণ করছেন, জাতির উন্নতির জন্যে নয়।

ট্রেনিং নিচ্ছি আমরা সেই চাকরীতে উন্নতি করবার জন্যেই। এই পাঠ-পরিবেশ নির্বাচন, পরিদর্শকের রুটিন নির্দেশের জন্যে যে সব তরলিত ভাব, সবই একসময় চমাট বেঁধে যাবে। যেন ডাকঘরের সেই কালোকালো গালা ; গালিয়ে খামের উপর যখন দেওয়া হল, মনে হল, কত কীই না জানি একে দিয়ে হবে। তারপর একসময় কটিন শীলমোহরের ছাপ তাতে চিরকালের জন্য নামগোত্র এঁকে দেয়। বি-টি ছাপটিও তেমনি অমনি চিরকাল অক্ষর থাকবে, আর কিছু নয়।

কত পড়েছি, কত জেনেছি, কত ভেবেছি, কত আলোচনা করেছি—কিন্তু ব্যবহার করার ক্ষেত্র পাইনা কেন ?

ক্ষেত্র তৈরী করে নিতে হবে,—নিজেকেই।

আবার শুধু হাসি হাসলাম।

লিলি ব্রাণ্ড বালি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বালি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : চৈত্র, ১৩৬৫

সূচী

আলোচনা ৬৫
জীবনচর্চায় কাব্যের স্থান ৬৭
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
শিশুর শাসন ৬৯
শ্রীনীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
মাতৃভাষা ৭৩
শ্রীহরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য
সৃজনাত্মক শিক্ষা ৭৫
শ্রীগীরেশ্বর চক্রবর্তী

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৩৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

মাসিক কল্যাণকৃৎ শিক্ষিত্ব্যুপর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৬৫ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

আসন্ন পরীক্ষার রটিকা—

আমাদের বিদ্যালয়গুলি এখন পরীক্ষাগারে পরিণত হইয়াছে। সম্বৎসরের পরিশ্রম যাহা করা হইয়াছে এখন তাহার ফল দেখাইতে হইবে। সেকালে অনেক জায়গায় লোক বৎসরে একবার করিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিত; এখন পরীক্ষাগারে ছেলেরা ভোগে। পরীক্ষার আতঙ্ক কমাইবার জন্য সারা বৎসরের কাজের হিসাব নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা কতটা চালু হইবে বলা কঠিন।

অথচ পরীক্ষা না হইলে বিদ্যা আছে কি না তাহাই বা কে বলিবে? সেকালের গুরুগৃহে বাস আজকালকার খাদ্যসঙ্কটের দিনে সম্ভব নয়। কাহার উৎকর্ষ কোন দিকে, বিচক্ষণ গুরু বলিয়া দিতেন। এখন ছাত্রের প্রদত্ত উত্তর পরীক্ষা করিতে হয়, শুধু মনোবৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার উপর নির্ভর করিতে কেহ চাহিবেন না।

গোল বাধায় অগভীক বিপদ। পরীক্ষক খাতা লইয়া বসিতে বসিবেন, দেখেন প্যাকেটে কাগজ নাই, কে যেন কতকগুলি বড় পুঁটিয়া রাখিয়াছে। ভাঁজে ভাঁজে। হয়তো বা মুটের মাথায় বসাইয়া দিয়া চলিয়াছেন, পিছন ফিরিয়া দেখেন সে মুটেও নাই কাগজও নাই। হয়তো পরদিনই সকালে তাঁহার মেয়ে পুঁটি দোকান হইতে ঠোঙা করিয়া বিস্কুট আনিয়াছে, সেই ঠোঙা যে তাঁহারই এবারকার পরীক্ষার খাতার কাগজে তৈয়ারী! বিপর্যয় আর কাহাকে বলে।

যাহা হউক, পরীক্ষা ছাড়া পথ নাই। কড়া পাহারা দিলে সন্ধ্যার অন্ধকারে লোহার রড় দিয়া শিক্ষকের পাঁজর ভাঙিবার কথাও নিতান্ত কাল্পনিক নয়। বিপদ আছে, থাকিতে আছে, তবু অন্য পথ কই!

অধ্যাপক অনাথবাবুর ভাষণ

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু মহাশয় মেদিনীপুর জেলাবোর্ডে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে দুই চারিটি ভাবিবার কথা বলিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, সমগ্র বিদ্যালয়ের জীবন

রূপান্তরিত হইয়া উঠুক, শিক্ষালয় প্রকৃতই বিদ্যার আলয় হউক। সেজন্য তিনি বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের অন্তর্ভাগীয় প্রধান শিক্ষকদের নিকট মর্মস্পর্শী আবেদন করিয়া বলিয়াছেন, সাবাস চুনকাম করিলে কিছু হইবে না। হাঁড়া বদ্‌চে ঘুই-ই বদলাইতে হইবে। তিনি যথার্থই নিন্দা করিয়াছেন যে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে নেতা গড়িতে পারিতেছি না, শুধু পাশের কিকির বলিয়া দিতেছি, কোচিংক্লাস খুলিয়া বসিয়া আছি। বিদ্যালয়ে সমাজজীবন কই, জীবন কই! সংক্ষিপ্ত ভাষণ, কিন্তু চিন্তাশীল প্রধান শিক্ষকের মর্মস্পর্শী ভাষণ, সুতরাং বহু পঠনীয়।

কিন্তু পথ কোথায়? 'রাজনীতির পথ মাড়াইও না, ওপথে পদে পদে বিপদ'—শুধু এ কথা বলিলেই তো চলিবে না, আমরা যে সভাপতির জীবনের অভিজ্ঞতার ফল পাইতে চাই। বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান,জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের বিবরণ জানিতে চাই, যাহাতে প্রধান শিক্ষকেরা উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন। তাঁহারাও তো নূতন নূতন পথে চলিতে চান!

পরলোকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী

গত ৮ই এপ্রিল বুধবার শ্রীরামপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুষমা সেনগুপ্ত মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে স্বীয় কর্মস্থল শ্রীরামপুরে প্রাণত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি সর্বদাই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলেই কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। গত পূজাবকাশে তিনি রাঁচীতে যান। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হয়। আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের ক্ষতির আশঙ্কাতে তিনি ছুটি লইয়া আর কিছুদিন তথায় থাকিতে অসম্মত হন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে শ্রীরামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী কর্মীর অভাব দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিবে।

শ্রীরামপুরে একদিকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে, অপর দিকে মহিলাদের নানা উন্নয়নমূলক কাজে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়।

৮ই এপ্রিল প্রাতঃকালে শ্রীরামপুর নগরে এই দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুরের বিশিষ্ট জনগণ শিক্ষিকাদের আবাসস্থলে সমবেত হইয়া মৃতের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং শোকার্ত আত্মীয়পরিজনবর্গ, সহকর্মিবৃন্দ ও ছাত্রীগণ শোকাকুল হৃদয়ে যথোচিত সম্মানসহকারে মৃতের সৎকার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। নগরের সমস্ত স্কুলকলেজ বন্ধ রাখা হয়।

দেশের সংগঠনের সময়ে এইরূপ একটি প্রদীপ্ত কর্মজীবনের অবসান শুধু বেদনাদায়ক নহে, ক্ষতিকারকও বটে।

— —

জীবনচর্চায় কাব্যের স্থান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কেউ কেউ বলেন, কাব্যের দিন গত হয়েছে। তাই কি? এই টেক্‌নলজির যুগে পুরোহিতের আসনে বসে আছেন ইঞ্জিনীয়ার এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই ব'লে বিজ্ঞানের যুগে কাব্য অচল—এমন কথা অযৌক্তিক। কাব্যের কাজ মানুষের অনুভূতি নিয়ে। কেউ কেউ কি বলতে পারে, টেক্‌নলজির যুগে মানুষ আর আগের মতো সংবেদনশীল নেই? তার রক্তে ভাবের আবেগ তেমন করে আর ঢেউ তোলেনা? এ যুগের কচেরা কি কলেজে-পড়া দেবযানীদের ভালোবাসেনা? বিংশ শতাব্দীর তরুণী দেবযানীরাও কি লাজুক হৃদয়ের পর্ণপুটে কচদের জন্যে প্রেমের মধু লুকিয়ে রাখে না? সেই যুগের শকুন্তলার ভালোবাসার খেলা কি আজও চলছে না কুঞ্জবনের ছায়ায় ছায়ায়? পৃথিবীতে নতুন সমস্যা বলে সত্যিই কি কিছু আছে? সেই চিরপুরাতন সমস্যাগুলিই তো যুগে যুগে নতুন নতুন নরনারীর জীবনে ঘটে চলেছে। সেই আনন্দের এবং বেদনার অনুভূতিতে মানুষের হৃদয় আজও দুলছে। মৃত্যুর কালো ছায়ার দাঁড়িয়ে অমৃতকে আজও সে কামনা করছে নচিকেতার মতো।

কবিতার কারবার মানুষের চিরকালের অনুভূতি-গুলিকে নিয়ে। দুঃখ-সুখ আশানৈরাশ্যের অনুভূতিতে নরনারীর হৃদয় যতদিন দোলায় দুলবে ততদিন পৃথিবীতে কবিতার প্রভাবও থাকবে। ইঞ্জিনীয়ারদের জন্যে এযুগে কোন গৌরবের আসন থাকবেনা—এ চিন্তা অভাবনীয়। টেক্‌নলজির প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে যাওয়া নিশ্চয়ই মূঢ়তা। কাব্যের মূল্যকে খর্ব করার চেষ্টা করাও কি কম মূঢ়তার পরিচায়ক?

সম্প্রতি Emil Ludwig এর লিঙ্কন পড়ছি। একজায়গায় লেখা আছে: Shakespeare is continually in his hand, and he quotes out-of-the-way passages from this author. সেক্সপীয়ার ছিলেন লিঙ্কনের নিত্য-সঙ্গী। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে লিঙ্কনের জীবনের উপর দিয়ে যখন ঝড় ব'য়ে চলেছে, সেক্সপীয়ারের কবিতা আবৃত্তি করে হৃদয়ের বোঝা তিনি হাল্‌কা করতেন। বিশ্বের যখন সমস্ত আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আঘাতে আঘাতে অন্তর যখন ক্ষতবিক্ষত, আশ্রয় যখন কোথাও নেই তখন লিঙ্কনের নিঃসঙ্গ হৃদয় সান্ত্বনা খুঁজে পেতো বার্ণসের কবিতায়। Emil Ludwing লিঙ্কনের এই সময়কার জীবনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: He tried to compose his nerves by reading Burns.

Ward Hill Lamon ছিল লিঙ্কনের চেয়ে বয়সে উনিশ বৎসরের ছোট। লিঙ্কন তাকে হিল্ বলেই ডাকতেন। দুজনের মধ্যে চরিত্রগত মিল ছিল না বললেই চলে। লম্বাটে ছিল খাড়ুতো মনের বোতল আর খোড়া নিয়ে। লিঙ্কন মদ স্পর্শ করতেন না, জুয়া খেলতেন না, নারীঘটিত দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। হিল কিন্তু ছিল ভণ্ড মানুষ। যেমন গাইয়ে, তেমনি বাজিয়ে। এইখানে ছিল হিলের প্রতি লিঙ্কনের আকর্ষণের রহস্য। জীবনের রণপথে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে লিঙ্কনের হৃদয়াকাশে যখন বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে আসতো হিলকে তিনি বসন্তের ব্যাঞ্জো (banjo) বাজিয়ে গান করতে। হিল গান গাইতো আর সুরের মায়াতে লিঙ্কনের বৈরাগ্য কোথায় মিলিয়ে

যেতো। সল্ (Saul) জানতেন ডেভিড্ তাঁকে কি দিতে পারে। তাই হিল না হলে লিঙ্কনের চলতো না।

গানকে আমরা কবিতার সগোত্র বলে ধরে নিতে পারি। প্লেটো যেখানে musicকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলেছেন সেখানে musicএর অর্থে কবিতাকেও ধরা হয়েছে। লিঙ্কনকে গান শোনাতো হিল্। সল্‌কে (Saul) শোনাতো ডেভিড্ আর গান্ধীকে মহাদেব দেশাই। লিঙ্কনের সঙ্গে গান্ধীর মিল অনেকখানি। গৃহযুদ্ধের আগুন চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে লিঙ্কন ছিলেন কত একা! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভারতবর্ষ যখন একটা জলন্ত অগ্নুৎগৃহ তখন সেই অগ্নুৎগৃহের মধ্যে গান্ধীও কত নিঃসঙ্গ। জীবনের সেই অন্ধকারময় নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মহাদেব দেশাই গান্ধীজীকে মৃদুকণ্ঠে শোনাচ্ছেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।' কখনো শোনাচ্ছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে একলা চলরে।' মহাদেব দেশাইয়ের সেই গানের সুরে গান্ধীর হৃদয় থেকেও কি বিষাদের বোঝা নেমে যেতো না? জীবনের তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে আশার অরুণালোকে রাঙা হয়ে উঠতো না? গান্ধীর জীবনের কত হতাশাময় বেদনাময় মুহূর্তকে বিশ্বাসে, আশায়, উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত! বাইরনের কবিতা পড়ে মাজিনি স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রচুর প্রেরণা পেয়েছিলেন—এ সংবাদ ক'জন রাখে? নেপোলিয়নের হাতে তলোয়ার থাকলেও পকেটে থাকতো হোমার।

প্লেটোর শিক্ষার পরিকল্পনায় ব্যায়ামচর্চার আর কাব্যচর্চার স্থান পাশাপাশি। মার্কিন মনীষী উইলিয়াম জেমস্ (William James)—যাঁকে এযুগের অন্যতম মনীষী Whitehead বলেছেন that adorable genius—তাঁর The Gospel of Relaxation প্রবন্ধে প্লেটোরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন :

I hope that here in America more and more the ideal of the well-trained and vigorous body will be maintained neck by neck with that of the well-trained and vigorous mind as the two coequal halves of the higher education for men and women alike. The strength of the British Empire lies in the strength of character of the individual Englishman, taken all alone by himself. And that strength, I am persuaded, is perennially nourished and kept up by nothing so much as by the national worship, in which all classes meet, of athletic outdoor life and sport.

মেয়েদের শিক্ষার পরিকল্পনায় দেহ আর মন সমান মর্যাদা পেয়েছে আর এ বিষয়ে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে তিনি কোন তফাৎ করেন নি। উদ্ধৃত হাওয়ার খেলাধূলা ইংরেজের ব্যক্তিগত চরিত্রকে গড়ে তোলার ব্যাপারে কতখানি সাহায্য করেছে—সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রায় জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছি, ছেলেদের খেলাধূলার জন্যে মাঠের কত অভাব। এ বিষয়ে ভাববার দিন কি আজও আসে নি?

মনের জীবনকে সতেজ এবং সুসজ্জিত করে গড়ে তোলার ব্যাপারে কাব্যচর্চার একটা অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। গ্রীকেরা ছিল সৌন্দর্যে অনুরাগী আর সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জাগানোর জন্যেই কাব্যের উপরে প্লেটোর এত জোর। সুন্দরকে ভালোবাসলে সমস্ত আচরণের মধ্যেও সুরুচি ফুটবে, জীবনটাকে একটা আর্টে পরিণত করবার জন্যে মনে ব্যাকুলতা জাগবে। আমাদের মফঃস্বলের শহরগুলি এত নোংরা হয়ে আছে কেন? যাঁরা কমিশনার তাঁদের মনে সৌন্দর্যানুরাগের অভাব

আছে বলে। কেন এ অভাব? শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের মনে সৌন্দর্যবোধ জাগানোর ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। সূর্য পৃথিবী থেকে কত দূরে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী কেমন করে ঘুর পাক খেতে খেতে চলেছে—এ শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা পায়। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রছাত্রীদের কি কোনদিন দেখান, পরবাস্তরালে সূর্যোদয়ের দৃশ্য কত সুন্দর! কাব্যকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা কতটুকু ব্যবহার করে থাকেন ছাত্রছাত্রীর মনকে সন্তোষ এবং সুবাসিত করবার জন্যে?

সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জাগাতে হবে ছেলে- পড়ে ছেলেমেয়েরা সুন্দরকে ভালোবাসতে শিখবে।

মেয়েদের মনে। যে মন সৌন্দর্যকে ভালোবেসেছে সে মন তো কুৎসিতকে কিছুতেই বরদাস্ত করবেনা। বাহিরটা তো ভিতরেরই প্রতিচ্ছবি। সুন্দরকে আমরা যত গভীর করে ভালোবাসবো আমাদের গ্রামগুলির এবং শহরগুলির চেহারায় ততবেশী পরিবর্তন আসবে। আর এইখানেই কাব্যচর্চার সার্থকতা। কাব্য আমাদের মনকে সৌন্দর্যমুখী করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে ফলবতী করতে হলে টেক্‌নিশিয়ানকে প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু আরও প্রয়োজন আছে কবিদের যাঁদের লেখা

শিশুর শাসন

শ্রীমতী হারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান কালে শিশুদের শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্বলিত উপায় ও উপকরণ সৃষ্টি, নানাবিধ সংস্কার ও আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে এবং দিনে দিনে আরও উন্নততর প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। শিশুর শিক্ষার এই সকল নব নব রীতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অভিভাবকগণের মধ্যেও একটা মারাত্মক এবং অদ্ভুত মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়াছে যে শিশুদের শুধু আদর আর ভালবাসার মাধ্যমেই গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহারা যত অন্যায় আবদার বা অশোভন আচরণ কিম্বা কুৎসিৎ বাক্য ব্যবহারই করুক না কেন, তাহাদের শুধু বাপু বাছা, আদর আহ্লাদ করিতে হইবে; তাহাদের কোন প্রকার সামান্যতম শাসন করাও চলিবেনা। প্রহার করাতো অমার্জনীয় অপরাধ, কোনরূপ শারীরিক শাসনই বর্বরতা, এমনকি মৃদু তিরস্কারেও তাহাদের স্নায়ুতে ঘাপন লাগিয়া মারাত্মক বৈকল্য ঘটিয়া যাইতে পারে, সর্বনাশ! শিশুরা তাহাদের খেলার মধ্যে মারামারি করিয়া রক্তারক্তি পর্যন্ত ঘটায়; গালি-গালাজ, ঝগড়া, বকাবকা অনেক প্রকারের অনেক দুর্বৃত্তপনাই করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয়না শুধু অভিভাবক বা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুইএকটা মৃদু শাসনেই শিশুর ভবিষ্যৎ চিরজন্মের মত তালিয়া গড়িতে পারে এইরূপ অদ্ভুত মনোভাবের কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ করা কঠিন। শিশুকে সম্পূর্ণ শাসনহীন ছাড়িয়া দিলেই বরং তাহার সর্বনাশ অবধারিত। কথামালার সুবিখ্যাত মাসী বোনপোর গল্পটি কাহারো অজানা নাই। 'মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ' বলিয়া ডাকাত বোনপো মাসীর কান কেন কাটিয়া লইয়াছিল তাহা সুবিদিত। উক্ত গল্পটির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। গল্পটি

একটা চিরন্তন সত্যের মাঝেই স্থানলাভে সক্ষম হইয়াছে। শৈশবে ও বাল্যকালে মায়ের অফুরন্ত আদর, যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাসনের অভাবই যোলপোকে ডাকাতে পরিণত করিয়া তাহার ফাঁসীতে মৃত্যুর দণ্ড সম্ভব করিয়াছিল। যদি শৈশবে বা বাল্যকালে সে যোগ্য শাসন লাভ করিত তবে জীবনের পূর্ণতার সময়ে তাহাকে এই সুন্দর পৃথিবী হইতে ঘৃণিত দুর্নামে বিদায় লইতে হইতনা। ইহা একটি গল্প মাত্র কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহা চিরসত্য। আজকাল বহু অভিভাবকের নিকট হইতেই আমরা এই ধরণের উক্তি শুনি যে তাঁহাদের সন্তানদের আচরণে তাঁহারা লজ্জিত ও দুঃখিত, তাঁহাদের মাথা নত করিয়া দিয়াছে তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা। তাঁহারা আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকশিক্ষিকাদের নিকট আন্তরিক ভাবে অনুরোধ জানান তাঁহাদের সন্তানগণকে সংশোধন করিয়া দিবার জন্য। স্কুলের একঘন্টা অর্থাৎ ৪০।৪৫ মিনিটের একটিমাত্র ক্লাসে ৪০।৪৫টি ছাত্রের প্রতি নজর রাখিয়া ইহা কতখানি সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। অভিভাবকগণ তাঁহাদের আদরের সন্তানকেই প্রায় সমস্ত দিনেও যে সংস্কারে অপারগ তাঁহারাই আশা করেন স্কুলের শিক্ষকগণ ঐ অতি সামান্য সময়ের মধ্যে যেন যাদুবিদ্যাবলেই এই শোধন ও সংস্কার করিয়া দিবে। অতিরিক্ত আদর দিয়া, অন্যায় আবদার রক্ষা করিয়া শিশুবয়সে শিশুদের মধ্যে যে বীজ তাঁহারা বপন করিয়া দেন, উত্তরকালে তাহা আর সামলাইতে পারেন না। বহু শিশুর মাতাপিতার নিকট তাঁহাদের সন্তানের আলোচনার সময় তাঁহাদের মনের আভাস পাইয়াছি যে তাঁহাদের সন্তানের মত এমন ভাল ছেলেমেয়ে সহজে জন্মায় না। এই মনোভাবই সন্তানগণের সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠে ভবিষ্যৎ জীবনে। পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা খারাপ কিন্তু তাহাদের ছেলেমেয়ের মত এমনটি আর হয়না—পাড়ার অন্যান্যদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই আর কথা নাই। সেই পাড়ারই অন্যান্য বাড়ীর অভিভাবকগণের নিকট হইতেও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনিতে পাই। সবার ছেলেই সর্বোত্তম।—শুনি আর হাসি। হাসিও পায় আবার চিন্তিতও হই। অভিভাবকগণের এই মনোভাব শিশুরা খুব সহজে ধরিয়া ফেলে এবং ক্রমশঃ বাধা না পাইয়া ভবিষ্যতে তাহারা অবাধ্য ও দুরন্ত হইয়া উঠিতে থাকে। বড় বড় শিক্ষিত পরিবারেও এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছি। শুধু শিশুদের শিক্ষাই সব নয় অভিভাবকগণেরও এদিকে কিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নতুবা ভবিষ্যতে সামলাইতে পারিবেন কেমন করিয়া।

বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত একটি কথা আছে যে মানবগণ জন্মগ্রহণ করে পশুপ্রবৃত্তি লইয়া এবং ক্রমশঃ উৎকর্ষতার দ্বারা প্রকৃত মানব হইয়া গড়িয়া উঠে। এই মানুষ হইবার সাধনায় শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তদনুরূপ যথাযোগ্য শাসন অপরিহার্য, নতুবা শিশু আর মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবেনা—হইবে একটি পশু। অতিরিক্ত আদরদানও শিশুজীবন হইতে মানব জীবনে গড়িয়া উঠার পক্ষে মারাত্মক অন্তরায়। শিশু হাঁটিতে যাইয়া আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, অমনি চারপাঁচ জোড়া হাত ছুটিয়া আসিল, আহা-আহা করিয়া কেহ কোলে তুলিয়া লইল, বাপুরে, বাছারে করিয়া কেহ পায় পায় হাত বুলাইয়া দিল; কেহ বা খেলনা লইয়া, খাবার লইয়া ছুটিয়া আসিল—মহা ব্যস্ত। এইভাবে শিশুকে কোলচাপা রাখিয়া দুধেভাতে মানুষ করিয়া তোলা যাইতে পারে বটে কিন্তু এই আনবিক যুগে সে সম্পূর্ণ অচল থাকিয়া যাইবে। গৌরীশঙ্কর জয়, দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার, চন্দ্রে গমন, মহাকাশে বিচরণের যুগে তুলনামূলক ভাবে সে হইবে একটি কাদু।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বড় বড় শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুদের শাসনব্যবস্থাকে মোটেই বাদ দেন নাই, তাঁহারাও শাসনের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। শিশুদের শাসন করা উচিত নয়, ইহা একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তবে সেই শাসন মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথায় হইবেনা, তাহা হইবে দরদের শাসন; শিশুর ন্যায়অন্যায় বোধ জাগ্রত করিয়া, তাহার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া। শিশুকে আমরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকারে শাসন করিতে পারি, যথা (১) শাস্তির ভয় দেখাইয়া (২) প্রলোভিত করিয়া (৩) তাহার ন্যায়অন্যায় বোধ জাগ্রত করিয়া। এখন দেখিতে হইবে এই তিনটি প্রথার মধ্যে সর্বোত্তম কার্যকরী কোনটি।

(১) শাস্তির ভয় দেখাইয়া শিশুকে অতি সহজেই শাসন করিতে পারা যায়। বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার জন্য সাজা হইল একটি কার্যকরী উপায়। শিশুকে মারিয়া, ভয় দেখাইয়া শাসন করা যায় বটে কিন্তু ইহাতে বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা হইলেও শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য তাহাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহাতে শিক্ষার প্রতি শিশুর একটি ভয়ভাব জাগরিত হইবে, বিদ্যালয়কে সে ভয়ের চক্ষে দেখিবে এবং তাহার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব জাগরিত হইবে। শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যে আন্তরিক সহযোগিতা গড়িয়া উঠার প্রয়োজন তাহা খর্ব হইবে; পরিবর্তে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাকে ভয়াবহ একটা কিছু মনে করিবে। শারীরিক শাস্তি শিশুদের একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। মধ্যযুগীয় শিক্ষাবিদ্‌গণ বলিতেন যে শারীরিক শাস্তি ব্যতিরেকে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। Spare the rod and spoil the child—এই ছিল তাহাদের মত, কিন্তু বর্তমানে এই কথা কেহ স্বীকার করেন না। কারণ শারীরিক শাস্তিদ্বারা শিশুর মনে কেবলমাত্র ভয়ই উদিত হয় না, তার শারীরিক ক্ষতিও হইতে পারে। কানমলা, চপেটাঘাত এইসব করা উচিত নহে, কারণ এইসব শাস্তি দিলে অনেক সময় অসাবধানতায় শিশুর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে। তাহা ছাড়াও শিশু অনেক সময় একগুঁয়ে হইয়া উঠে—তাকে মারত খাইবই, তবে পড়া দিবি কেন। সুতরাং শাস্তি বা ভয় প্রদর্শনে যে শাসন তাহাতে শাসনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

(২) শাস্তির ন্যায় প্রলোভনের সাহায্যে শাসন করাও শিশুশাসনের আরেকটি উপায়। ইহাতে শিশু লোভে পড়িয়া শিক্ষালাভে উৎসাহী হয় বটে কিন্তু প্রলোভনের সাহায্যে শাসনও যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। শিশু কেবল পুরস্কারের লোভেই জ্ঞান অর্জনে রত হয়। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণ করেনা। পুরস্কারের লোভে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় যাহা পরে ফাঁকি দিয়া বা অসৎ উপায়ে প্রথম হইবার জন্য প্ররোচিত করে। বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণও প্রকারান্তরে প্রলোভনেরই নামান্তর বলা যায়। ইহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্রছাত্রীই তাহা লাভের চেষ্টা করে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই নাগালের উর্ধে মনে করিয়া তাহাতে নিরুৎসাহ বোধ করিয়া উদাসীন থাকে। ইহা বরং বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও অনিষ্টের পরিপোষক। প্রলোভিত শিশু যতক্ষণ শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক বা প্রলোভনদাত্রীর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণাধীনে থাকে ততক্ষণই মাত্র ইহা কার্যকরী হয়। আধুনিক সভ্য জগত প্রলোভনের সাহায্যে শাসন প্রথাকে এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল কারণে সমর্থন বা অনুমোদন করেনা। গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে ইহা প্রায় অচল। প্রলোভনের আশা অন্তর্হিত হইলেই এবং সুযোগ পাইলেই শিশুরা তাহা লঙ্ঘন করিবে। তখন আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। দ্বিতীয়তঃ লোভ জিনিসই খারাপ। ইহাতে কখনো কল্যাণ

হইতে পারেনা। অতএব শাস্তির ন্যায় পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া শাসন করাও ঠিক যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত নয়।

(৩) শিশুর মনে স্বাধীনতার বোধ জাগ্রত করিয়া তাহার প্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া যদি তাহাকে শাসন করা যায় তবে তাহাতে সুফল ফলিবে। কারণ এই শাসন উদ্দেশ্যহীন নয়। শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শিশুকে অসৎকার্য হইতে বিরত করিয়া তাহাকে সৎকার্যে লিপ্ত করা এবং তাহার সৎ অভ্যাস গঠন করা। তাহাকে এমনভাবে শাসন করিতে হইবে যাহার ফলে সে কর্তব্যপরায়ণ, আলস্যহীন, পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় এবং মিতব্যয়ী হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। শিশুর প্রকৃতিঅনুযায়ী শাসনই প্রকৃত শাসন। সুতরাং শিশুর প্রকৃতি কি চায় তাহা মানিয়া সেই অনুসারে শাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুর প্রতি যে দণ্ড প্রয়োগ করা হইবে তাহা শিশুমনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া গঠন করিতে হইবে।

কোন কোন শিশুকে আমরা অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বলি। দলের অন্যান্য শিশুর ন্যায় নিয়ম ও শাসন তাহারা মানিয়া চলেনা, কথা শুনেনা, কাজ করেনা। অনেক ক্ষেত্রে গোড়াতে অত্যধিক শাসন, দমন, বিধিনিষেধ ও চাপের ফলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ ও দণ্ডদ্বারা উপসর্গের সাময়িক উপশম ঘটিতে পারে কিন্তু রোগের দূরীকরণ সম্ভবপর হয়না। তাহার অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয় করিয়া তারপর রোগের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। শিশুকে তাহার বুদ্ধি,শক্তিও সামর্থ্যের অতীত কোন কাজ করিতে দিলে সে স্বভাবতই উক্ত কাজে আনন্দ ও অনুরাগবোধ করে না, সফলতার আত্মপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়। তখন তাহার ক্রীড়াচঞ্চল মন বিষয়ান্তরে আনন্দ পাইয়া ঐ কাজ প্রত্যাহার করিয়া অপর কাজে আকৃষ্ট হয়।

শিশুকে শাসন করিতে হইলে শাস্তি এবং পুরস্কার যে একেবারে বাদ দিতেই হইবে ইহাতেও বর্তমান যুগের বড় বড় শিক্ষাবিদ্‌গণ একমত নহেন। তবে তাঁহারা বলেন যে শাস্তি দ্বারা শিশুর কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একেবারে বাদ দিতে তাঁহারা বলেন নাই। শিশুর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে ও কর্মের দ্বারা যে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা চলিবেনা। যখন যাহা অন্যায় করিবে তাহা শোধন করিয়া দিতে হইবে। ক্লাসে ঘর নোংরা করা যে অন্যায় তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহার নিজের দ্বারাই সে ঘর পরিষ্কার করাইয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায় অনুষ্ঠানে শিশুদের দ্বারাই তাহা সংশোধন করিয়া লইলে তাহারা সহজেই বুঝিবে যে কোথায় তাহাদের অন্যায় হইয়াছে। তেমনি তাহাদের কোন প্রশংসনীয় কাজকে প্রশংসা করিয়াও তাহাদের সে বিষয়ে সচেতন করা যাইতে পারে। ইহাতে তাহাদের সংশোধনও হইবে, আবার উৎসাহও জন্মিবে।

এইভাবেই শিশুর শাসনের উদ্দেশ্য সফল হইবে, কাজে নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে এবং সে আনন্দলাভ করিবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীহরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

(লেখক শান্তিনিকেতন পাঠভবনের ছাত্র, গত মাঘ সংখ্যায় শিক্ষায় ইঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিক্ষার' বর্তমান প্রবন্ধে তরুণ ছাত্র-লেখক 'শিক্ষা'র উৎসাহী পাঠক ৺তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।)

এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, আমাদের ইংরাজী শিক্ষক ৺তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিগত বৎসরের ৮ই এপ্রিল (১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে) মঙ্গলবার রাত্রিতে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

আমি এই অধ্যাপকমহাশয়ের নিকট ৪র্থ শ্রেণী হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত (class V to class VIII) ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। তাঁহার নিকটই আমার প্রথম ইংরাজী ভাষার হাতেখড়ি হয়। এই চারি বৎসরে তাঁহার চরিত্রকে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, সশ্রদ্ধভাবে নিম্নে তাহাই বলিতেছি।

শুনিয়াছি, তাঁহার জন্মস্থান ছিল খুলনা জিলায়। ছাত্রজীবন তাঁহার কুচবিহার, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কাটিয়াছিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন এবং সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর কাল তিনি এখানকার পাঠভবনে অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত ছিলেন।

এরূপ বিচিত্র চরিত্রের অধ্যাপক আমি আর দেখি নাই। ছাত্রেরা তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। ছাত্রগণ তাঁহাকে 'তনয়দা' বলিয়া সম্ভাষণ করিত এবং তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এইখানকার অধ্যাপকগণও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও সমীহ করিতেন।

বাহিরে তাঁহার চরিত্রে একটা কঠোর আবরণ ছিল। কিন্তু নানা ঘটনাসূত্রে আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহার হৃদয় অতি কোমল। ছাত্রছাত্রীদিগকে তিনি পুত্রকন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন! কোন ছাত্রের অসুখ হইলে তিনি তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতেন। আমাদের ক্লাসের একটি ছাত্রের চক্ষুর রোগ ছিল। সেইজন্য তিনি তাহাকে ক্লাসে আসিতে নিষেধ করিতেন এবং ডাক্তার দেখাইয়া তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা করাইতে বলিতেন। তাহাকে (ছাত্রটিকে) তিনি লেখাপড়া করিতেও নিষেধ করিতেন। কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতেন না, কি করিলে ছাত্রটির চক্ষু নিরাময় হইবে সেই সম্বন্ধে ডাক্তারের সহিত পরামর্শও করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ছাত্রদিগকে মিষ্টি খাওয়াইতেন। ছুটির কাজের খাতা নিজেই দান করিতেন।

স্বাস্থ্য তাঁহার মোটামুটি ভালই ছিল। বেশী অসুস্থ হইতে আমরা তাঁহাকে দেখি নাই। প্রায় সব দিনই তিনি ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন। কচিৎ দুই একদিন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত। অবশ্য ছুটি লওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। কোন দীর্ঘ ছুটির আরম্ভের দুই একদিন পূর্বে ও খোলার দুই একদিনের মধ্যে অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ সাধারণতঃ ক্লাসে পড়াইতেন না। কিন্তু সেই দিনগুলিতে তাঁহাকে আমরা আরও বেশী করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি।

ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাংলাও তিনি প্রচুর পড়িতেন। সংস্কৃত এবং হিন্দীও তিনি ভালই জানিতেন। ইংরাজী এবং বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধশ্রেণীর বই পড়িতে

ভালবাসিতেন। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধই যেন বেশী পড়িতেন—তাঁহার কথাবার্তায় প্রকাশ পাইত। আধুনিক কয়েকজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের লেখাকে তিনি পছন্দ করিতেন না। ক্লাসে সেই সকল লেখকের নামও বলিতেন। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তর রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নানা শ্লোক আমার পিতৃদেবের নিকট হইতে আমায় মুখস্থ লিখাইয়া নিতেন। তাহা ক্লাসে পড়িয়া প্রত্যেককে তাহার (শ্লোকের) অর্থও বুঝাইয়া দিতেন। ইংরাজী ক্লাসে তিনি মাঝে মাঝে বাঙলার চর্চাও করিতেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি তিনি আমাদের ক্লাসে পড়াইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ক্লাসে বাঙলা ও সংস্কৃতের চর্চাও প্রচুর হইত। বলিতেন, "আগে নিজের মাতৃভাষা ভাল করে শেখ তারপরে অন্যের ভাষা শেখা সহজ হবে।"

হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে তিনি লেখকের প্রশংসা করিতেন। যাহাদের হস্তাক্ষর অসুন্দর, তাহাদিগকে তিনি খুব ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহার নিজের হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। প্রথম ইংরাজী শিক্ষার্থীদের তিনি টানা লিখিতে নিষেধ করিতেন। তিনি তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ class VII এ আমাদের টানা লিখা শিখাইয়া ছিলেন।

উচ্চারণ সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্তও তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন। নিজের উচ্চারণও তাঁহার অতি সুস্পষ্ট ছিল।

কোন ইংরাজী শব্দের অর্থ তিনি বাঙলায় বলিয়া দিতেন না। তিনি বলিতেন, "একই শব্দ নানাস্থানে নানা রকমের অর্থ প্রকাশ করে। কাজেই আমি যদি তোমাদের কোন ইংরেজী শব্দের অনুবাদ করে দিই তা হলে ঐ শব্দটি যখন তোমরা অন্য অর্থে পাবে তখন একটি মাত্র অর্থ জানা থাকলে সেই জায়গায় প্রকৃত অর্থ হয়ত তোমরা বুঝতে পারবে না। কাজেই এইস্থানে এই শব্দটি কিরকম অর্থ বুঝাইতেছে, তাহা জানিয়া রাখ।" ইংরাজী পড়াইবার সময় তিনি বাঙলায় কথা কহিতেন না। সকল কথাই ইংরাজীতে কহিতেন।

যে সকল স্থানে ইংরাজী না লিখিয়া অথবা না বলিয়া বাঙলা লিখিলে কিংবা বলিলে চলে সেই সকল স্থানে ইংরাজী লিখা বা বলা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, "আমরা বাঙালী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, কেন আমরা বিনা প্রয়োজনে ইংরেজী বলতে যাব? বাংলা ভাষা কি ইংরেজীর চেয়ে ছোট নাকি?" কোন ছাত্র কোনদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিলে পরে তাহাকে তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে অনুপস্থিতির কারণ লিখাইয়া আনিতে হয় এবং সকল শিক্ষককে দেখাইয়া পরে তাহা প্রধান শিক্ষকের (Head master) নিকট জমা দিতে হয়। ইহা আমাদের ইস্কুলের একটি নিয়ম। কোন ছাত্রের অভিভাবকের ইংরাজীতে লিখিত চিঠি দেখিলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট হইতেন। সেই ছাত্রকে বলিতেন, "এই ইংরেজীতে চিঠি লেখা তোমার অভিভাবকের গৌরবের বিষয় নয়। বরং এতে তাঁদের নিজের মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই বোঝা যাচ্ছে। এটা দুর্বলতারই পরিচায়ক।" এই প্রসঙ্গে আমাদের ক্লাসের একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার আমারই এক সহপাঠী টেনিসনের 'The Charge of the Light Brigade' কবিতাটিকে তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবিতা বলায় তিনি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এমন কি, তাহাকে উপহাস করিয়া এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটি রচনাও লিখাইয়াছিলেন।

ইংরাজী 'Rough' কথাটি তাঁহার অপ্রিয় ছিল। অমুক বিষয়ের 'Rough' খাতা এই কথাটি শুনিলে তিনি বলিতেন, "Rough কথাটির অর্থ খারাপ। কোন বিষয়ের খারাপ কাজের খাতা যে আবার থাকে, তাত আমি জানি না।"

আমাদিগকে ইংরাজী শিখাইবার তাঁহার প্রবল

আগ্রহ ছিল। নিজে কতকগুলি বই লিখিয়া তাহা তিনি ছাত্রদিগকে দান করিতেন।

আমরা যেদিন তাঁহার নিকট শেষ ক্লাস করি (১৭।৩।৮) সেই দিনও তাঁহার দেহে অসুস্থতা কিছুমাত্র লক্ষ্য করি নাই। সেইদিন তিনি আমাদের বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদ করার পরীক্ষা লইয়াছিলেন। এই ক্লাস করার পরদিনই তিনি রোগাক্রান্ত হন এবং কয়েকদিন পরেই ৮ই এপ্রিল রাত্রিতে দেহত্যাগ করেন।

যখন আমি খবর পাইলাম যে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন যেন ঠিক বিশ্বাস হইল না। পরে স্বচক্ষে শেষ শয্যায় তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম।

ভবভূতি উত্তররামচরিতে রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোঽহ বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এইরূপ শিক্ষাব্রতী, ছাত্রবৎসল এবং নিষ্ঠাবান অধ্যাপক সকল দেশেই দুর্লভ। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন—এই প্রার্থনা করি।

সৃজনাত্মক শিক্ষা

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী

ভূমিকা

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আচার্য-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল। তৎপরে আসিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ। এই শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপকেই আমরা গ্রন্থ-কেন্দ্রিক শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সত্য কথা বলিতে কি, এই আচার্য-কেন্দ্রিক, শিক্ষক-কেন্দ্রিক বা গ্রন্থকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভের কোন সুযোগই ছিল না। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের কেবল 'তোতাপাখিই' করিয়া তুলিত—তাহাদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ করিয়া তুলিতে পারিত না। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা ছিল সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত। তাহারাই ছিল কাব্যে উপেক্ষিতের দল। কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার 'ছাত্রধারা' কবিতায় এই শ্রেণীর ছাত্রদেরই এক অতি বিষাদ-খিন্ন চিত্র অংকন করিয়াছেন—

"কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ
শ্রমে কারো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হয়ে রয় ঘরে
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।
কেহ বা জানালা পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি
বিষাদের ছায়াখানি রাখি।"

কিন্তু এক্ষণে পটপরিবর্তনের কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শিশু আর কাব্যে উপেক্ষিত নহে। তাহার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা আজ জীবন-কাব্যের পাতায় পাতায় সর্বজনের শাশ্বত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকেন্দ্রিক শিক্ষা ধীরে ধীরে আজ—শিশুকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক—তথা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িতেছে। এই শিশু-কেন্দ্রিক, সমাজ-কেন্দ্রিক বা জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই আমরা সাধারণ-

ভাবে সৃজনাত্মক শিক্ষা বা Creative Education বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

এই শিক্ষার সংজ্ঞা

যে শিক্ষাপদ্ধতি শিশুজীবনের সমস্তার সঙ্গে তাহার শিক্ষার সংযোগ সাধন করে এবং যাহা দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তরপরম্পরা হিসাবে শিশুদের সৃষ্টিমূলক কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ দেয়, তাহাই সৃজনাত্মক শিক্ষা।

এই শিক্ষার অর্থ

সৃজনাত্মক শিক্ষার অর্থ কেবল জ্ঞানার্জন (Accumulation of knowledge) নহে। সৃজনাত্মক শিক্ষার অর্থ হইতেছে—নিত্য নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়া অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ। হোয়াইটহেড বলেন, There is only one subject-matter of education and that is life in all its manifestations. সৃজনাত্মক শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইতেছে প্রতিদিনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের মধ্য দিয়া জীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকাশকেই উপলব্ধি করা। প্রতিদিনের চাহিদার সমুদ্র-মন্থনে যে অভিজ্ঞতার সুধাভাণ্ড আমরা লাভ করি, তাহাই সৃজনাত্মক শিক্ষার অক্ষয় মূলধন। ডিউইর ভাষায় - knowledge is no longer an immobile solid. It has been liquified. It is actively moving in all the currents of society itself. জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে জানিবার বুঝিবার কৌতূহল। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে বহির্জগত প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিতেছে—আমাদের সৌন্দর্যপিপাসা ও রসবোধকে জাগিয়া করিয়া তুলিতেছে। মন যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যের আনন্দে অবগাহন করিয়া নিত্য নূতন অনুভূতির আবেগে নব নব সৃষ্টির পথে আগাইয়া চলে তখনই শুরু হয় তাহার যথার্থ সৃজনাত্মক শিক্ষা।

সৃজনাত্মক শিক্ষা ও কর্মের প্রকার ভেদ

প্রকৃতিভেদে সৃজনাত্মক কর্মের দুইটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্বিতীয়টি শিক্ষাসাপেক্ষ। যে সমস্ত সৃষ্টিক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্ততাবে বিকাশিত হয় তাহাই স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনাত্মক কর্ম। যেমন—খেলা, অভিনয় ইত্যাদি। যে সমস্ত সৃষ্টিক্ষমতা শৈশব হইতে শিক্ষা দিবার ফলে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় তাহাই শিক্ষাসাপেক্ষ সৃজনাত্মক কর্ম। যেমন—ডিজাইন করা, রচনা বা পত্রলেখা ইত্যাদি।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনাত্মক শিক্ষার স্থান

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনাত্মক শিক্ষার স্থান অতি উচ্চে। সৃষ্টি ও আবিষ্কার—শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বিশেষ ধর্ম। শৈশব হইতেই সৃজনাত্মক শিক্ষার মধ্য দিয়া সৃষ্টিশক্তি বিকাশের সুযোগ পাইলে তবেই পরবর্তীকালে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সকল দিক দিয়া অব্যাহত থাকে।

সৃজনাত্মক শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য

সৃজনাত্মক শিক্ষা শিশু-মনস্তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু শ্রোতা নহে, শিশু কর্মী। শিশু দ্রষ্টা নহে, শিশু স্রষ্টা। শিশু স্বভাবশিল্পী। কল্পনাশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, কৌতূহল, নেতৃত্বপ্রিয়তা, স্বাধিকারবোধ ও সংঘচেতনা—এইগুলি শিশুর মনে অতি প্রবল। সর্বোপরি শিশুর মন Static নহে, Dynamic। সৃজনাত্মক শিক্ষায় শিশু-মনস্তত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়াই শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সম্যক উন্নয়ন (Sublimation of instincts) ঘটে। শিশুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, শিশুর ব্যক্তিগত অভিরুচি, অনুরাগ, প্রবণতা, পারদর্শিতা ও শক্তি-সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সৃজনাত্মক শিক্ষার সামাজিক মূল্য

শিশুর জীবনের দুই কোটি। এক কোটিতে রহিয়াছে ব্যষ্টিজীবন ও অপর কোটিতে রহিয়াছে সমষ্টি-জীবন। ব্যষ্টিজীবন বলিতে শিশুর ব্যক্তি-

জীবন, পার্হস্থ্য-জীবন ও পারিবারিক জীবন এবং সমষ্টি-জীবন বলিতে শিশুর পৌরজীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্র জীবনকেই বুঝায়। সৃজনাত্মক শিক্ষায় শিশুজীবনের এই সকল দিকগুলিই যথাযথভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টি জীবনের মধ্যে কোথাই বিরোধ নাই। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' ব্যষ্টি-জীবনের পুষ্টির মধ্য দিয়াই শিশুর পৌর-জীবন, সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবন পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এখানেই সৃজনাত্মক শিক্ষার সামাজিক মূল্য।

সৃজনাত্মক শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য

সৃজনাত্মক শিক্ষার লক্ষ্য হইতেছে সকল দিক দিয়াই শিশুর সামগ্রিক বিকাশ। এই সামগ্রিক বিকাশ বলিতে যে কেবল শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও ভাষার বিকাশকেই বুঝায় তাহা নহে। ইহা শিশুর নাগরিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকেও সূচিত করে। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর মনে আত্ম-বিশ্বাস, আত্মসংযম, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বার্থত্যাগ, সেবাপরায়ণতা ও সহনশীলতার বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে সামাজিক উপযোজন ক্ষমতা (Social Adjustment) ও ব্যক্তিত্বের (Personality) অধিকারী করিয়া তোলে। চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও মননশীলতার স্ফুরণ এবং নির্ধারণশক্তি, নেতৃত্ব শক্তি ও গ্রাহিকা শক্তির (Receptivity of mind) যথাযথ বিকাশও এই শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এই সৃজনাত্মক শিক্ষার মধ্য দিয়াই শিশু সর্বসংস্কার-মুক্ত প্রগতিশীল মনোভাবের অধিকারী হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় এবং ইহাই কালক্রমে শিশুকে করিয়া তোলে—যুক্তিবাদী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অধিকারী। এই সৃজনাত্মক শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি লক্ষণীয় ফলশ্রুতি হইতেছে শিশুর মনে সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের যথাযথ বিকাশ।

সৃজনাত্মক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের কর্তব্য ও গুণাবলী

সৃজনাত্মক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি, তিনি যে কেবল শিক্ষাগত (Educational), বৃত্তিগত (Professional) ও ব্যক্তিগত (Personal) গুণাবলীরই অধিকারী তাহা নহেন,—তিনি সংগঠন-মূলক (Organisational), পরিচালনামূলক (Administrative), পরিদর্শনমূলক (Super-visory) ও সামাজিক (Social) গুণাবলীরও অধিকারী। তিনি রস ও রুচিজ্ঞান সম্পন্ন এবং সর্বসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মনোভাবের পরিপোষক। ছাত্রদের প্রতি তিনি সদাই সহানুভূতিপরায়ণ ও সংবেদনশীল। সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক উপযুক্ততা ও বিশেষ বিষয়ে যথোপযুক্ত পারদর্শিতাই নহে—শিক্ষা, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিশু-মনস্তত্ত্বের মূল তথ্যাদি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। জাতীয় কৃষ্টি ও জ্ঞাতব্য জ্ঞানের সহিত তিনি সুপরিচিত এবং দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাঁহার মনটি গ্রহণক্ষম (receptive)। সমীকৃত-ব্যক্তিত্ব (Integrated personality) ও সমীকৃত জীবন-দর্শনেরও (Integrated Philo-sophy of life) অধিকারী তিনি। শিক্ষকতা তাঁহার নিকট কেবল জীবিকার বৃত্তিমাত্র নহে—ইহা তাঁহার নিকট এক অনবদ্য কর্মব্রত বা Profession.

সৃজনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থায় অভিভাবকের কর্তব্য ও দায়িত্ব

সৃজনাত্মক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিভাবক যাঁহারা তাঁহাদের সংকীর্ণমনা হইলে চলে না। ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষকদের সহিত সহ-যোগিতা করিতে তাঁহারা সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। কারণ, যথার্থ সৃজনাত্মক শিক্ষা গৃহ ও বিদ্যালয় তথা শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপরেই

নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ শিক্ষা ছাড়াও বিদ্যালয়-কক্ষের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে পরোক্ষ শিক্ষার এক বিশাল সাম্রাজ্য। ছাত্রেরা যাহাতে এই জ্ঞান-সাম্রাজ্যে অবাধ সঞ্চরণের সুযোগ পায়—সৃজনাত্মক বিদ্যালয়ের অভিভাবক মাত্রই তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন। উপরন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক সংসদে মিলিত হইয়া শিক্ষা-সমস্যার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিতেও তাঁহারা সর্বদাই প্রস্তুত। দানাবিধ গৃহকার্য ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের মধ্য দিয়া ছাত্রদের মনে নিয়মানুবর্তিতা-বোধ ও নব নব রসানুভূতি জাগাইয়া তুলিতেও তাঁহারা সর্বদাই তৎপর।

সৃজনাত্মক শিক্ষার পঠন-পাঠন

সৃজনাত্মক শিক্ষার পঠন-পাঠন পদ্ধতি শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুরাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে শিক্ষাদান করা হয়। বংশানুক্রম, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়া ছাত্রে ছাত্রে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিতে পারে এই সহজ সত্যটিকে এখানে অবলীলাক্রমে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণ এখানে নানাপ্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া হাতে-কলমে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এখানে—ক্রীড়া-পদ্ধতি (play way method), কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি (Activity method), সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি (Project method), ডালটন প্ল্যান, উইনেট্কা প্ল্যান ইত্যাদি মনস্তত্ত্বসম্মত প্রক্রিয়াকলীরই অনুসরণ করা হয়। ছাত্রদিগের অগ্রগতির পরিমাপ সংরক্ষণের দিক দিয়া এই শিক্ষা-ব্যবস্থা গতানুগতিক রিপোর্টকার্ড প্রথার (Traditional Progress Report System) পরিবর্তে এক পৃথক ধরনের মনোবিজ্ঞান-সম্মত রিপোর্ট কার্ড প্রথারই (Cumulative card System) সমর্থন করে। কারণ, গতানুগতিক রিপোর্ট কার্ড শিক্ষার্থীর সর্বতোমুখী বিকাশের যথার্থ পরিমাপ প্রদানে অক্ষম। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় দৈহিক শাস্তিদান-পদ্ধতিও একেবারেই অচল। কারণ, ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত নহে। ইহা পারিতোষিক পদ্ধতিতেও তেমন আস্থা স্থাপন করে না। কারণ, ইহা ছাত্রের মনে সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গঠন না করিয়া প্রতি-দ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব গঠনেই সহায়তা করে। পুরস্কার-পদ্ধতির পরিবর্তে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে ও তদনুযায়ী পুরস্কার দিবার প্রয়াস পায়। ইহা ছাত্রদের স্মৃতিশক্তি বর্ধন অপেক্ষা তাহাদের মৌলিক মনন-শীলতা ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি গঠনের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দিয়া থাকে।

সৃজনাত্মক শিক্ষার পাঠক্রম

সৃজনাত্মক শিক্ষার পাঠক্রমের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার বহুমুখী বৈচিত্র্য। ছাত্রের ব্যক্তিগত অভিরুচি, অনুরাগ, আগ্রহ ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই পাঠক্রম রচিত হয়। জ্ঞানমূলক ও বৃত্তিমূলক নানা বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এই পাঠক্রমে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য পাঠক্রমের বহির্ভূত (Extracurricular) ও পাঠক্রম-সহায়ক (Co-curricular) নানাপ্রকার সৃষ্টিমূলক কর্মানুষ্ঠানেও সৃজনাত্মক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

সৃজনাত্মক শিক্ষার পরীক্ষা-পদ্ধতি

এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাবতাত্ত্বিক পরীক্ষা-পদ্ধতির (Subjective Test) পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিরই (Objective Test) সমর্থন করে। রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক পরীক্ষা-পদ্ধতিই শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমধিক ফলদায়ক। ইহার মূল্যায়ন-পদ্ধতি (Method of Evaluation) গতানুগতিক মূল্যায়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

সৃজনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় ও বোর্ডিং বাড়ীর রূপ

সৃজনাত্মক শিক্ষার বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্ত-শাসন-তন্ত্র (Students' Self-Government) প্রচলিত। ইহার শ্রেণীকক্ষগুলি স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত ও সুন্দরভাবে সজ্জিত। "বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ী" বলিতে যাহা বুঝায় সৃজনাত্মক বিদ্যালয় ঠিক তাহা নহে। ইহা যথার্থ ই জ্ঞানার্জনের অকৃত্রিম পীঠস্থান। Currey তাঁহার Education for Sanity গ্রন্থে এই জাতীয় বিদ্যালয়কেই—An actively functioning Society বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে—ইহা যেন সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থারই এক আদর্শভূমিষ্ঠ ক্ষুদ্র সংস্করণ। ডিউই এই জাতীয় বিদ্যালয়কেই বলেন—A miniature community and an embryonic Society. পড়াশুনার সাথে সাথে দেহচর্চা, ব্যায়াম, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ উৎসবানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যাহাতে শিশুর সমাজ জীবনের যথাবিহিত বিকাশ ঘটে তাহার সকল প্রকার সুযোগই রহিয়াছে এই সৃজনাত্মক বিদ্যালয়ে।

সৃজনাত্মক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

সৃজনাত্মক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি বড়ই মধুর। উহা রাজা-প্রজা বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের ন্যায় তিক্ত নহে। বস্তুত সৃজনাত্মক বিদ্যালয় যেন একটি বৃহৎ পরিবার। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ এখানে ছাত্রের শিক্ষাদাতার স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। ছাত্রগণকে তাঁহারা ক্ষমাসুন্দর ও সস্নেহ দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত। সত্য কথা বলিতে কি ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসায় তাঁহাদের মনটি সর্বদাই কানায় কানায় ভরা। শিশুদের চোখের সামনে নূতন নূতন জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিতে ও তাহাদের কিশোর মনে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইতে তাঁহারা সর্বদাই তৎপর।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সহিত পার্থক্য

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার পাঠ-পদ্ধতি গতানুগতিক ও পরীক্ষা-পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক। ইহার পাঠক্রমে কোনই বৈচিত্র্যের স্থান নাই। ইহার নম্বর দান বা মূল্যায়ন-পদ্ধতিকেও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। কারণ, উহা নৈর্ব্যক্তিক নহে। সৃজনাত্মক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হইতেছে ছাত্রের সামগ্রিক বিকাশ কিন্তু এই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনেও অক্ষম। জ্ঞান দ্বিবিধ—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। সৃজনাত্মক শিক্ষা-ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অপেক্ষা সক্রিয় জ্ঞানকেই অধিকতর মূল্য দেয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয় জ্ঞানার্জনের প্রায় সকল পথই রুদ্ধ। উপরন্তু এই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রদের করিয়া তোলে অন্তর্মুখী—তাহাদের বহির্মুখী বৃত্তি ও গুণাবলীর কোনই বিকাশ সাধন করিতে পারে না। এমন কি এই শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদিগকে সামাজিক উপযোজন ক্ষমতায় (Social Adjustment) অধিকারী করিয়া তুলিতেও অক্ষম।

সৃজনাত্মক শিক্ষার সহিত উৎপাদনাত্মক শিক্ষার পার্থক্য

সৃজনাত্মক শিক্ষার মধ্য দিয়া সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের স্ফুরণ হয়। নিত্য নূতন অনুভূতি প্রকাশের প্রচুর সুযোগ থাকে এই শিক্ষাব্যবস্থায়। ইহার মধ্য দিয়া শিশুর স্বাধীন বিকাশ ঘটে ও তাহার সৃষ্টিক্ষমতা স্ফুরিত হয়। পক্ষান্তরে উৎপাদনাত্মক (Productive) বা কারিগরী (Technical) শিক্ষা যান্ত্রিকতা ও ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নহে—মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন-নিবৃত্তিই এই শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য।

সৃজনাত্মক শিক্ষার কতিপয় দৃষ্টান্ত

আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, গল্প বা কবিতার নাট্যরূপায়ন, নাটক রচনা, কবিতা-গল্প বা প্রবন্ধ রচনা, ম্যাগাজিন ও প্রাচীরপত্র সম্পাদন, বিতর্ক, আলোচনা, নানাবিধ প্রদর্শনী, সাহিত্যসভা ও আনন্দমেলার মধ্য দিয়া সৃজনাত্মক শিক্ষা তাহার বহুবিচিত্র রূপটিকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত, পুতুল-নাচ, বনভোজন, উৎসবানুষ্ঠান, দেশভ্রমণ, খেলাধূলা, কবিগান ও উদ্যান-রচনাও সৃজনাত্মক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। যুথোসদৃষ্টা, স্কাউট, ব্রতচারী-ব্যবস্থা, পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, নানাবিধ হাতের কাজ, সমাজ-সেবা ও ছাত্রসংসদের বহুমুখী কার্য-ধারার মধ্য দিয়া সৃজনাত্মক শিক্ষার বিশ্বরূপটিকে আমরা দেখিতে পাই।

উপসংহার

সৃজনাত্মক শিক্ষার বহুবিচিত্র রূপটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে নানাভাবেই আমরা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। এক্ষণে স্বাধীন ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সব-রূপায়ণই আমরা দেখিতে চাই। আমরা দেখিতে চাই—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মপ্রত্যয়-যুক্ত, বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ মানুষ। একমাত্র সৃজনাত্মক শিক্ষার পরশের মধ্য দিয়াই ইহা সম্ভবপর। কবির আক্ষেপ—"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হবে কাজে বড় হবে।" সৃজনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় প্রতিটি শিশুই দেহে ও মনে, কর্মে ও জ্ঞানে, চিন্তায় ও চরিত্রে পুষ্পের মতই বিকশিত হইয়া উঠিবে। অতঃপর কবি আর আক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইবেন না।

———

লিলি ব্রাণ্ড বালি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বালি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : বৈশাখ, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ৮১

পুস্তক বিতরণী ৮৩
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

অথাতঃ শব্দজিজ্ঞাসা ৮৪
শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

পরিদর্শক ও পরিদর্শন ৮৮
শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ইটালী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ৯৩
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ কস্তিৎ দুর্মতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৬৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

এবার বৈশাখ মাস রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজনে উদ্‌যাপন বলিয়াই হয়তো শোরগোল তেমন হয় নাই। তবে ২৫ বৈশাখ জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতীর ব্যবস্থা সংযত ও সুন্দর হইয়াছিল। যত দিন যায়, ততই কবিগুরুর দানের গাম্ভীর্য ও মহত্ত্ব প্রকট হইতেছে। আমাদের দেশের মাটিতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম নিশ্চয়ই আকস্মিক নহে। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। প্রতিনিয়ত এই কথাই মনে হয়, আমরা যেন তাঁহার দানের যোগ্য হই, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁহার যোগ নিবিড় হউক, আরও নিবিড় হউক।

কেরল শিক্ষা আইন

কেরল শিক্ষা বিল আইন হইয়াছে, ভারত সরকারের অনুমোদন পাইয়াছে, রাষ্ট্রপতির অনুজ্ঞা পাইয়াছে। তবু নিস্তার নাই। ভারতবর্ষের এক অংশে আজ এই শিক্ষা আইন উপলক্ষ্য করিয়া দেবাসুর যুদ্ধ। চারিদিক হইতে পরিত্রাহি চিৎকার উঠিতেছে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, শিক্ষা লইয়া রাজনীতির খেলা খেলিও না। হয়তো বিদ্যালয় বর্জন প্রথম সোপান মাত্র। কিন্তু প্রথম সোপানেই যদি ভুল হয়……আমরা দূরে আছি বলিয়াই হয়তো দেশবাসীর অসন্তোষের পরিমাপ করিতে পারিতেছি না। প্রার্থনা করি, ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত না হয়।

পরীক্ষার ফলাফল

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ ও আই. এস্. সি পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইয়াছে। আই এস্ সিতে তো নয়ই, আই. এতেও এবার মেয়েরা পূর্বের মত ভাল করিতে পারেন নাই। প্রথম দশ জনের মধ্যে শুধু দুইটি মেয়ে, একজন লরেটো হইতে, অন্যজন বহরমপুর হইতে।

নিরক্ষরতা বিলোপ

আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আমাদের দেশ হইতে নিরক্ষরতা একেবারে দূর

নয়। অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে বসিয়া যাহা দেখিতেছি তাহা ভুল করিয়া দেখিতেছি না তো!

তৃতীয় পুরস্কার বিতরণ হইল কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠস্থল পল্লীতে একটি মাঝারোড়ি বালিকা বিদ্যালয়ে। সময় অপরাহ্ণ, প্রবেশপথ অতি সংকীর্ণ, বোধ হয় বড়বাজারের মধ্যেও সবচেয়ে বসতি যেখানে বেশি ঘন, এমন জায়গায়ই বিদ্যালয়ের অবস্থান। সরকারি কিম্বেত মিশনরীদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে পারিতোষিক প্রভেদ এত বেশি, কিন্তু মুহূর্তব্যবর্তিনী বালিকাদের প্রফুল্লতায় বৈশবের আনন্দ যেন মূর্ত হইয়া মুহূর্তে সকল অসুবিধা ও অস্পষ্টতাকে সরাইয়া দিল। মেয়েরা ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী তিন ভাষাতেই অভিনয় কৃতিত্ব দেখাইল। এই বয়সে বিকৃত ইংরেজীর বিরুদ্ধে তীব্র সংস্কার থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতেছি যে মন্দ করে নাই। বাংলা সংলাপ হইলেও তখনকার মত উপভোগ্য হইয়াছিল, এবং ভাষা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের উদার দৃষ্টি বাস্তবিকই ভাল লাগিয়াছিল। পারিতোষিক বিতরণ করিলাম, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যে যাহারা আজ এই উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল সব কয়টিকেই কি পুরস্কার দিয়া ইহাদের মুখের হাসিটি আরও খানিকটা ধরিয়া স্থায়ী করিয়া রাখা যাইত না? সমাজের ভবিষ্যৎ তো ইহারাই—এই যে আমাদের ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের দিক ও গতি নির্দিষ্ট করিবে তাহা তো এই শিশু বা কিশোরেরাই। ইহাদের দেখিয়া ইহাদের আনন্দের ক লইয়া সেলাম, সবচেয়ে কাজেই লাগিল বলিয়া মনে হইল। তখন আর বড়বাজারের সরু রাস্তার কথা মনের ত্রিসীমানায় রহিল না।

চতুর্থ হইল, বেঙ্গল মিউজিক কলেজের পুরস্কার বিতরণ সভা। সুযোগ পাইয়া এবং পর পর তিনটি পুরস্কার বিতরণের সভায় উপস্থিত হইয়া ইহাতেও হাজির হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। অবশ্য আমার পূর্ব হইতেই জানা উচিত ছিল, মাসে দিন থাকিলেও ইহার গোত্র ভিন্ন। এখানে পুরস্কার দেখিতে কেহ আসে নাই, আসিয়াছে সঙ্গীত শ্রবণ ও উপভোগ করিতে। বিশেষত নৃত্যে চিত্রাঙ্গদার অভিনয় দেখিতেই লোক সমাগম। পূর্বোক্ত তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মোটামুটি বয়সের যেমন ব্যবধান, তেমন ব্যবধান শ্রোতৃবর্গের এবং বিষয়বস্তুরও বটে।

সঙ্কোচকুণ্ঠিতের মধ্যে আমার যোগসূত্র হারাইয়া গিয়াছে। পুনরায় বলি, কেন পুরস্কার বিতরণ? আনন্দ চাই? ঋতু পরিবর্তনে বা বিশেষ ঘটনা ও সময় লক্ষ্য করিয়া আনন্দ বিতরণ করা যায় না কি? আর কী মূল্য এই পুরস্কারের? জড়গত মূল্য তো নয়, প্রতীক বলিয়া বলা, যে অর্থে লরেল গাছের পাতার পোয়েট লরিয়েটকে মানাইত, গ্রীসে বন্য জলিভের মুকুট (crown of wild olive) দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। তা ছাড়া, এখনও কি আমরা ব্যক্তিগত কৃতিত্বকেই মূল্য দিব? সমষ্টিগত বা সমবায়গত কাজের প্রশংসা করিব না? এই উপায়ে সমাজের মোড় ঘুরাইব না? তাহা হইলে সমাজের দেহে 'সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন'-এর রং ধরিবে কি করিয়া? কখনও ধরিবে কি?

অথাতঃ শব্দজিজ্ঞাসা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

গত চৈত্র মাসে আমি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় পদ্মভূষণ আচার্য সাহিত্য-বাচস্পতি মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। বাইশ বছর পূর্বে আমার একখানা পুস্তক উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। তদবধি প্রায় প্রতি বছরই দোলের সময় কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনিও আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন এবং ক'বার তাঁর স্বরচিত ক'খানা বইও দিয়েছেন। আমার উত্থাপিত শঙ্কাগুলির সমাধান করতে তিনি কখনই কার্পণ্য করেন না। এবারে আমি পূর্বেই কয়েকটি প্রশ্ন ঠিক করে নিয়েছিলাম এবং সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তার সারাংশ তাঁরই সম্মতিক্রমে পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি।

প্রশ্ন ১। পুরাণে ইতিহাসে যে নাগ জাতির উল্লেখ আছে তা যথার্থতঃ কি এমন হ'তে পারে যে তারা কোন অনার্য জাতি, সর্প বা নাগ যাদের 'টোটেম' ছিল? ইন্দোপাসক যে আর্যদল প্রথমে ভারতে এসেছিলেন হয়ত ধর্মে নাগদের সঙ্গে তাদের একটা মিল হয়। পরবর্তী বিষ্ণুপূজক আর্যদলের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ স্পষ্টতর রূপ ধারণ করে কিন্তু প্রতিবারেই ইক্ষ্বাকুরা নাগদের পক্ষ সমর্থন করেন। তক্ষক প্রভৃতির উপাখ্যানে এ কথার পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর। এরূপ একটা কিছু হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু পুরাণাদিতে কাহিনীগুলি এরূপভাবে বর্ণিত আছে যা থেকে ইতিহাস উদ্ধার করা অতি কঠিন। কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২। রামায়ণের ঘটনাবলীর মধ্যে যদি কিছু ঐতিহাসিক সত্য থাকে এবং যদি বানর ও রাক্ষসেরা সত্যই অনার্য জাতি হয় তবে তাদের সংকেত নাম হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। অতিকায় ইন্দ্রজিৎ, মৃত্রলোচন, হনুমান্ প্রভৃতি নাম কোন কারণবশেই হতে পারে, অন্য থেকে নয়। নামগুলি যেন হিতোপদেশের চিত্রগ্রীব, মন্থরক, দীর্ঘকর্ণ প্রভৃতির মত। এর মধ্যে 'রাবণ' নামটা অনার্য বলে মনে হয়। এর থেকে কি মনে করা যায় না যে রাবণ নামে বস্তুতই কোন অনার্য রাজা ছিলেন?

উত্তর। 'রাবণ' শব্দেরও একটা অর্থ করা হয়, যার রব বা স্বর খুব উচ্চ। আর রাবণকেও তো ঋষিপুত্র বলা হয়। সমসাময়িক বৌদ্ধসাহিত্যে দশরথ ও রামের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তা বহুলাংশে রামায়ণ থেকে পৃথক্। রামায়ণের ঐতিহাসিকতা বড়ই দুর্বল। এ শুধুই কাব্য।

প্রশ্ন ৩। ঋষিদের দীর্ঘায়ুর কথাটা বড়ই খটকা লাগায়। যে বেদব্যাস শান্তনুর সমসাময়িক তাঁকেই আবার পরীক্ষিতের সভায় দেখি, আবার তিনিই জনমেজয়ের সভায় 'মহাভারত' শুনান—এ কি রকম? যে দুর্বাসা শকুন্তলাকে শাপ দেন তিনিই আবার কিরূপে যদু শিশুগণকে অভিসম্পাত করেন? অথচ তাঁরা এমন কিছু চরিত্রবান্ ছিলেন না যাতে দৈবশক্তিবলে অজর অমর হওয়া সম্ভব ছিল।

উত্তর। এমন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে, যাদের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতি নাই, প্রায় পরবর্তী লেখকেরা অনেক পরের যুগেও টেনে এনেছেন এমন উদাহরণ আমরা ইয়োরোপেও পাই, যথা ট্রয় যুদ্ধের নেস্টর ও আথর্ল্যাণ্ডের সেণ্ট প্যাট্রিক।

অবশ্য একই ব্যক্তির পক্ষে ৪।৫ পুরুষ পর্যন্ত দেখা কিছু অসম্ভব নয়, তবু তাদের সঙ্গে কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত করলেই তা সন্দেহের কারণ হয়। শাস্ত্রে শুকদেব ও বৈশম্পায়নকে ক্রমশঃ ভাগবত ও মহাভারতের বক্তা বলা হয়েছে। তবে তাঁরা নাকি বেদব্যাসের আদেশে এবং তাঁরই সম্মুখে রাজাকে পুরাণ ইতিহাস শোনান। এর প্রকৃত অর্থ বোধহয় এই যে, বেদব্যাসই আদি ভারত-সাহিত্য ও পুরাণ-সংহিতার প্রণেতা, এবং শুকদেব লোমহর্ষণ, বৈশম্পায়ন, উগ্রশ্রবা প্রভৃতি সকলেই বেদব্যাসের নিকট কথা ছিলেন।

প্রশ্ন ৪। পাণিনি বলেন যে, 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি 'প্রশস্ত' শব্দ হতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন। কিন্তু প্রশস্ত বা প্রশংসনীয় তো অর্থ মাত্র। যেমন 'বলবান্' হতে 'বলীয়ান্' ও 'বলিষ্ঠ' শব্দ হয় সেরূপ 'প্রশ্যান' হতে 'শ্রেয়ান্' ও 'শ্রেষ্ঠ' বলতে পারি কিনা? কোথাও পড়েছি যে 'দেখা' অর্থে পূর্বে একটা 'স্পশ' ধাতু ছিল যার 'স্পস্তি' রূপ হত। কিন্তু কালক্রমে স্ লুপ্ত হয়ে গিয়ে শুধু 'পশ্যতি' রূপ থাকে। ঐ স্পশ্ ধাতু থেকেই নাকি 'স্পষ্ট', 'স্পশ' (spy) প্রভৃতি শব্দ এসেছে, কিন্তু অন্য defective verbs-এর ন্যায় এরও ভবিষ্যদাদি রূপ প্রচলিত না থাকায় একে 'দৃশ্' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর। শুধু তাই নয়। 'নেদীয়ান্', 'নেদিষ্ঠ' ও 'অন্তিক' শব্দ থেকে আসে নাই। প্রাচীন 'নেদ' শব্দই ছিল, যার মানে নিকট। ঐরূপ 'তারা' শব্দের প্রাচীন রূপ ছিল 'তারা' (গু বিভক্তিরূপে) যা থেকে 'সিতারা' (ফারসি), 'aster' (গ্রীক), stella (লাটিন) এবং star (ইংরেজী) শব্দ এসেছে।

প্রশ্ন ৫। যদিও ইটালী ভারত থেকে বহুদূরে তবু আমার মনে হয় লাটিন ভাষার সংস্কৃতের সঙ্গে এমন নিকট সম্বন্ধ আছে যা নিকটতর গ্রীক ভাষারও নাই। উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে, তবে কেবল একটাই যথেষ্ট যে সংস্কৃত 'সপ্তন্' লাটিনে Septem কিন্তু গ্রীকে hepta যা ফারসি 'হফ্ত্' এর সঙ্গে বেশি মিলে। বহু দন্ত্য-স্ এর হ'য়ে পরিণতি দেখে এরূপ অনুমান করা যায় কিনা যে সংস্কৃত ও লাটিন নরগোত্রীয় ভাষা এবং ফারসি ও যবন (গ্রীক) অন্যগোত্রীয় ভাষা। আমার এরূপ মনে করার আর একটি কারণ আছে। এশিয়া মাইনরে বেদ-পূর্বক আর্য্যভাষী মিটানীদের রাজ্য ছিল। ট্রয়ের লোকেরাও বোধ হয় তাই ছিল, লাটিন পৌরাণিক মতে ট্রয়ের রাজকুমার এনিস্ কতিপয় সঙ্গী সহ ইটালীতে গিয়ে রোমান জাতির স্থাপনা করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর। আপনার এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। অনেক শব্দে গ্রীক ভাষাই সংস্কৃতের নিকটতর। এনিসের কাহিনীটা ভার্জিলের কল্পনা অথবা পূর্বতন জনপ্রবাদ মাত্র। ভাষাতত্ত্বের নিয়মগুলি না বুঝলে শুধু শব্দের আকার দেখে সম্বন্ধ নির্ণয় হয় না। এ বিষয়ে ভাষাচার্যেরা অনেক গবেষণা করেছেন।

প্রশ্ন ৬। আমার মনে হয় কোন কোন ভাষা শিখতে হ'লে সেই ভাষা ও মাতৃভাষার মধ্যবর্তী একটি ভাষা আগে শিখে নিলে তা যত সহজ হয়, সোজাসুজি সেই ভাষায় ঢোকা বহুক্ষেত্রে তার চেয়ে কঠিন হয়। বাঙালী যদি উর্দু শিখতে চায় তো আগে হিন্দী শিখে নেওয়া খুব দরকার, নতুবা অনেক বাক্যের কারণ ও ভেদ তারা বুঝতেই পারবে না। উঠিল, উপর, উঠা—তিনটি শব্দের একই বাংলা 'উ' উর্দুতে কেন তিন রূপ নিল তা বাঙালীর পক্ষে হিন্দীতেই আগে বোঝা সম্ভব। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান-বাসীরা হিন্দীকে ঘৃণা ক'রে উর্দুর পূজা করতে চান। বর্বর যা ভাষের লোকেরা যখন বর্বরভাষা (classics) হিসাবে পালি শাস্ত্রে পড়েন "অকোধেন জিনে কোধম্" তখন 'কোধ' মানে 'রাগ' বলে দিলেও ওদিকে "অকোধ" না হয়ে 'অক্রোধ' কেন

হ'ল বুঝতে পারবে না, যদি না তারা কিছুটা সংস্কৃত শিখে নেয়।

উত্তর। ঐজন্যই বর্মা ও শ্যামের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেকেই সংস্কৃত জানেন, আর এজন্যও তাঁরা আজকাল সংস্কৃত শিখছেন যে অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রও সংস্কৃতে লিখিত।

প্রশ্ন ৭। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি এই পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখেছিলাম যে 'নয়া পৈসা' নামের বদলে টাকার শততম ও দশম অংশকে যথাক্রমে 'শতম্' ও 'দশম্' নামে অভিহিত করতে, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। পরে আবার metre, decimetre প্রভৃতিকে 'মাত্রা' 'দশমাত্রা' বা শুধু 'দশম' প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেও পরামর্শ দেই। এবার Standard Matric Committee'র Secretary জানিয়েছেন যে কমিটির কোন কোন সদস্য দেশী নাম রাখার প্রস্তাব করেছিলেন বটে কিন্তু বহুমত আন্তর্জাতিক (international) নামেরই পক্ষপাতী হওয়ায় তাই থেকে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে মীটার, ডেসিমীটার—এগুলিই কি আন্তর্জাতিক নাম, না ইংরেজের বিকৃত উচ্চারণ? ইয়োরোপ ও আমেরিকার Anglo-Saxon জাতি ভিন্ন কারও ভাষাতেই t ও d অক্ষরের উচ্চারণ দন্ত্য ত ও দ। আন্তর্জাতিক নামের দোহাই দিয়ে আমরা ডেসিমীটার বলব না দেসিমেত্র্?

উত্তর। সে অপচেষ্টা আমিও দু'একবার ক'রে দেখেছি। শব্দের সাদৃশ্য বলেই না, যেখানে প্রচলিত ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের জন্য ঠিক এরূপ সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ সম্ভব বা মূলতঃ একই, তাও আমি সরকারকে ধরাতে চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছি। শ্যাম দেশে ক্ষুদ্রতম দশমিক মুদ্রাকে 'শতাংশ' বলে, কিন্তু এদেশেই সংস্কৃতের প্রতি ঘৃণা। ইংরেজী স্কুল নামগুলি উচ্চারণ করাও অনেকে বিজাতীয় লক্ষণ মনে করেন, যথা, রুশ স্থলে রাস্তা, মিশ্র স্থলে ইজিপ্ট।

প্রশ্ন ৮। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু যদি সেভাষের বহুমতে হিন্দীই রাষ্ট্রভাষার যোগ্য বলে গৃহীত হয় তবে কি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে কাজ শুরু করতে পারতাম না? অনুবিধাও হত, প্রাদেশিকদের অন্য ভাষান্তরের সাহায্যও নিতে হত, কিন্তু বাধাগুলি ক্রমশঃ অতিক্রান্ত হত। বস্তুতঃ একথা কে বিশ্বাস করবে যে যদি ইংরেজ এদেশে না আসতো তবে আজ এক যোগ্য ভাষার অভাবে আমরা অসহায় অবস্থায় পড়তাম? কোন ভাষাতেই আমার আপত্তি নাই, এই 'অবধি'টাতেই আপত্তি। ১৫ বছরের অবধি পার হয়ে গেলে আমরা দেখব যে আমরা পিছিয়েই আছি, সুতরাং অবধি বাড়িয়ে ৩০ বছর করা হোক। কিন্তু ৩০ বছর পরেও আমরা দেখব যে আমরা একটুও আগাইনি। বরং দেশী ঝিন ইংরেজী চলতে থাকলে পরে তা ছাড়া আরও কঠিন হবে। আজ স্বাধীনতা লাভের পরে আমরা যতটা ইংরেজী ভাবাপন্ন হয়েছি, ইংরেজ রাজত্বে তত ছিলাম না। যদি সত্যই ইতিমধ্যে হিন্দী কিছু উন্নতি করে তো ইংরেজীও কি বসে থাকবে? নিত্য নূতন টেকনলজির দ্বারা এও কি আগে বাড়বে না? এক সময় লাটিন সমগ্র ইয়োরোপের বিদ্যাগুলীর ভাষা ছিল। ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে সর্বত্র ইয়োরোপে এর প্রচলন ছিল। পরে ফরাসী ভাষা (lingua franca) এই পদবী পায়। ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে এর প্রচার ছিল। আজ পূর্ব গোলার্ধ, পশ্চিম গোলার্ধ, দক্ষিণ গোলার্ধ সর্বত্রই ইংরেজী প্রচলিত আছে। কে জানে ভবিষ্যতে রুসী বা অন্য কোন ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার পদবী পাবে না? যে অধিকতর যোগ্যতার

অত আমরা এখনও ইংরেজী রেখেছি, হিন্দী তা ১৫ বছরে কেন, ১৫০ বছরেও পারে না সুতরাং কতদিন আমরা ইংরেজী রাখব তার উত্তরে "যতদিন না হিন্দী যথেষ্ট উন্নত হয়" না বলে "যতদিন না অন্য কোন ভাষা বিশ্বভাষারূপে ইংরেজীর স্থান নেয়" তা বলাই কি ভাল নয়? ইতিমধ্যে হিন্দীতে কয়েকখানা বই লেখালেই কি হিন্দীর সে যোগ্যতা আসবে?

পরিদর্শক ও পরিদর্শন

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

[শিক্ষার ইতিপূর্বে বিভালয় পরিদর্শকের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শিক্ষকদের তরফের কথা বলিয়াছেন একজন শিক্ষক।]

অবর বিভালয়ের পরিদর্শকেরা আকস্মিক শিক্ষক। কিন্তু অনেকে তা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, পরিদর্শন করাই তাঁহাদের কর্তব্য—শিক্ষা দেওয়াটা শিক্ষকের কাজ। অনেক অবর বিভালয় পরিদর্শক প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষককে কি চোখে দেখেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেশের শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকের সম্মুখে তুলে ধরছি। এই সকল ঘটনা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা হয়নি, বরং চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী মহলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের পক্ষে যদেই সাহায্য করবে বলে মনে করা হয়েছে।

আজ থেকে বাইশ বছর আগের ঘটনা।

প্রথম দিন পাঠশালায় চলেছি। মা ঘটা করে ধুতি ও জামা পরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় হাতে তুলে দিলেন এবং চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করলেন যেন লেখাপড়া শিখে সোনার খাসায় দুধভাত খেয়ে মোটরে চড়ে বেড়াতে পারি। সরস্বতী সেদিন অলক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু পাঠশালায় পৌঁছেই এই নতুন ছাত্রটিকে জীবনের সেই প্রথম সুন্দর প্রভাতে ছিন্‌ছিপে গৌরবর্ণ ধুতি চাদর পরিহিত এক বাঙালী যুবকের নজরে পড়তে হয়েছিল।

তিনি একজন অবর বিভালয় পরিদর্শক। কয়েক মিনিটের ভেতর আমায় সাথে ভাব জমিয়ে, 'ছেলে ঘুমায় পাড়া জুড়ায় বর্গি এল দেশে' ছড়াটি শুনে নিয়ে সে তাঁর কি আনন্দ! তিনি কয়েক ঘণ্টা যাবৎ ছিলেন। তারই ভেতর যেন অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্রের আপন জন হয়ে উঠলেন। বেশ মনে আছে, তাঁর বিদায় বেলায় আমরা সজল চোখে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম। তিনি ম্লান মুখে বিদায় নিলেন।

তিনি আমার হৃদয়ে সেদিন যে দাগ রেখে গেছেন তা আজও ঘুছে যায়নি। কর্মময় জীবনে বহু অবর বিভালয় পরিদর্শকের সংস্পর্শে এসেছি। এঁদের পরিদর্শকের ভিতর তাঁকে খুঁজেছি, কিন্তু তেমন আর কই পাইনি তো। আজও তাই ব্রিটিশ শাসনের সেই সাহেবিয়ানা যুগে কি করে দেশের মানুষ সেজে তিনি দেশের ছেলেমেয়েদের ভিতর জাতীয়তাবোধ জাগাবার সাহস পেয়েছিলেন। কই অমন ধুতি চাদর পরিধান করে আজকাল তো কেহ পরিদর্শনে আসেন না। সকলেই চান বিদেশী পোষাকে শিশুদের ভয় ধরিয়ে দিতে—তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে।

জন্মের পর আমরা বাঙালী মায়ের স্তন্যপান করেছি, গৃহে আমরা বাঙালী পোষাকে চলাফেরা করি, আমাদের একান্ত নিজস্ব নিয়মে আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করে বড় হই এবং আমাদের বিবাহ ও অন্যান্য ক্রিয়া নিজস্ব প্রথায় থাকে ; তবে কেন দেশীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিসর্জন দিয়ে অপ্রয়োজনে বিজাতীয় ভাবধারায় দেশের শিশুদের মন বিষাক্ত করা হচ্ছে ? পাশ্চাত্যকে প্রয়োজনে স্বীকার করে নেওয়ার ভিতর প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বিদেশী বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, আত্ম-বিক্রয় হয় সে কথা আজ নতুন করে না বলাই উচিত। স্বজাতীয় পোষাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তাঁরা দেখবেন, বুকের নীচে এক পরিচিত উষ্ণ রক্ত প্রবাহের অনুভূতিতে তাঁদের দেহমন ধন্য হয়ে যাবে।

আর একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানি, যিনি তাঁর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্তরের মানুষ। তিনি যখন তাঁর এলাকায় যেতেন তখন সমস্ত শিক্ষকদের ভিতর একটা শ্রদ্ধা ও ভীতিপূর্ণ চাঞ্চল্য পড়ে যেত। তাঁর সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষকদের আলোচনা হতো। তিনি মৃদু মিষ্ট স্বরে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যাকে যাকে যুক্তি দিয়ে তাঁকে হারিয়ে দিলে তিনি মুখ টিপে হেসে জবাব দিতেন, 'তোমাদের সাথে পারব কেন, তোমরা যে কাল বৈশাখী। যত আবর্জনা সব ঝাঁটিয়ে দূর করে দিতেই তোমাদের কর্মক্ষেত্রে তোমরা নতুন মিছিল করে আজ ধানা করেছ।' শিক্ষকরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সকলেই তাঁকে দাদা বলে ডাকতেন। তিনিও সাদরে সকল শিক্ষকের সহিত একাসনে বসে দোষ ত্রুটি সংশোধন এবং বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে তা দূরীকরণে চেষ্টিত হতেন। ধৈর্যই তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। শিক্ষক উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন, তবু তিনি ধীর স্থির। তিনি যেখানে পরিদর্শনে যেতেন সেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেন মেলা বসত। শিক্ষককে বড় বেশি সম্মান দিয়ে ফেলতেন, তাই বোধ করি সকলের শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। সত্যই তিনি ছিলেন শিক্ষক সৈনিকদের সেনাপতি। সহজ মেলামেশা এবং ভাববার আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করা ও সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে চলা তাঁর আদর্শ ছিল। পরস্পরের ভিতর সদিচ্ছা, সহমর্মিতা, আপনকে বুঝবার মত মন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই কর্মক্ষেত্রে তিনি আদরণীয় হয়ে ছিলেন। সর্বত্র তাঁকে দেখেছি এক শিক্ষকের গুণাবলী অপর শিক্ষকের নিকট প্রশংসার সুরে বলতে।

আজকাল তো আর তেমন পরিদর্শক চোখেই পড়ে না। সকলেই সাহেব সেজে গম্ভীর মুখে বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে শিক্ষকের ভুল ত্রুটি ধরে দু পাতা পরিদর্শন বইয়ে লিখে বিদায় হন। এঁদের সঙ্গে শিক্ষকদের তেমন সৌহার্দ নেই। এঁরা অন্য জগতের মানুষ। অনেক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাথমিক শিক্ষককে এবং শিক্ষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। এই রকম দুটি ঘটনা আপনাদের বলছি।

খবর পেলাম বিদ্যালয় সম্পাদকের বাড়িতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এসেছেন। অতএব দেখা করতে যেতে হয়।

জন কয়েক স্থানীয় ভদ্র লোকের সঙ্গে তিনি বসে আছেন। মুখে চোখে ক্রোধের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

'নমস্কার, ভাল আছেন ?'—হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসলাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল আছি মশাই। তবে রাখালবাবুকে বলে দেবেন, তাঁকে আমি বদলি করবই।'—বলেই জুতার ফিতা খুলতে বসলেন।

'রাখালবাবু কে ?'—নির্বোধের মত প্রশ্ন করে বসি।

'রাখালবাবুকে চেনেন না? তবে এতদিন মাষ্টারি করছেন কী?'

—তুই কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন উপরওয়ালা।

'তাই তো পরিচয় না থাকলে মাষ্টারি করা যায় না, এমন তো কোনদিন শুনিনি।'—বিস্ময়ে আমার কণ্ঠে মৃদু স্বরে পড়ছে।

'ঐ যে বাসার কাছে বাড়ি সেই রাখালবাবু, বুঝেছেন?'—ক্রোধে তাঁর যেন বাক্য স্ফুরণ হয় না।

'কিন্তু তাঁকে বদল করার তো কারণ খুঁজলাম না।' বিসর্জের মত ঢোক গিলতে বললাম।

'মশাই, বাস থেকে নেমেছি দেখি রাখালবাবু একটা স্টলে বসে চা খাচ্ছেন একটা কথা বা নমস্কারের তো বালাই নাই এমন কি এক কাপ চা পর্যন্ত খেতে বললেন না।'—অপমানে তাঁর চোখ জ্বলে ওঠে।

'অ-অ-অ-অ।'—এতক্ষণে এই গোবর-ভরা মাথায় তাঁর রাগের ব্যাপারটা ঢুকল।

এই শ্রেণীর পরিদর্শক মণ্ডলীকে বিনয়ের সুরে জানিয়ে দিতে চাই, আমরাও তাঁদের মত মানুষ, আমরাও আঘাতে কাঁদি, সুখে হাসি, একই রোগে দুঃখি, একই ঔষধে আরোগ্য হই। আমাদের উপর এই নির্মম আচরণের দ্বারা দেশের ক্ষতি তাঁরা করতে পারবেন না।

এতো গেল শিক্ষকের বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষাকে অনেকে কি চোখে দেখে থাকেন তারই একটি নমুনা দেখুন।

এক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইংরেজিতে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তিনি আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন এবং অমুক তারিখে অমুক বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। সেই পরিদর্শনে আমাকে সঙ্গী হিসাবে পেলে আনন্দিত হবেন—এমন কথাও সেজুড় হিসাবে জুড়ে দিয়েছেন। শিক্ষণ জীবনে পাশাপাশি মহাবিদ্যালয়ে আমাদের একটি বছর কেটেছে। সুতরাং তাঁর আশাপথ চেয়ে বসে রইলাম। তাঁর নাম কি বলব, এই ধরুন কালুদা।

নির্দিষ্ট দিনে তো কালুদা এলেন। তাঁকে আর সেই কালুদা বলে চেনা যায় না। তিনি ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন, ইংরেজি পোষাকেই ভূষিত হয়ে এসেছেন—মাথায় দিয়েছেন সোলার টুপি এবং কেবল শেষ টেনে টেনে বিকৃতভাবে বাংলা বলছেন।

আমার মুখেরই দোষ। আতিথেয়তা জানি না। বলে বসি, 'ও কালুদা, এ কি কাণ্ড করে ফেলেছেন!'

—'কি হল?'—চমকে উঠে তিনি এক বিস্ময়কর ভঙ্গিতে আমার দিকে চাইলেন।

'আপনার সেক্টাই না হলে যে ভাল মানাচ্ছে না।'—বেফাঁস কথা বলে দিয়েই লজ্জিত হয়ে যাই।

কালুদা আমার এত বড় ব্যঙ্গটাকে পরিহাস হিসাবে গ্রহণ করলেন। হাসতে হাসতে আমাকে তাঁর বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন। এঁর বন্ধুতাকে অস্বীকার করি না, কিন্তু তিনি যেন সেদিন থেকেই অনেকটা দূরে সরে গেলেন বলে আজও আমি মনে করি।

পরদিন বিদ্যালয় পরিদর্শন। বিদ্যালয়ের কাছকাছি পৌঁছে গেছি এমন সময় কালুদা একটা সিগারেট ধরালেন।

'সিগারেট ফেলে দিন, সামনেই স্কুল।' বললাম কালুদাকে।

তিনি আমার পৃষ্ঠদেশে হাত রেখে মৃদু হাসে বললেন, 'ভাই, আপনার গা থেকে দেখছি এখনও training-এর গন্ধ যায়নি। তবে training-এ যা পড়েছেন সেগুলো Practical field এ বড় অকেজো।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই কালুদা সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী তুলে এগিয়ে গেলেন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

শীতের সময় ৩০।৪০ জন ছেলে এক পঙক্তিতে

বসে সুর করে করে পড়ছে। ধুতি পরিহিত গেঞ্জি ও চাদর গায়ে আমার পরিচিত বিনয়ভাই কোট টুপি পরিহিত ইনস্পেক্টার সাহেবকে অভ্যর্থনা করলেন।

পিওন সাহেবের সিগারেটের দিকে ড্যাব ড্যাব চোখে চেয়ে আছে।

তারপর আরম্ভ হলো গতানুগতিক পরিদর্শন। ছাত্র উপস্থিতি, শিক্ষক উপস্থিতি, ছেলেমেয়েরা কেমন শিখেছে মোটামুটি দেখে নিলেন। এরই নাম কি পরিদর্শন?

মনে মনে হিসাব করতে বসি বাংলাদেশে এই-রকম কানুদার সংখ্যা কত হতে পারে।

বিনয় ভাইটির দিকে চেয়ে বলে বসি, তুমি তো এবার বি. এ পরীক্ষার জন্যে প্রাইভেটে তৈরি হচ্ছ। তুমি বরং বি. এ পাশ করে অন্য কোন ভাল চাকুরীর জন্য চেষ্টা করো। মাষ্টারী তোমার জন্য নয়।

বিনয় আমার ইঙ্গিত বোধ হয় বুঝতে পারল। লজ্জিত মুখে কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে পারলে না।

গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিদর্শক উভয়েরই বিদ্যালয় সম্বন্ধে দায়িত্ব থাকে তবে পরিদর্শককে পরিদর্শণ নীতির সহিত মনেরও পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে। যদি বর্তমান শিক্ষাধারা আমাদের জীবনকে এমনি ভাবে পঙ্গু-লতায় ভাসিয়ে দিয়ে যায় তবে দেশের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থাকে একবার জোর করে থামিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ সমাজ রচনায় আত্ম বিসর্জন করতে হবে। আমরা বিদ্যালয়ের দারোগা চাই না, আমরা পরিদর্শক চাই। বিদ্যালয়ের দারোগা শিক্ষার নামে প্রহসন করেন, বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাণের স্পর্শে অমৃত সিঞ্চন করেন।

বর্তমানকালে পরিদর্শকরা শুধু শিক্ষকের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বিদ্যালয় পরিদর্শনের অঙ্গ নয়। সেইজন্য শিক্ষক পরিদর্শককে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। একটা বিরোধী ভাব তাঁদের ব্যবহারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফলে পরিদর্শন প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃত পরিদর্শন যে কতদূর উচ্চে সে কথা উভয়েরই বোঝা উচিত।

নতুন শিক্ষায় পরিদর্শক উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করবেন এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে শিক্ষকের অসুবিধাগুলি দূরীকরণে চেষ্টিত হবেন।

পরিদর্শক নিজেই পাঠ দানে অভ্যস্ত হবেন এবং আদর্শ পাঠ দান করে শিক্ষককে সংশোধন করবেন। সৎশিক্ষকের গুণাবলীর প্রশংসা করবেন এবং অপর শিক্ষকের নিকট তাঁর আদর্শকে তুলে ধরবেন।

পরিদর্শন কালে বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি ও অভিভাবকের সভা আহ্বান করে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করে তা সমাধানের চেষ্টা করলে আদর্শ পরিদর্শকের কার্য হয়। শিক্ষকের সহযোগিতায় পরিদর্শক যদি কোন অভিভাবকের গৃহে গিয়ে কোন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তিনি তা অবশ্যই করবেন। শুধু তাই নয়, তিনি শিক্ষকের সম্মানকে উচ্চে তুলে ধরবেন। তাঁদের দোষত্রুটিগুলি পৃথক ভাবে আলোচনা করে সুপথে পরিচালিত করবেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জটিল সমস্যাগুলি জানতে চেষ্টা করা পরিদর্শকের কর্তব্য, ও শিক্ষকদের ভিতর সম্প্রীতি ও অভিভাবকের সহিত শিক্ষকের সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করবেন।

পরিদর্শক তাঁর অঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য শিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে ভাল করবেন। আলোচনা সভায় যারফত ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করবেন ও কর্মক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষকগণকে উপযোগী করে তুলতে প্রয়াসী হবেন। এই সকল প্রদর্শনীতে কৃষি সভার ব্যবস্থা করে নিজেদের কৃষি সভ্যতার বিশ্বার দ্বারা জন সাধারণে একটা প্রগতিশীল ভাবধারা এনে দিতে পারা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের অন্য বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা উপস্থিত

হয়ে নিজ অঞ্চলের কোন আদর্শ বিদ্যালয় বা পরিদর্শকের কার্যাবলী যদি এই সকল সভাতে আলোচনা করেন তবে মনে হয় অপর শিক্ষকেরা ও সেই ভাবে নিজেদের তৈরি করতে প্রেরণা লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, অপর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলগুলির ভিতর কোন্‌টি আদর্শ অঞ্চল তা যদি জিলা পরিদর্শক-মহাশয় সুবিচারের দ্বারা সমাজে ঘোষণা করেন তবে মনে হয় অপর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

বর্ত্তমানে পরিদর্শকেরা এক অথবা দুই ঘণ্টার ভিতর বিদ্যালয় পরিদর্শন সমাপ্ত করেন এ বড়ই পরিতাপের বিষয়। তিনি পরিদর্শন কালে বিদ্যালয়ের স্থান সংকুলান সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি দিবেন কাজের ঘর, খেলার মাঠ ও খেলার সরঞ্জাম এবং বিদ্যালয়ের পাঠের জন্য আসবাব পত্র, গ্রন্থাগার এ সকল বিষয়ের দিকে যেমন দৃষ্টি রাখবেন, তেমনি আবার চারিদিকের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের ও মলমূত্র ত্যাগের কিরূপ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে আছে সেদিকেও লক্ষ্য করবেন। প্রয়োজন বোধে নিজের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যালয়ে একটি নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষকগণকে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করা তাল পরিদর্শকের গুণ সন্দেহ নাই। এর ফলেই তিনি শিক্ষকদের নিকট থেকে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পেতে পারেন।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, পরিদর্শক তা দেখবেন। শিক্ষক ও ছাত্রের উপস্থিতি খাতা পরীক্ষা করবেন, এবং পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠের অগ্রগতির বিবরণী দেখবেন। তা ছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষাদি, ভর্তির খাতা, বিকাশ সূচী ও কাজের হিসাবগুলি যেমন পরখ করে দেখতে চেষ্টিত হবেন তেমনি আবার দ্রব্যাদির হিসাব বহি, শিক্ষাবর্ষের আলোচনা বহি, বিদ্যালয় পরিচালনা সভার আলোচনা বহি, চিঠিপত্র ও ফাইল এবং হিসাব নিকাশ বিভিন্ন দিকে পরিদর্শনে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি থাকা উচিত। যদি বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে পরিদর্শক শিক্ষকের সহযোগিতায় তা করে দিলে বোধ হয় ভাল হয়।

আজ পর্যন্ত তো শিক্ষকের পাঠদান পরিদর্শন করতে কোন পরিদর্শককে দেখিনি। পরিদর্শকের প্রতি শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি দেখা উচিত। শ্রেণীতে ভাল, স্বাভাবিক ও পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থী থাকে। এদের সংখ্যা নিরূপণ করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক কি ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন পরিদর্শক তা দেখবেন। অগ্রগামী ও পশ্চাৎপদ শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সকল পরিদর্শকেরই কর্ত্তব্য। প্রয়োজন বোধে তিনি পাঠ পরিকল্পনা করে নিজে পাঠদান করবেন। সংগীত, চিত্রকলা বিভিন্ন দিকে শিক্ষককে সাহায্য করা তাঁদের পরিদর্শনের গতির ভিতরই পড়ে। আমাদের মতে কোন বিদ্যালয় ২।১ ঘণ্টায় পরিদর্শন হয় না।

পরিদর্শকরা শিক্ষা-প্রাপ্ত, কিন্তু অনেককে দেখেছি পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট অজ্ঞতা আছে। একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় কি রকম প্রশ্ন করেছিলেন তারই একটি নমুনা দিচ্ছি।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের গণিতের প্রশ্ন দিলেন, একশত তিন ও তিন শত চার লিখে যোগ করতে। শিশুরা পারল না। পরিদর্শক মৃদু ভাবে যাহা বুঝিতে ঠোঁট দুটির এমন ভংগি করলেন যার অর্থ শিক্ষক ছাত্রদের কিছুই করাননি। বাধ্য হয়ে শিক্ষককে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম খুলে দেখাতে হল। এর ফলে পরিদর্শককে লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বর্ত্তমানে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে বলে দরকারের সমালোচনা করলেন।

শিক্ষা জগতের নতুন পদ্ধতি ও ভাবধারার সঙ্গে পরিদর্শকের যেমন পরিচয় থাকা উচিত, তেমনি সেগুলি প্রয়োগের জন্য শিক্ষকগণকে প্রেরণা দেওয়া তাঁর কর্তব্য। সব চেয়ে বড় কথা পরিদর্শকের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হওয়া দরকার। পরিদর্শক যে শিক্ষকের বন্ধু, উপদেষ্টা ও শিক্ষা-সেনাপতি সে কথা উভয়েরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, পরিদর্শকেরা অনেকেই তা মনে রাখেন না। তাঁদের আত্ম-সমালোচনা দ্বারা ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করা উচিত। শিক্ষকদেরও পরিদর্শকের নতুন ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাঁদের সহযোগী শিক্ষাবিৎ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষক যেন পরিদর্শকের সহিত ব্যবহারে অকপট হন ও সমস্যা সমাধান ব্যাপারে পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন।

ইটালী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গত ১৯৫৮ সালের পূজার বন্ধে পাকিস্তানে গিয়াছিলাম। খুলনা সহরে এক পাদ্রীর সাথে দেখা হইয়াছিল। তিনি সেখানকার সেন্টজোসেফ্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁহার নাম Father A. Relizzo, D. Litt (Padua). তিনি লাটিন ও গ্রীক ভাষায় ডক্টরেট ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। পূর্বনির্ধারিত সময়ে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা শুনিয়া লিখিয়া লইলাম।

সংগঠন :—শিক্ষাব্যবস্থার পাঁচটি বিভাগ আছে —কিণ্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, এবং বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণতঃ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক রহিলাই কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলি পরিচালনা করেন; কিন্তু দেশের প্রত্যেক অংশে এই স্কুলগুলি নাই। ১৪ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। কিন্তু ছাত্রগণকে নিজেদের বই কিনিতে হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Scula Elementare), পাঁচটি শ্রেণী আছে। ছাত্রগণের যখন ছয় বৎসর বয়স পার হয় (৬+) তখন তাহারা ভর্তি হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Scula Media) আরম্ভ হইয়া অষ্টম শ্রেণীর শেষ হয়; যদিও ইটালীতে এই ষষ্ঠ শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণী, সপ্তম শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীকে তৃতীয় শ্রেণী বলে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা, লাটিন, একটি বিদেশী ভাষা (ইংরাজী ফ্রেঞ্চ অথবা জার্মান—যদিও আজকাল ইংরাজীরই চলন বেশী) অঙ্ক জ্যামিতি—পাটীগণিত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হয়, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম এবং ব্যায়াম পড়ান ও শিখান হয়। সকল পাঠ্যবিষয়ই বাধ্যতামূলক। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীগুলি কলেজের শ্রেণীর সমান। এই প্রকার তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। পরীক্ষা দিয়া তাহারা যে ডিগ্রী দেয় তাহা আমাদের দেশের Bachelor ডিগ্রীর সমান।

যখন Scula Media বিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র

তাহার পড়া শেষ করে তখন সে সাত আট বছর বিদ্যালয়ের কোনোটিতে ভর্তি হইতে পারে।

(১) Ginnasio :—এখানে মাতৃভাষা, লাটিন, গ্রীক, ইতিহাস, অঙ্ক এবং একটি বিদেশী ভাষা দুই বৎসর ধরিয়া শিখান হয়। ইহা ইংল্যাণ্ডের গ্রামার স্কুলের সমান। এই বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া ছাত্র Liceo Classico নামে আরও একটি উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে। সেখানে তিন বৎসর পড়িতে হয়। সেখানে মাতৃভাষা, লাটিন, গ্রীক, দর্শন, কলাবিদ্যার ইতিহাস (History of Arts), ইতিহাস, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, অঙ্ক, ভূবিদ্যা (প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যাসহ), পড়ান হয়। তারপর ছাত্র ইচ্ছা করিলে আইন অথবা চিকিৎসা শাস্ত্র, স্থাপত্য বিদ্যা এবং বলিতে গেলে যে কোন বিষয় পড়িতে পারে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া (Liceo Classico) ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে।

(২) ছাত্র ইচ্ছা করিলে ইহার পর Liceo Scientifico বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া পাঁচ বছর পড়িতে পারে। তাহার পর চিকিৎসা বিদ্যাসহ উচ্চতর বৈজ্ঞানিক বিষয় পড়িতে পারে।

(৩) ছাত্র ইচ্ছা করিলে Liceo Artistico নামক বিদ্যালয়ে চার বৎসর পড়িতে পারে। ইহার পর সে Fine Arts Academy নামক বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। ইহার পর স্থাপত্য বিদ্যায় অধিক জ্ঞানলাভের জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে।

(৪) সে ইচ্ছা করিলে Institulo Magistrale নামক বিদ্যালয়ে গিয়া চার বৎসর পড়িতে পারে। তখন সে মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াইবার উপযুক্ত হইবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নহে। এখান হইতে সে যে ডিগ্রী পায় তাহাকে Liouza Magistrale কহে। ইহা আমাদের দেশের L. T.-এর সমান—Bachelor ডিগ্রীর নীচে। তারপর শিক্ষা অথবা কোন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা পাইবার জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে।

(৫) সে Institulo Technico নামক বিদ্যালয়ে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং ও বাণিজ্য বিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা পাইবার জন্য যাইতে পারে। পাঁচ বছর পড়িতে হয়। এখানে যে ডিগ্রী পাওয়া যায় তাহাকে Regionicre বলে; ইহা Bachelor ডিগ্রীর সমান। ইহার পর অর্থনীতি অথবা বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা পাইবার জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে।

(৬) ইহার পর সে পাঁচ বছরের জন্য Institulo Technico Industrialo নামক বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। মেকানিকস্, বিদ্যুৎ, অঙ্কন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিষয় এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়ান হয়। এইগুলিতে ভবিষ্যতের ইঞ্জিনিয়ারগণ শিক্ষালাভ করে। যে ডিগ্রী পাওয়া যায় তাহাকে Perito Technico বলে। ইহা Bachelor ডিগ্রীর সমান। ইহার পর ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া আরও শিক্ষালাভ করিতে পারে।

(৭) ছাত্র পাঁচ বছরের জন্য Institulo Technico Agrario নামক বিদ্যালয়ে পড়িয়া Perito Agrario নামক ডিগ্রী পাইতে পারে। সে কৃষিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়। তাহার পর সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। উপরে যে সকল বিদ্যালয়ের কথা বলা হইল Liceo Classico নামক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিদ্যালয়গুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক :—মাতৃভাষাসহ দুইটি ভাষা, অঙ্ক, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূবিদ্যা (Geology)।

Master ডিগ্রী নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ডক্টরেট পড়ান হয় এবং ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়। চিকিৎসা বিদ্যায় ডক্টরেট পাইতে হইলে ৬ বৎসর, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং Industrial Chemistry-তে ডক্টরেট পাইতে পাঁচ বছর লাগে। চার বছরের

কম অন্ত কোনও বিষয়ে ডাইপ্লোমা পাওয়া যায় না। যাহাদের অবস্থা ভাল শুধু তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পড়া শুনা করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেমন আংশিক সময়ের জন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, ইটালীতে তাহা নাই।

Scuola Media ছাড়াও আর এক শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে; তাহাকে Avviamento বলে। সেখানে ৭ বছর পড়ান হয়।

Scuola Media বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় পড়ান হয় এই Avviamento বিদ্যালয়ে লাটিন ব্যতীত তাহাদের সব কিছুই পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানে ব্যবহারিক (Practical) দিকের উপর জোর দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে যাহারা মোটরগাড়ী, জাহাজ, রেডিয়ো, টাইপ রাইটার, চশমা ইত্যাদি তৈয়ারী বা মেরামত করিতে শিখিবে এখানে তাহাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। এইজন্ত স্কুলে উপযুক্ত ওয়ার্কশপ থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র যখন তাহার পড়া শেষ করে তখন অভিভাবকই ঠিক করেন যে তাহার পোষ্য কি পড়িবে এবং কোথায় পড়িবে। শিক্ষক শুধু পরামর্শ দেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্তই শুধু ট্রেনিং কলেজ আছে; অন্ত কোনো প্রকার ট্রেনিং কলেজ নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়াইবার জন্ত শিক্ষকের ডক্টরেট ডিগ্রী থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র সেই শিক্ষা প্রচলিত। ছাত্রগণকে বাড়ীর কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রতি সপ্তাহে প্রতি বিষয়ে অন্ততঃ একবার এই কাজ করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও সাপ্তাহিক পরীক্ষা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাহারা পড়ান তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক, এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাহারা পড়ান তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে কোন স্থল ব্যক্তিবিশেষ বা মিশনারী দ্বারা পরিচালিত হয় না। পরীক্ষা:—ক্লাসে সাপ্তাহিক পরীক্ষা সহ মৌখিক পরীক্ষা বছরে লওয়া হয় কিন্তু প্রতি তিন মাসের শেষে অফিসে প্রতি বিষয়ের মার্ক জমা দেওয়া হয়। ইহার পর প্রগ্রেস রিপোর্টে এই মার্ক লেখা হয়। অভিভাবক প্রগ্রেস রিপোর্টে সহি করিয়া থাকেন। স্কুলের প্রত্যেক শেষ পরীক্ষায় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা লওয়া হয়, কিন্তু কোনো ডিভিসন থাকে না। ছাত্রগণ শুধুমাত্র পাশ করে। Scuola Media বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র তাহাদের পড়া শেষ করিয়াছে তাহাদিগকেও মৌখিক এবং লিখিত উভয় পরীক্ষা দিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট স্কুলগুলি এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এইভাবে Ginnasio বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় ছাত্রগণ অবশ্যই হাজির হইবে। যে সকল বিদ্যালয় স্বীকৃতি পায় নাই তাহাদের ছাত্রগণ স্বীকৃতি পাইবার জন্ত এই সকল পরীক্ষায় হাজির হইতে পারে। প্রত্যেক শেষ পরীক্ষার সকল প্রকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মৌখিক পরীক্ষা লইয়া থাকেন। যদি কোনো ছাত্র লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করে তবে যে যে বিষয়ে সে ফেল করিয়াছে সেই সেই বিষয়ে তিন মাস পরে কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় হাজির হইতে পারে।

Liceo Classico পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লিখিত পরীক্ষার জন্ত এবং তাহার প্রশ্ন গভর্ণমেণ্ট তৈয়ারী করিয়া ছাপাইয়া পাঠান। কিন্তু বিভিন্ন কমিশন দ্বারা উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষিত হয়। প্রতি স্কুলের জন্ত গভর্ণমেণ্ট প্রতি বছর এক একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। শিক্ষকগণ এই কমিশন দ্বারা নিযুক্ত হইয়া পরীক্ষার প্রহরীর কাজ করেন, মৌখিক পরীক্ষা লইয়া থাকেন, এবং লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষারই মার্ক দেন।

পরীক্ষার মার্ক দিবার পদ্ধতি আগাগোড়া একই

প্রকার। প্রতি বিষয়ে সম্পূর্ণ মার্ক (Full Marks) মাত্র দশ। ইহার ব্যাখ্যা এইপ্রকার: মৌখিক পরীক্ষায় দশ মার্ক এবং লিখিত পরীক্ষায় ১০ মার্ক থাকে। ছাত্র মৌখিক পরীক্ষায় ৮ মার্ক এবং লিখিত পরীক্ষায় ৬ মার্ক পাইতে পারে। সেক্ষেত্রে সে মোট ১৪ মার্ক পাইবে। ইহাকে অর্ধেক দুই দিয়া ভাগ করা হইবে। ফলে সে ৭ পাইবে এবং ইহাই তাহার শেষ মার্ক। পরীক্ষায় পাশ মার্ক ৬। যদি ছাত্র এই সর্বনিম্ন মার্ক না পায় তবে সে ফেল করে। কিন্তু কোনো ছাত্র যদি অন্ত বা মাতৃভাষার পাশের নীচে পায় তবে তাহাকে সেই সেই বিষয়ের মৌখিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। শিক্ষক মৌখিক বা লিখিত প্রতি প্রশ্নে কোনো মার্ক দেন না। যখন পরীক্ষার্থী ছাত্রের পরীক্ষা (লিখিত অথবা মৌখিক) শেষ হয় তখন শিক্ষক মার্ক দেন। ছাত্রের সম্পূর্ণ উত্তর বিচার করা হয়। তাহার পৃথক পৃথক উত্তর বিচার করা হয় না। ইহার একটা সুবিধা এই যে শিক্ষক ছাত্রের মোট উত্তর বিচার করিয়া সে পাশ করিবার কি ফেল করিবার উপযুক্ত তাহা বিচার করিতে পারেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো বাহিরের পরীক্ষা নাই।

ছুটী :—অক্টোবর মাস হইতে স্কুলের বছর আরম্ভ হইয়া জুন মাসে শেষ হয়। জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর এই তিন মাস গরমের ছুটি। ইহা ছাড়া রবিবার, প্রায় দশটি জাতীয় দিবস, দুই দিন কার্নিভাল এবং অনধিক তিন সপ্তাহ ধর্মানুষ্ঠানের ছুটি থাকে। শনিবারে অন্যান্য দিনের মত পুরা কাজ হয়। আংশিক ছুটি নাই। স্কুল প্রত্যেক দিন পাঁচ ঘণ্টা বসে। ইহার মধ্যে ব্যায়ামের জন্য ১ঘণ্টা থাকে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত এই ব্যায়াম বাধ্যতামূলক। সাধারণতঃ স্কুল সকাল ৮টায় বসে এবং দুপুর ১টায় ছুটী হয়; মাঝখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইংল্যাণ্ডে গরমের ছুটির মধ্যে যেমন কাজ করিবার সুযোগ সুবিধা থাকে ইটালীতে সে সুযোগ নাই।

বেতন :—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বেতন ৩০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকার মধ্যে। অভিজ্ঞতা, চাকুরী কালের দৈর্ঘ্য, এবং সন্তানদের সংখ্যার উপর বেতন নির্ভর করে। সাতপ্রকার বা আটপ্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাহারও বেতন ৪০০ টাকার কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ৮০০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ব্যতীত আর কোনও শিক্ষক মোটর গাড়ী কিনিতে পারেন না। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষক স্কুটার গাড়ী কিনিতে পারেন। ইটালীতে ১০০০৲ টাকায় নূতন স্কুটার কিনিতে পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যান তথ্য :—১৯৫৪-৫৫ সালে ইটালীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছোদ্দ লক্ষ বাইশ হাজার ছয় শত চোদ্দ জন ছাত্র পড়িত। সকল শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা ৮১টি গভর্মেণ্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। মোট ছয় হাজার নয়শত ছইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। ইহাদের মধ্যে চার হাজার একশত চুরাশিটি গভর্মেণ্ট পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে যে Liceo Classico পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে কুড়ি হাজার ছয়শত পোনরো জন পরীক্ষার্থী ছিল। পোনরো হাজার পাঁচশত তিরাশি জন পাশ করিয়াছিল—অর্থাৎ শতকরা প্রায় ছিয়াত্তর জন। চর্চের বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে সমগ্র দেশে প্রায় ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ৯৭

অনুশাসনহীনতা ১০০
ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ

প্রাণের শিক্ষা ১০৪
শ্রীমতী বকুলমালা সেন

পিছিয়ে পড়া শিশু ১০৭
শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রদের প্রতি ১০৯
শ্রীহারাধন রক্ষিত

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

প্রাথমিক শিক্ষক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

স্বাধীন ভারত গড়িবার স্বপ্নকে সার্থক করিতে গেলে দেশের শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনার যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, সে বিষয় মুখের কথায় ও লিখিত উক্তিতে সর্বত্রই স্বীকৃত হয়। কিন্তু কাজে কতটা হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমার শিক্ষার গোড়াপত্তন যেখানে, সেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চলার বেগ নিতান্তই ঢিমা তালে চলিতেছে। তাই সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইবে পড়িয়া বিশেষ আনন্দ হইল।

সরকারি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক হইবে। ইহার জন্য শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক ও পরিবেশের উপযোগী করা প্রয়োজন। আর তাহার জন্য চাই উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষকশিক্ষিকার নিম্নতম বেতনের হার উন্নত না হইলে শিক্ষকের কাছে ভাল কাজ আশা করা বৃথা। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের ন্যূনতম বেতন ৭০৲ টাকা আর অন্য শিক্ষকের ৫০৲ ধার্য আছে। এই বেতনে আর ভাল শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নয়। যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হয় সেজন্য শিক্ষকদের গ্রেড ও বেতনের পরিবর্তন করিতে হইবে। অনেক অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্র অর্থের অভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না। এই পরিকল্পনায় তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে বৃত্তি দিয়া শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কথা আছে। শিক্ষা শেষ করিয়া কয়েক বৎসর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করা ইহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক থাকিবে। নির্ধারিত সময়ের পরে ইহারা কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করিতে পারিবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি

আগরতলা স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। ত্রিপুরার মহারাজাদের বিদ্যোৎসাহী শিল্পানুরাগী এবং রাজ্যের কল্যাণ সাধনে চেষ্টিত বলিয়া খ্যাতি ছিল। মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যের নানাবিধ শিল্প একসময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই শিল্পকলার

মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অরণ্যসঙ্কুল সঙ্কুচ, পর্বতমালা-বেষ্টিত এই দেশটি একদিকে যেমন আপনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে এই প্রাকৃতিক বিধানই তাহার শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের পথে অন্তরায় হইয়াছে। ফলে শিল্পী আজ দরিদ্র, অনুশীলনের অভাবে শিল্পকলা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থাটা একটু বিশেষ রকমের দাঁড়াইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য, কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেছে। একজন চীফ কমিশনার এই রাজ্যের প্রধান। হিন্দুস্থানের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ কেবল আকাশপথে; স্থলপথে বা জলপথে যাতায়াতের উপায় নাই। দূরত্ব যাহাই হউক, চলাচলের অসুবিধা ইহাকে অন্যান্য প্রদেশ হইতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে।

তবু নূতন ব্যবস্থায় ত্রিপুরারাজ্য বেশ দ্রুত উন্নতি করিতেছে। চীফ কমিশনারদের বিশেষ দৃষ্টির ফলে দেশের মধ্যে বেশ একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। মহারাজার প্রাসাদগুলি আজ আতুরাশ্রম, কিন্তু তাহাদের আশেপাশে যে সব লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা শোভায় সৌন্দর্যে উপেক্ষণীয় নয়। কর্মনিষ্ঠা, কর্ম-চাঞ্চল্য ও কর্মব্যস্ততা তাহাদের লোকচক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

শিক্ষার প্রচার, শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন, আর্ত ও পীড়িতের সেবা, সমাজের অবহেলিত মানবের উন্নতিসাধন, দেশের নিজস্ব সম্পদ রক্ষা করা, সব দিকেই অগ্রগতির পরিচয় সুস্পষ্ট। তবু তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন বেশি করিয়াই চোখে পড়ে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়, সব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানই মনোরম পরিবেশে, উপযুক্ত ভবনাদিসহ আপন আপন লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পকলা ও শিক্ষা

বিশেষভাবে যাহা লক্ষ্য করিবার তাহা হইল দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল প্রতিষ্ঠানেই শিল্পকলার চর্চার দিকে শিক্ষা-অধিকারের বিশেষ দৃষ্টি। কোথায় কোন্ শিল্পী অর্থাভাবে সুযোগের অভাবে দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব প্রকারে সাহায্য দিয়া শিল্প ও শিল্পীর পুনর্বাসনের জন্য ইঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। এই সব শিল্পী অপরকে শিক্ষা দিবেন, দেশের শিল্পকে বাঁচাইয়া নূতন প্রাণ দিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিবেন।

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আজ তো আর কাহারও দ্বিমত নাই। ত্রিপুরারাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাতের কাজের সমাদর দেখিয়া আনন্দ হয়।

এখানে কয়েকটি জিনিস চোখে পড়ে। তাহা হইল সরকারের শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের সঙ্গে শিক্ষা-অধিকারের সহযোগিতা। বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে এবং অন্য আরও বিদ্যালয়ে যে সব শিল্পবস্তুর উৎপাদন হইতেছে তাহাদের বিক্রয়াদির ভার কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন, ফলে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি পড়িয়া থাকে না। বেশ চাহিদা আছে ঐসব জিনিসের। উহাদের মধ্যে রুচি ও সংস্কৃতির প্রকাশ জাতির ঐতিহ্য এবং কর্তৃপক্ষের উন্নত পরিকল্পনার প্রমাণ দেয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মীরা উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছুটা হাতে পায়, কিছুটা তাহাদের নামে জমা থাকে, শিক্ষার শেষে যাহাতে সমবায়ের ভিত্তিতে তাহারা অর্থোপার্জন করিতে ও স্বাবলম্বী হইতে পারে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল

এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় যে সকল

ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে।

যাহারা প্রথম বিভাগে গেল তাহারা তো সাদরে যে কোন ভাল কলেজে স্থান পাইবে। দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও অবশ্য সহজেই ভর্তি হইতে পারিবে। কেন না, কলেজগুলিতেও তো ছাত্র চাই। ভাবনা অবশিষ্ট যাহারা, তাহাদের জন্য। ইহারা কোথায় যায়? কোন্ লাইন তাহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা কে নির্ণয় করিবে? দেশের যুবশক্তির অপচয় না হয়, সেদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই নজর দেওয়া কর্তব্য। যাহাকে আমরা উচ্চ শিক্ষা বলি, তাহাই তো একমাত্র পন্থা নয়। বিকাশের নির্ভুল পথনির্দেশ প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বিগত বর্ষে প্রায় চারিমাস ধরিয়া এবং এই বৎসর জানুয়ারি হইতে মার্চ মাসের মধ্যে ইহাদের প্রায় ১৪ হাজার ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৪৭৮০ ছেলেমেয়ে দাঁত ও মাড়ির রোগে, প্রায় তিন হাজার জন গলার রোগে এবং ১৪৮২ জন শ্বাস সংক্রান্ত রোগে ভুগিতেছে। ইহা ব্যতীত চোখ নাক কানের রোগে, পেটের রোগে ও চর্মরোগেও অনেকে ভুগিতেছে।

কোন্ কোন্ রোগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশি এবং শতকরা কতজন সেই রোগাক্রান্ত, এসব তথ্যের অনুসন্ধান তো একান্তই আবশ্যক। তাহার সঙ্গে প্রতিকারের কথাও যে ভাবা দরকার। কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলগুলিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বল্প পরিসরে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু আছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও গৃহের ব্যবস্থার প্রতি যদি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি না থাকে, তবে তো স্থায়ী ফল পাওয়া অসম্ভব। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পিতামাতা ও অভিভাবকের একযোগে চেষ্টা না থাকিলে, পৌরপ্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীর আবাসগুলির দিকে বিশেষ নজর না দিলে, এই বৃহৎ সমস্যার সমাধান কোন মতেই সম্ভব নয়।

ছাত্রসমাজের অনুশাসনহীনতা

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, লখনউ

আজ কাল প্রায় সর্বত্রই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছাত্রসমাজ নাকি অনুশাসনহীন। যদি এ অভিযোগ কেবল মুষ্টিমেয় প্রাচীনপন্থীর মুখে শোনা যাইত যাঁহারা সর্বদাই বাল্যকালের স্বর্ণযুগের পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া থাকেন "আজকালকার ছেলেদের হল কি?" তাহা হইলে হয়ত আমরা ইহাকে উপেক্ষা করিতাম, কারণ ঐ সকল প্রাচীনপন্থী বাল্যকালে হয়ত এইরূপ কথা নিজেরাই শুনিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু এ অভিযোগ কেবল তাঁহাদেরই নহে। অনুশাসনহীনতার আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। পরীক্ষার কঠিন প্রশ্নপত্র আসা নূতন ব্যাপার নহে। আর এরূপ প্রশ্নপত্রের জন্য রোষ বা ক্ষোভ হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময়ে এ বিক্ষোভ যে আকার ধারণ করিয়াছিল পূর্বে কখনও এরূপ হইয়াছে কি? রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সাধারণের নিরাপত্তার জন্যই গাড়ীতে চেনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতীতে

ক্রীড়াচ্ছলে বা হয়ত দুষ্টুমির মনোভাব কেহ কেহ চেন টানিয়া থামিত হয় নাই এমন নহে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র নিয়ন্ত্রণকারীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে বহু স্থানে সাধারণ যাত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়াও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চেনকে অকর্মণ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে যুগে রেলের মালিক ব্রিটিশ কোম্পানী ছিলেন সে যুগে যত ছাত্র বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিত, বর্তমানে রেলওয়ে জাতীয় সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও তাহার বহুগুণ বেশি ছাত্র বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিয়া যেন আনন্দ পায়। পথে ঘাটে বা ট্রামে বাসে, একাকিনী তরুণীর প্রতি অভদ্রতা প্রদর্শন বর্তমানে যত বাড়িয়াছে, এতটা দশ পনের বৎসর আগে ছিল কি?

পাঁচ বৎসর পূর্বে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এ রোগের কয়েকটি কারণ দেখাইয়াছিলেন। সংক্ষেপে যে কারণে অনুশাসনহীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল ছাত্রসমাজে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠাহানি। ইহা আবার পাঁচটি কারণের ফল: (ক) দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিক্ষকসমাজ নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করায় ছাত্রসমাজ তাঁহাদের ছাড়িয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। (খ) যে যুগে উচ্চবেতনের পদগুলি বিদেশী-অধিকৃত ছিল সে যুগে শিক্ষকের অল্পবেতন বা দারিদ্র্য ততটা কৃপাপাত্র ছিল না, যতটা বর্তমানে হইয়াছে, কারণ বর্তমানে অনেকেই শিক্ষক অপেক্ষা বহুগুণ বেতন পাইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। (গ) অল্প বেতনের জন্য কেবল নৈরাশ্যবাদীই শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করিতেছেন ও সাধারণতঃ তাঁহাদের যোগ্যতার মান বিগত যুগের শিক্ষকগণীর অনেক নীচে। (ঘ) আজকাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা সকলেই করিয়া থাকেন। এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে যে শিক্ষকবৃন্দ এই ব্যবস্থাকে চালু রাখিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও আমরা ক্রমশঃ শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছি যদিও এই ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকের কোন হাত নাই।

(ঙ) অর্থাভাবে গৃহশিক্ষকের কার্য গ্রহণে বাধ্য হওয়াতে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা আরও হ্রাস পাইয়াছে। ছাত্রসমাজ ইহা মনে করে যে, মাসিক কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে যে কোনও ছাত্র শিক্ষকের শুধু ভৃত্য নহে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার দাসত্ব ও নিরপেক্ষতাও ক্রয় করিতে সমর্থ।

শিক্ষকের প্রতিষ্ঠাহানির অতিরিক্ত আরও তিনটি কারণ বর্তমান:—

(১) শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অথবা প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা বর্তমান যুগে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত এমন সব ছাত্র শিক্ষা-লাভের জন্য আসিতেছে যাহারা পুস্তককেন্দ্রিক (academic) শিক্ষা হইতে সম্যক লাভবান হইতে পারে না। শিক্ষাপ্রদানের সময়ে ইহারা কিছুই বুঝিতে পারে না ও শিক্ষায় আকৃষ্ট হইতে পারে না। কাজেই সময় কাটাইবার জন্য ইহারা নিত্য নূতন উপদ্রবের পথ খোঁজে।

(২) আদি যুগে যখন মুষ্টিমেয় ছাত্র স্কুলে পড়িত তখন ভাল ভাবে পরীক্ষা পাশ করিলে হয়ত চাকুরী লাভ কঠিন ছিল না। আর সেই আশায় সকলেই পড়ায় মন দিত। বর্তমান বেকারসমস্যার যুগে একটা নৈরাশ্যবাদের ছায়া সকল ছাত্রেরই মন অন্ধকার করিয়াছে, আর এই নৈরাশ্যবাদ পরিশ্রমের পরিপন্থী।

(৩) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বরাবরই প্রভুত্ব-বাদী (authoritarian)। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে ইহা একেবারে অচল।

অধ্যাপক কবীর মহাশয় যে যুক্তিগুলি দেখাইয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়, তবে বোধ হয় তিনি দু'একটি কারণ উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন,

আবার দু'একটি কারণ সম্বন্ধে তিনি যতটা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিক বলা সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ ছাত্রসমাজে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা-হানির কথাই লওয়া যাউক। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই শিক্ষকের প্রতিষ্ঠাহানি হয় নাই। সে যুগের পথনায়ক-বৃন্দের অদূরদর্শিতাও ইহাতে ইন্ধন যোগাইয়া ছিল। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দকে "পাপী কুরুপক্ষের বেতন-ভুক দ্রোণাচার্য" বলিয়া শিক্ষকের প্রতিষ্ঠাহানি করা হইয়াছিল। অবস্থা বিপর্যয়ে সে যুগের পথ-নায়ক আজ অনেক স্থানে স্বাধীন সরকারের সদস্য, এবং এ যুগের বিরোধী পক্ষ তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজকে প্ররোচিত করিতেছেন। এ যুগেও শিক্ষক পূর্বের মতই নিরপেক্ষ আছেন। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার কদর্থ করা হইতেছে। বর্তমান যুগের বিরোধী পক্ষ ইহা দেখাইতেছেন যে শিক্ষকসমাজ মেরুদণ্ডহীন। এককালে তাঁহারা ব্রিটিশ শাসকের অনুবর্তী থাকিয়া যে কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন, আজ তাঁহারা সেই কংগ্রেসেরই সহায়ক হইয়া ছাত্র ধর্মঘট দমন করিতেছেন। উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষক যে একই নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন একথাটা যেন ইচ্ছাপূর্বকই ভুলিয়া যাওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠাহানির অন্য যে সব কারণ কবীর মহাশয় দেখাইয়াছেন এবং আমাদের প্রভূত্ববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবীর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে অবশ্যস্বীকার্য। তবে স্কুলে অত্যধিক ছাত্র-বৃদ্ধি ও তাহার মধ্যে যে এমন ছাত্রও অনেক আছে যাহারা কোনরূপ পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম, সেকথা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে একথাটারও উল্লেখ করা উচিত যে বৃত্তিমূলক ও অর্থকরী ঐচ্ছিক বিষয় আমাদের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই ইহার অন্যতম কারণ। হয়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক হইলে একদিকে মৈরাজ্যবাদ দূর হইবে, অন্যদিকে এই শ্রেণীর ছাত্রেরা অধীত বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কক্ষায় নিত্যনূতন উপদ্রবের পন্থা খুঁজিতে বিরত হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে আমরা পরীক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি অন্য দেশে ততটা করা হয় না। যে যুগে দক্ষ কেরাণী সৃষ্টিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে যুগে যে শিক্ষার অপেক্ষা পরীক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইবে, ইহা হয়ত স্বাভাবিক ছিল। তাই ১৮৫৪ সালে জেনারেল কাউন্সিল অফ এডুকেশন সিমিয়ার এবং জুনিয়ার দুই শ্রেণীর পরীক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন করেন। ১৮৫৭ সালে ভারতে যখন কলিকাতা বোম্বাই এবং মাদ্রাজ নগরে প্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন প্যারিস বা বলোগনা, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ, স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা অথবা আমেরিকার হার্ভার্ড ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও আমরা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কেই আদর্শ মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেবল মাত্র পরীক্ষা-কেন্দ্রেই পরিণত করি। ১৯১৭ সাল অবধি যত-গুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্য সব কয়টিরই পরীক্ষা গ্রহণ একমাত্র কার্য ছিল। ১৯১৭ সালে কয়েকটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও শিক্ষার অপেক্ষা পরীক্ষার প্রতি এখনও অধিক গুরুত্ব প্রদত্ত হয়। ১৯৫৬ সালেও তাই দেখি, উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩১,১৩৭ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শ্রেণীগুলিতে পড়িয়া থাকে এবং ১৩,৩৫৮ জন ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট (constituent) কলেজে পড়ে যাহাতে শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণ কতকটা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। পক্ষান্তরে, শতকরা ৭৭ জন অর্থাৎ ৪৫৩,৭১৩ জন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সেকেণ্ডারী বোর্ডের অধীন এমন কলেজগুলিতে (affiliated) পড়ে, যাহার

সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু দুইটি মাত্র সম্বন্ধ আছে, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন ও পরীক্ষা গ্রহণ। এই একটা ব্যাপার হইতেই প্রতীত হইবে আমরা পরীক্ষা ব্যাপারকে কতটা গুরুত্ব দিয়া থাকি। স্কুল কলেজের সমস্ত শিক্ষাই এই পরীক্ষা প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরীক্ষা আজ শিক্ষার সহায়ক না হইয়া শিক্ষার নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আদি যুগে হয়ত এ ব্যবস্থার দ্বারাও আমরা ছাত্রমণ্ডলীকে কতকাংশে পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতাম। কিন্তু যে প্রণালীতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহা প্রবন্ধপ্রণালী নামে খ্যাত। ছাত্রেরা ইহাতে তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্রে পাঁচটি অথবা ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে। এই সকল প্রবন্ধের মূল্যাঙ্কন অনেকাংশে পরীক্ষকের রুচির উপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ নির্দিষ্ট বিধি এখানে অসম্ভব! যদি একই পরীক্ষক এক বিষয়ের সকল প্রশ্নপত্রের স্বয়ং মূল্যাঙ্কন করেন তবে হয়ত কতকটা সমতা রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় একই প্রশ্নপত্র একাধিক পরীক্ষকের মধ্যে বিতরণ করিতে হইতেছে, তাঁহাদের মূল্যাঙ্কনের মানদণ্ড এক নহে। কাজেই পরীক্ষার ফল ছাত্রের যোগ্যতার উপর নির্ভর না করিয়া অনেকাংশে কোন পরীক্ষক প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা করিবেন তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রশ্নপত্রের আধিক্য অনেক স্থলে এরূপ পরীক্ষক নিয়োগ করিতে বাধ্য করিতেছে যাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে দায়িত্বশীল নহেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় পরীক্ষা-গ্রহণের সময়েও উপযুক্ত সতর্ক পরিচালন অসম্ভব হইতেছে। এই সকল কারণে ছাত্রসমাজ পরীক্ষার প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, এবং পরীক্ষার ভীতি যে পরিশ্রমের প্রেরণা দিত তাহাও নষ্ট হইয়াছে। হয়ত পরীক্ষার ধারা পরিবর্তন দ্বারা ও পরীক্ষাকে অধিক বস্তুনিষ্ঠ (objective) করিতে পারিলে এ ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ সংশোধন সম্ভব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কার্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিয়া শুধু পরীক্ষা-ফলকেই উৎকর্ষের একমাত্র মান বিবেচনা করার রীতিরও সংশোধন আবশ্যক।

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের সমাজের নৈতিক পতনও বিদ্যালয়ের বা বিদ্যালয়ের বাহিরের অনুশাসনহীনতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কাটিকা বা কালোবাজার প্রভৃতি অনেক অসাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা অনেকে অর্থ সঞ্চয় করিয়া সমাজে যতদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিবেন ততদিন স্কুল কলেজের নৈতিক সংশোধনের আশা সুদূর-পরাহত। "কুল সমাজেরই দর্পণ বিশেষ" কথাটা মনে রাখিতে হইবে। সমাজের নৈতিক অধঃপতন অনেকাংশে দারিদ্র্যের ফলেই হয়। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী" কথাটা উপেক্ষা করা যায় না। লেখকের নিজ অভিজ্ঞতার দেখা, আমেরিকা বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বাজারে বিশুদ্ধ মার্খন, নকল মার্খন (Margarine) এবং উভয়ের মিলিত পদার্থ তিনই পাওয়া যায়। তাহাদের দাম আলাদা। ক্রেতা দাম দিবার সময়ে জানিয়া শুনিয়াই ক্রয় করেন। ভারতের বাজারের "বিশুদ্ধ ঘৃতের" মত তাহা বনস্পতির ভেজাল নহে। এইরূপ ঐ সকল দেশে যে দুধ পাওয়া যায় তাহাও নির্জলা। আমেরিকা যাত্রাকালে ইংলণ্ডেও লেখকের নির্জলা দুধের সন্ধান পাওয়া কঠিন হয় নাই। ফিরিবার পথে কয়েক মাস ইংলণ্ডে কাটাইতে হয়, তখন যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইংলণ্ডের ভাগ্যাকাশ ঘন ছায়াচ্ছন্ন। সে সময় দুধও নির্জলা ছিল না। এই একটি উদাহরণ হইতেই বোঝা যাইবে, দারিদ্র্যই অসাধু ব্যবহারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। হয়ত আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইলে এই ব্যবহার বহুলাংশে সংশোধিত হইবে।

ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিতে হইবে। অতীত যুগে আমরা অভিনেতৃসমাজের প্রতি অবিচার করিয়া তাঁহাদের

অপাংক্তেয় করিয়া ছিলাম, তাহা অশোভন ও অন্যায় ছিল সন্দেহ নাই, তাহার দ্বারা কলা ও কলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে চিত্রতারকাদের মাথায় তুলিতেছি, তাহাও কি শোভন? ক্রিকেট খেলাটা একটা বিশেষ সাধনারই জিনিস। কিন্তু দর্শন কোন চিত্রতারকার হস্তে ক্রিকেট ব্যাট দেখিতে আমরা দলে দলে টিকিট কিনিতে ছুটি তখন কি আকর্ষণ খেলায় না অন্য কিছুর? আমাদের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সম্মেলন ততক্ষণ সুসম্পন্ন হয় না যতক্ষণ তাহার মধ্যে চিত্র-তারকাদের প্রদর্শনীর একটা ব্যবস্থা না থাকে। বিবাহের আসর বা পূজামণ্ডপে তখনই লোক-সমাগম হইবে যখন সেখানে লাউড স্পীকার দ্বারা কোন না কোন সিনেমা সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইবে। বিদেশে আমরা এই সিনেমা সঙ্গীত এত অধিক পরিমাণে রপ্তানী করিয়াছি যে রুস বা ইটালীর নানাস্থানে ভারতীয় সঙ্গীত বলিতে সিনেমা সঙ্গীতই বুঝায়, ও কোন কোন স্থানে জাতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড রূপে সিনেমা সঙ্গীতের রেকর্ড চালান হইয়াছে এরূপ অভিযোগও শোনা যায়।

সিনেমার তারকা বা সঙ্গীতের প্রতি এত অধিক আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার জন্য দায়ী দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সমাজ যাহার মধ্যে রাজনৈতিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, গ্রন্থকার সবাই আছেন। তাঁহাদেরই জন্য আজ প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় চিত্রতারকার ছবির ছড়াছড়ি। প্রসিদ্ধ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির কথা আজ প্রত্যেক পাঠকের কণ্ঠস্থ। ইহার বিষময় ফল আজ ছাত্রসমাজের উপর ফলিতেছে। প্রত্যেক ছাত্র জীবনটাকে একটা রঙ্গমঞ্চ মাত্র মনে করিয়া উদ্ভট নায়ক বা পার্শ্বনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে, আর তাহারই ফলস্বরূপ পথে ঘাটে একাকিনী তরুণীর প্রতি অপমানকর ব্যবহার! হয়ত এরূপ অবস্থা আরও কিছুদিন চলিলে আরও বিষময় ফল ফলিবে। তরুণতরুণী সমস্ত জীবনটাকে রঙ্গমঞ্চ ভাবিতে শিখিলে ও তাহার ফলে তাহারা দৈনন্দিন জীবন, বিবাহ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবে ও পরস্পরের বিবাহিত জীবন বিষময় করিয়া তুলিবে। কারণ জীবন শুধু কাব্যময় নহে, তাহার মধ্যে গদ্যেরও বিরাট স্থান আছে।

এ অবস্থার আজ আশু প্রতিকার আবশ্যক। কেবল একটি মাত্র উপায়ের প্রয়োগে তাহা সম্ভব নহে। একযোগে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় এক-সঙ্গে প্রয়োগ করিতে হইবে :—

(১) ছাত্র সমাজের নিকট শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধি :—

(ক) ইহার জন্য শিক্ষককে চরম বেতন দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা তন্ত্র ও সুষ্ঠুভাবে থাকিতে পারেন ও গৃহ-শিক্ষকের অবমাননাকর কার্য গ্রহণে বিরত থাকেন।

(খ) প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে শিক্ষায়তন হইতে দূরে থাকিতে হইবে। দলীয় স্বার্থের জন্য তাঁহারা যেভাবে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠাহানি করিতেছেন তাহা যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী তাহা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে।

(গ) শিক্ষকের নানাবিধ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া, শুধু চাকুরী রাখিবার প্রয়োজনায় তাঁহারা যে সকল অবমাননাকর কার্য করিতে বাধ্য হন তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

(২) পাঠ্যবিষয়ের আমূল সংশোধন দ্বারা পাঠক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে :

(ক) যে সকল বিদ্যার্থী পুস্তককেন্দ্রিক (academic) শিক্ষা লাভের অযোগ্য, তাহারা আপন আপন শক্তির বিকাশের সম্যক সুযোগ পায়।

(খ) অর্থকরী শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা বর্তমানের বৈষম্যের মেঘ কাটিয়া যাইতে পারে।

(৩) পরীক্ষা প্রণালীর আমূল সংশোধন করিতে

হইবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যের কারণ প্রবন্ধ-প্রণালীর পরীক্ষাগ্রহণ বন্ধ করা আজ অসম্ভব। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার প্রবর্তন একান্ত আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে কেবল একটিমাত্র পরীক্ষাফলের উপর জোর না দিয়া দৈনন্দিন কার্যের উপরও গুরুত্ব অর্পণ করিতে হইবে।

(৪) সমগ্র সমাজের মধ্যে সততা ও সাধুতার প্রতি অধিক নিষ্ঠার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(৫) বিদ্যালয়ের পরিচালনা অধিক গণতান্ত্রিক করিয়া ছাত্রদের দায়িত্ববুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইবে।

(৬) বর্তমানে যে সিনেমার মোহ সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা অপসারণ করিতে হইবে।

একযোগে এতগুলি কার্য সুসম্পন্ন না করিলে অনুশাসনের আশা সুদূরপরাহত।

শ্রীঅরবিন্দ ও প্রাণের শিক্ষা

শ্রীমতী বকুলবালা সেন

শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্পিত সামগ্রিক শিক্ষার বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। তাঁর শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, সত্তার প্রতিটি অংশের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। দেহে প্রাণে মনে অন্তরাত্মার ও আধ্যাত্মিকতার সুসমঞ্জস নর-নারীই হবে বিবর্তনধারার অগ্রবর্তী বীচিমালা, ভাগবতপ্রসাদ প্রথমতঃ এদের আশ্রয় করেই আত্ম-প্রকাশ করবে।

সেই জন্য ভাগবত কর্মের কর্মীরূপেও বটে, আবার যন্ত্ররূপেও বটে, প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আপনাকে সামগ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু আধুনিক জগতে 'ভাগবত কর্ম' কথাটি বিদ্রূপাত্মক ভাবের সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা হয়। সে সম্বন্ধে সচেতন থেকে আমরা অন্য ভাষাতেও কথাটি প্রকাশ করতে পারি—বলতে পারি, দুঃখ-জীর্ণ বিশ্ব-মানবকে অক্ষয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে সাহায্য করার কাজে আমাদের সকল সত্তা যাতে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে পারি, এমন শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করে তোলাই আমাদের কর্তব্য। এর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সময়ের মত এমন গুরুতররূপে আর কখনই দেখা দেয় নাই। মানবীয় সত্তার উপরিউক্ত পাঁচটি অংশের পূর্ণ শিক্ষাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সামগ্রিক শিক্ষা। তিনি প্রাণের শিক্ষা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন, আজ সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

অপর সত্তাগুলির শিক্ষার মূল্যমান কিছুমাত্র না কমিয়েও বলতে পারা যায় যে প্রাণসত্তার শিক্ষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং দুরূহ। কোন সুস্পষ্ট পন্থা অনুসরণ করে এই শিক্ষার ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত কোন পদ্ধতিতেই আছে বলে আমাদের জানা নেই। পরিবেশ সম্বন্ধে অচেতন ও অপটু, অন্ধভাবে এ সম্বন্ধে আমাদের সত্তায় কখনও কখনও অস্পষ্ট রেখাপাত হয়—এই মাত্র।

এ শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সুকঠিন, সে কথা আগেই বলেছি। প্রাণ স্বেচ্ছাচারী শুধু নয়, অত্যাচারীও, এবং অত্যন্ত প্রভুত্বপ্রিয়। প্রাণ অসীম শক্তি-সামর্থ্য, উৎসাহ-উদ্দীপনার আকর।

সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয় প্রাণের শক্তিতে। সে জন্য সকলেই প্রাণকে খুশী রাখতে চায়। প্রাণকে শক্তিমান হয়ে উঠতে দেওয়ার অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে শক্তিমান হয়ে উঠতে দেওয়া, আরও শক্তি সঞ্চয় করে এক যথেচ্ছাচারী রাজাকে আরও দুর্দমনীয় করে তোলা। আবার প্রাণকে দুর্বল করে ফেলার অর্থ সকল ইন্দ্রিয়কে স্তিমিত করে, উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন শক্তি-সামর্থ্য-পরিশূন্য নির্বীর্য প্রাণীতে পরিণত হওয়া। এর কোনটিই আমাদের কাম্য নয়। প্রাণের স্বেচ্ছাচারিতায় ভীত হয়ে কোন কোন ধর্মসম্প্রদায় প্রাণকে পঙ্গু করে ফেলাই কর্তব্য বলে মনে করেছেন বটে, কিন্তু আমরা জানি, প্রাণ অপরিসীম শক্তির উৎস। তাই সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তার রূপান্তর সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষার ফলে প্রাণ তার স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে, অন্তরাত্মার আজ্ঞাবহ হয়, এবং অফুরন্ত শক্তির উৎস হয়ে মানুষের অভীষ্টসিদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

প্রাণকে ভাল করে বুঝে নিতে হলে, তার আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে তাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত করতে হলে, তার প্রভুত্বের ভিত্তি-ভূমি খুঁজে নিতে হবে।

কারণ দুটি। প্রথম কারণটি হলো এই যে, মানুষ মনে করে তার জীবনের লক্ষ্য হলো সুখী হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, তার ধারণা মানুষ নির্দিষ্ট স্বভাব নিয়ে জন্মায়, এবং তার পরিবর্তন কিছুতেই হতে পারে না।

দুটি বিশ্বাসই ভ্রমাত্মক। আনন্দলাভ মানুষের অভীষ্টের অন্তর্গত বটে, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে সুখ ও আনন্দ এক জিনিস নয়। আনন্দ ভগবানেরই বিশেষ প্রকাশ, কিন্তু সুখ প্রকৃতিজাত ও ভঙ্গুর। দ্বিতীয় ধারণাটির মূলে এই সত্য নিহিত আছে যে, মানুষ তার অবচেতনায় সঞ্চিত যে সংস্কার নিয়ে জন্মায় তাকেই তার নির্দিষ্ট স্বভাব বলে গ্রহণ করে। অবচেতনার দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে তার গর্ভগৃহ নিষ্কলুষ করতে হলে অসাধারণ রকম পরিণত চেতনা এবং ওপরদস্ত করুণার প্রয়োজন। এ দুটির সমবায় ঘটলে স্বভাবের রূপান্তর অসম্ভব নয়। কিন্তু কাজটি অতিশয় কঠিন এবং অপরিসীম অধ্যবসায়-সাপেক্ষ বলে একে আমরা শুধু যে অদম্ভবের পর্যায়ে ফেলে রেখেছি তা নয়, এজন্য কোন চেষ্টা করাও বৃথা কাজ বলে মনে করি। এই নিশ্চেষ্টতার পথ ধরেই প্রাণের প্রভুত্ব এমন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

সুতরাং প্রাণের শিক্ষা গ্রহণ করার আগে আমাদের প্রথমতঃ এই ভ্রম থেকে মুক্ত হতে হবে যে প্রাণের প্রভুত্ব অপরিহার্য। প্রাণের প্রভুত্ব অপরিহার্য নয়, প্রাণের শক্তি অপরিহার্য। এই অদম্য শক্তিকে অন্তরাত্মার আদেশে চালিত হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই প্রাণের শিক্ষা।

এজন্য দুটি ধারায় আমাদের শিক্ষাকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গুলির পুষ্টিবিধান এবং সুসমঞ্জস ব্যবহার। দ্বিতীয়তঃ নিজেকে জানা, নিজেকে চালানোর ক্ষমতা লাভ করা, অবশেষে নিজেকে রূপান্তরিত করা।

দেহের পুষ্টিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করে ইন্দ্রিয়গুলির স্ফুরণ হতে থাকে, তাই ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন কখনই শেষ হতে পারে না। অনুশীলনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি অপরিমিত শক্তি ও সূক্ষ্মতা লাভ ক'রে থাকে। পুরাকালের কোন কোন গুপ্তবিদ্যার অধিকারিগণ বিশ্বাস করতেন যে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুশীলনের ফলে বারো পর্যন্ত হতে পারে। যথাযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখা গেছে, দেহ চেতনাকে বিস্তৃত করা, দেহ-চেতনাকে দেহের বাহিরে কোন বিশেষ বিন্দুতে স্থাপন করা, দূরের জিনিস দর্শন করা, দূরের শব্দ শ্রবণ করা, সুদূরে অবস্থিত বস্তুর আঘ্রাণ, স্বাদ, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত পাওয়া অসম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে শিশুর মনে ভাল-মন্দ বোধ ও সুরুচি জাগিয়ে তুলতে হবে। শারীরিক স্বাস্থ্যের মত আজ চেতনার স্বাস্থ্যও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। দেহ সঞ্চালনের মধ্যে যেমন সুষমা থাকা প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যেও তেমনি সুসমঞ্জস সৌষ্ঠব থাকা চাই। শিশুকে সকল বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে সুন্দর সুস্থ ও মহৎ যা কিছু, তাকেই ভালবাসতে শেখাতে হবে। এই সুরুচিই রক্ষাকবচের মত প্রাণকে নিম্নগতি থেকে রক্ষা করবে, হীনতা ও জড়তা দূরীভূত করবে। এই সুরুচিই তার সকল কাজকে মহত্ত্বে ও ঔদার্যে ভরে তুলবে। এ হ'লো প্রথম ধারার শিক্ষার কথা। দ্বিতীয় ধারায় থাকবে স্বভাবকে জানা ও তার রূপান্তর সাধনের প্রয়াস।

সাধারণতঃ প্রাণের শিক্ষায় প্রাণকে নিগ্রহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এ পন্থায় প্রাণকে সহজে দমন করতে পারলেও ব্যক্তির যাত্রাপথে তার সম্মতি ও সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য যে সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি—সকলের সহায়তা ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়। প্রাণের সহায়তাও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং নিগ্রহ ক'রে প্রাণের দমন আমাদের পথ নয়।

দ্বিতীয় কথা, নিজেকে জানা। নিজেকে জানতে হলে নিজের সর্ববিধ গতিবিধি ও প্রবণতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই একমাত্র পন্থা। নিজের বাসনা-কামনা, আবেগ-উত্তেজনার গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যে অহঙ্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছে অধিকারবোধ, সঞ্চয়ের বাসনা, প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি, তা আবিষ্কার করতে হবে। এর আনুষঙ্গিক অবসাদ হতাশা প্রভৃতি যে সব বৃত্তি মানুষকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করে ফেলে, তাদের কবল থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

আত্মসচেতনতা ও আত্ম-পর্যবেক্ষণের সঙ্গে শিশু-মনে অতল গভীরতায় ও অবাধ বিস্তৃতিতে বিমুক্তি-লাভের দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নানা পন্থায় এই সঙ্কল্পকে সফল করে তুলতে পারা যায়। সকলের ক্ষেত্রে এক পন্থা প্রযোজ্য নয়। কারও প্রয়োজন যুক্তি, কারও হৃদয়ানুভব ও সমিচ্ছা, কারও বা আত্মমর্যাদাবোধ সহায় হতে পারে। কিন্তু অকপট উদাহরণের ক্ষমতা যে সকলের চেয়ে বেশী, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু সাফল্য লাভ করতে হলে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তর প্রয়োগ প্রয়োজন। পথ-চলায় পরাজয় বার বার আসতে পারে, কিন্তু কোন পরাজয়ই যেন প্রচেষ্টার সীমারেখা নির্দেশ না করে। মোট কথা, যদি আমরা আমাদের প্রাণকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই, তা হলে প্রথমতঃ আমাদের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ স্বভাবের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করতে হবে। কিন্তু কেন আমরা প্রাণকে শিক্ষিত করে তুলবো, তার কি প্রয়োজন, কোন্ আদর্শ রূপায়ণের জন্য এই সুকঠিন ব্রতে দীক্ষা, তার উদ্‌যাপনের প্রয়াস? আমাদের মনে রাখতে হবে, আদর্শের মূল্য অনুসারেই উদ্‌যাপিত ব্রতের মূল্যও নির্ধারিত হবে।

পিছিয়ে পড়া শিশু

শ্রীসরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষকরূপে কাজ করতে এসে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, "পিছিয়ে পড়া শিশু" হচ্ছে তার মধ্যে প্রধানতম। এই পিছিয়ে পড়া শিশুদের সম্বন্ধে সহকর্মী বন্ধুগণ প্রায়ই মন্তব্য করেন, "গবেট, কিচ্ছু হবে না।" কেন যে হবে না সহকর্মী বন্ধুরা তার সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেন নি। অধিকন্তু এমন কতগুলো যুক্তিহীন অবান্তর কথা শোনান যে নির্বিচারে তা গলাধঃকরণ করতেও পারি নি। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিশু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

ধরুন, ক্লাসে আপনি পাঠদান করছেন। একই জিনিস সমানভাবে সকলকেই বুঝিয়েছেন। অথচ তাদেরই মধ্যে কয়েকটি ছেলে কিচ্ছুই বুঝলো না। উপরন্তু অধীত বিষয় থেকে কোন প্রশ্ন করুন, দেখবেন এমনভাবে "হাঁ" করে তারা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে যে শেষটায় আপনি ধৈর্যই হারিয়ে ফেলবেন! এই ধরণের ছাত্রকেই সাধারণতঃ আমরা "গবেট" বলে ঘোষণা করি। বার বার চেষ্টা করেও এদের বুদ্ধির পরিমাপটাকে সাধারণ ছাত্রদের বুদ্ধির পরিমাপের সঙ্গে মিশ খাওয়াতে পারি না। কিন্তু তাই বলে কিচ্ছুই যে তার হবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি? যায় না। কারণ, পিছিয়ে পড়া বলতে দু'রকমের পিছিয়ে পড়া বুঝায়। এক, অসাধারণ পিছিয়ে পড়া; দুই, সাধারণ পিছিয়ে পড়া। আমরা বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র বা ছাত্রীকে 'গবেট' নাম দিয়ে অপাংক্তেয় করে রাখি তারা ঠিক তা নয়। তারা সাধারণ পিছিয়ে পড়া ছাত্র। দেখুন, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক্ নিউটন, গ্রামোফোন ও সিনেমেটোগ্রাফ আবিষ্কর্তা টমাস্ এডিসন্, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণেতা বোপদেব পণ্ডিত এবং মেঘদূত ও শকুন্তলা ইত্যাদি অমর গ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি কালিদাস, এঁরা পাঠ্য জীবনে সকলেই ছিলেন ব্যাকওয়ার্ড বা পিছিয়ে পড়া ছাত্র। তাই ব'লে তাঁরা গবেট ছিলেন, একথা কিছুতেই বলতে পারা যায় না। লেখাপড়ার ব্যাপারে নানা কারণে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়ে। আবার জীবনের ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক জগতে তারাই আবার কখন ভুলে এগিয়ে যায়। সুতরাং গবেট্ বলে কোন শিক্ষার্থীকে দূরে রাখা কোন শিক্ষকেরই উচিত নয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়া শিশুকে হট্ করে কিছু শেখানো যায় না। সাধারণ ছেলেদের পংক্তি থেকে তাদের আলাদাভাবে দেখা উচিত। কারণ, সাধারণ ছেলেরা যে বিষয় অতি অল্পেই আয়ত্ত করে ফেলে তারা তা পারে না, বরং সাধারণ ছেলেদের তুলনায় তারা অনেক বেশী সময় নেয়। সুতরাং এদের জন্য আবশ্যক, বিশেষ ধরণের অনুশীলন ও শিক্ষণ পদ্ধতি।

পিছিয়ে পড়ার কারণ প্রধানতঃ দুটি। এক, সর্বাত্মক মানসিক বিকাশের অভাব। দুই, শারীরিক অসম্পূর্ণতা বা বিকৃতি।

অসাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশুকে মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন, (১) জড়বুদ্ধি শিশু। এদের ধীশক্তি এমনই জড় বা অনড় যে এদের 'আইকিউ' বা বুদ্ধাংকের মান ২৫ এরও নীচে। প্রকৃতপক্ষে এরা কোন কাজেরই উপযুক্ত নয়। এরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপদার্থ। সে জন্য

এদের পাঠদান করা সম্ভব নয়। (২) ইন্‌বিসাইল. এই বয়সের শিশুদের মাস সিম্পল। এদের "আইকিউ" ৫১। এরাও পূর্বোক্ত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের মতই অসম্পূর্ণ এবং পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং এদেরও পাঠদান করা সম্ভব নয়।

(৩) বিষণ্ণমনা শিশু। এদের আইকিউ ৭০ এর নীচে। এরা যদি উপযুক্ত আদর্শ নিয়ে বড় হই, পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে তবে এদের দ্বারা নিম্ন শিক্ষালাভ এমন কি দীর্ঘ অনুশীলনের পর কিছু কিছু ভাষা শিক্ষালাভও করানো যেতে পারে। তবে এরা কোন জিনিস বেশী দিন স্মরণ করে রাখতে পারে না। বুদ্ধিশক্তি এদের এতই দুর্বল ও ক্ষীণ যে উত্তর জীবনে অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে এরা কোন উল্লেখযোগ্য কাজও করতে পারে না। (৪) মাঝামাঝি পর্যায় বা মিডিয়াম্ টাইপের শিশু। এই ধরণের শিশুদের বুদ্ধি খুব বেশী জড়ও নয়, আবার স্বাভাবিক অপেক্ষা খুব বেশী সজাগও নয়। এই শ্রেণীর শিশুরা শিল্পকর্ম বা বৃত্তিশিক্ষার কাজ আয়ত্ত করতে পারে। আবার শিক্ষাদান বা পাঠদান পদ্ধতি যদি হীন ও দুষ্ট হয় তবে উপযুক্ত শিক্ষকের চালনায় এরা বেশ কিছু লেখাপড়া শিখতে পারে। এর পর আসে এবং পর্যায় বা মূলবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের কথা। এদের আইকিউ ৮৯। শিল্প শিক্ষা বা বৃত্তিশিক্ষার কাজ এরা বেশ ভালই আয়ত্ত করতে পারে। আবার লেখাপড়াও এরা মোটামুটি রকম শিখতে পারে। তবে যে কোন প্রকার শিক্ষার প্রতি এদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এদের কর্মঠ করে তুলতে হ'লে চাই অসীম ধৈর্য, প্রচণ্ড উৎসাহ এবং উদ্দীপ্ত কর্মপ্রেরণা। বেত দেখিয়ে বা চোখ পাকিয়ে এদের মনে কর্মবেগ সৃষ্টি করবার চেষ্টা নিছকই হাস্যকর। অথচ অপরিসীম ধৈর্য আর অন্তরের প্রেরণা দিয়ে কাজ করবার মত শিক্ষক পেতে হলে শুধু ট্রেনিং দিলেই হবে না উপরন্তু সেইসঙ্গে সমস্ত শিক্ষকসমাজের অর্থনৈতিক দিকটায় যে বিশেষ নজর রাখা দরকার আমাদের কর্তৃপক্ষরা তা বুঝেও বুঝতে চান না, দুর্ভাগ্য বৈকি!

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার অসাধারণ শিশুকে পাঠদান করতে হলে তার জন্য পূর্ব থেকেই কিছু প্রস্তুতি চাই। অর্থাৎ নিম্নলিখিত অনুশীলনী অনুসারে তাদের তালিম দেওয়া দরকার। যেমন ধরুন, (১) অভ্যাস গঠন শিক্ষা। অর্থাৎ আত্মসচেতনতার জন্য যে যে রকমের আচরণ শিক্ষার প্রয়োজন সেই সব বিষয়ে তাদের Sensitive বা সজাগ করে তোলা। যেমন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস, আহার্যবস্তু গ্রহণের রীতি এবং স্ব স্ব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ইচ্ছাবোধ। (২) সামাজিক জ্ঞান। এই জ্ঞান হচ্ছে মাতা-পিতা, প্রতিবেশী ও সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ও মধুর ব্যবহার করার বোধ। (৩) আনুভূতিক শিক্ষা। অর্থাৎ মনকে চালনা করবার শিক্ষা, যেমন, পরিচিত বন্ধুদের নাম মনে রাখা, ছোট বড়োর মধ্যে ভেদ দেখতে শেখা, নানা রকমের জিনিসের মধ্যে মিল ও অমিল দেখতে শেখা, চাপা কান্না-ব্যথা-বেদনার অর্থ বুঝতে শেখা, এমন কি, চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদির কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া। (৪) বাক্ শিক্ষা :—অনেক শিশু উপযুক্ত বয়সেও পরিচিত ভাষা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারে না, অস্পষ্ট উচ্চারণ করে। এদের বাক্ শিক্ষা দিতে হলে নিয়মিতভাবে কতকগুলি পরিচিত শব্দ বারবার বলাতে হয়। এমন কি নিয়মিতভাবে ভাষা আবৃত্তির দ্বারা তাদের জিহ্বার জড়তা ভেঙে দিতে হয়। এইভাবে ক্রমিক চেষ্টায় শিশুর বাক্ শিক্ষা হোলে তবে তাকে পাঠদান করা চলে। (৫) মাংস-পেশীর ব্যবহার শিক্ষা। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে নাচ, ব্যায়াম বা খেলাধূলা করালে শিশুদের পেশী-সমূহ ঠিক ঠিক সঞ্চালিত হবার সুযোগ পায়। ফলে শিশু দেহের ভারসাম্য বা Balance রক্ষিত হতে

পায়। সেইজন্যই দেখা যায়, যে শিশু যত বেশী স্ফূর্তিবাজ বা স্বতঃস্ফূর্ত, তারা পাঠ শিক্ষায় তত দ্রুত অগ্রসর হয়। (৬) প্রকৃতি পরিচয় :—প্রকৃতির সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটালে শিশুরা স্পর্শ, দর্শন এবং শ্রবণ শক্তির মাধ্যমে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। পাঠ্য জীবনে এই অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা প্রভূত লাভবান হতে পারে। শারীরিক শ্রম অর্থাৎ ছোট ছোট কাজ অথচ দৈহিক পরিশ্রম হয় এমন ধরণের কাজ শিশুদের করতে দিতে হয়।

এইভাবে শিশুদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীন চিন্তা শক্তির স্ফুরণ এবং ভাবপ্রকাশ ও সৃষ্টিশক্তির প্রসার বৃদ্ধি হলে তবে তাকে পাঠদানের উপযুক্ত বলে মনে করে পাঠদানের জন্য তৈরী করতে হবে। সৈলে যতই কেননা বেত দেখান আর চোখ রাঙ্গান অথবা ধমক দেন, কিছুই হবে না। এই গেল অসাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশুর কথা। এবার সাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশু সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করে এ প্রবন্ধের যবনিকা টানব। যারান্তরে যদি সুযোগ পাই তবে উল্লিখিত দুই প্রকারের পিছিয়ে পড়া শিশুদের পঠন ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

বিদ্যালয়ে প্রায়শঃই আমরা যে ধরণের ব্যাক্‌-ওয়ার্ড শিশুদের সাথে পরিচিত হই তারা বেশীর ভাগই সাধারণ পিছিয়ে-পড়া শিশুর পর্যায়ে পড়ে। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি কোন পিছিয়ে-পড়া শিশুর পিছনে একটি প্রচেষ্টা নিয়ে তাকে রিবিা মনের মত করে তুলতে পেরেছি। এদের মধ্যেই আবার কচিৎ দু'একটি যে অসাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশু না থাকে তা নয়। সাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশুকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) অমনোযোগী। অর্থাৎ কোন কিছুর দিকে মন ও চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারে না। কাজে তখনও মন নিষ্ক্রিয় থাকায় কোন উপকার লাভ হয় না। এইভাবে অধিক দিন অমনোযোগী হয়ে থাকলে পাঠে স্পৃহা থাকে না। এই দোষ ব্যক্তিগত অনুশীলনের দ্বারা অতি সহজেই দূর করা যায়। (২) যাদের ঠিক ঠিক বর্ণ পরিচয় ঘটেনি। সঠিক শব্দ বা বর্ণ পরিচয় না ঘটা পর্যন্ত যে সব শিশুকে পাঠদান করা হয় তারা ক্রমে শব্দবিভীষিকা দেখতে থাকে। ফলে পাঠ শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অবসাদ আসে এবং অহেতুক আশংকায় তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। (৩) পড়ার সময় যাদের অনেক কথা বাদ পড়ে যায় এবং চিবিয়ে চিবিয়ে পড়ে। এই দোষ ক্রমশঃই মজ্জাগত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক পঠনস্পৃহা ব্যাহত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকমহোদয়ের শিশুর মনোরাজ্যে প্রবেশ করার মনোবৃত্তি একান্তই অপরিহার্য। কারণ উল্লিখিত তিন প্রকারের সাধারণ পিছিয়েপড়া শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হ'লে শিক্ষকই হবেন তার প্রথম এবং প্রধান সহায়। ঐরূপ ক্ষেত্রে যাতে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধ্যাংক বজায় থাকে সেজন্য প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিশুর একান্ত দরদী বন্ধুরূপে প্রতিপন্ন হওয়া চাই। অপর পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্রে ধমক বা ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি নিতান্ত অনভিপ্রেত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উল্লিখিত তিন প্রকারের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ (১) অন্যমনস্কতা, (২) ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি, (৩) আত্মবিশ্বাসের অপ্রতুলতা, (৪) বোকার ভান, (৫) শব্দপরিচয়ের অভাব এবং (৬) কোন কিছু বিষয় গ্রহণে অক্ষমতা। এই ধরণের শিশুদের সঙ্গেই আমরা সাধারণতঃ পরিচিত হই এবং নিতান্তই আমাদের বোকবার দোষেই এই পর্যায়ের শিশুদের স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তির স্ফুরণ ঘটতে পারে না। সেই জন্য শিক্ষকবন্ধুদের নিকট অনুরোধ "সবেই" ব'লে কোন শিশুকে বিদায় করবার পূর্বে ভালভাবে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন। তাহলেই অহেতুক উৎকণ্ঠা থাকবে না, এবং পিছিয়েপড়া শিশুরা আর আমাদের কাছে সমস্যা বলে প্রতীয়মান হবে না।

ছাত্রদের প্রতি

(মহাত্মা গান্ধীর রচনা হইতে)

শ্রীহারাধন রক্ষিত

১

আমার আকাঙ্ক্ষা

আমি সর্বদাই ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করছি। তাঁরা আমাকে জানেন, আমিও তাঁদের জানি। তাঁরা আমার সহযোগিতা করেছেন। কলেজের অনেক প্রাক্তন-ছাত্র আমার শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী। তাঁরাই ভবিষ্যতের আশা। অসহযোগ আন্দোলনের শুভ মুহূর্তে স্কুল-কলেজ ছেড়ে আসার জন্যে তাঁদের ডাকা হয়েছিল। কিছু সংখ্যক অধ্যাপক ও ছাত্র কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের সংকল্প ছিল দৃঢ়। দেশকে তাঁরা অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নিজেরাও যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন।

গত দশ বছরে হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আমাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে তাঁদের অতি গোপন কথা আমাকে বলেছেন, তাই আমি তাঁদের অন্তরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছি। আমি তোমাদের সমস্ত অসুবিধা ও দুর্বলতার কথা জানি। কিন্তু জানিনা আমি সত্যি তোমাদের কোনো সহায়তা করতে পারব কি না। তবে বন্ধুভাবে তোমাদের উপদেশ দিতে পারি, তোমাদের দুঃখের ভাগ নিতে পারি এবং আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমাদের সহায়তা করতে পারি।

তোমরা ছাত্রসমাজ আমাকে একটা সম্মান দিতে চাও। কিন্তু আমি তার যোগ্য নই। আমি আর একটা সম্মানলাভের চেষ্টা করছি—আমি ছাত্রদের সেবক হতে চাই। শুধু ভারতের নয়, শুধু বঙ্গদেশের নয়—আমি সমগ্র পৃথিবীর নিখিল ছাত্র সমাজের সেবক হতে চাই, জানিনা এটা আমার দুরাকাঙ্ক্ষা কি না। পৃথিবীর এক নিভৃত কোণে কিছু ছাত্রের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে, ভগবানের ইচ্ছায় আর কটি বছর সময় পেলে সেই আকাঙ্ক্ষা আমি সার্থক করতে পারব।

২

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

আমার পর্যটনকালে ধর্মের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। এর উত্তরে অন্যত্র যা বলেছি এখানেও তা বলাই শ্রেয়ঃ মনে করি। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ ধর্মশক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। তা-ই সব চাইতে আশু প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমি জানি, এই প্রচলিত উত্তরে কেউ খুসি হবেন না। অথচ এটাই সর্বকালের সত্য কথা। তাই আমি বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে একটা ধর্মশক্তি নিহিত থাকায় আমরা সর্বদাই ভীত থাকি, পার্থিব ও অপার্থিব প্রভাবকে ভয় করি। পুরোহিত ও পণ্ডিতদের সামনে আমাদের মনের কথা বলতে সাহস পাই না; পার্থিব শক্তির কাছে আমরা ভয় খেয়ে যাই। এতে নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের এবং তাঁদের ক্ষতি করে থাকি। সম্ভবতঃ ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু কেউই চান না যে আমরা তাঁদের কাছে সত্য গোপন করি। লর্ড উইলিংডন বোম্বাইয়ের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি দেখেছেন—আমরা 'না' বলতে গিয়েও ইতস্ততঃ করি। তিনি শ্রোতাদের অন্তর-শক্তির অনুশীলন করার উপদেশ দিয়েছেন। অবশ্য, অন্যের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা না দেখানোই

নির্ভীকতা নয়। আমার মনে হয়, শাঁটি ও স্থায়ী কিছু পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নির্ভীকতা। ধর্মচেতনা ছাড়া এই শক্তি লাভ করা যায় না। ঈশ্বরকে ভয় করলেই আমরা আর মানুষকে ভয় করব না। আমাদের মধ্যে ঈশ্বর আছেন—আমরা যা ভাবি ও করি তা তিনি জানেন—তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা—তিনি আমাদের সত্যপথ প্রদর্শন করেন—এই সত্যকে যদি আমরা একান্ত করে বুঝি তবে ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে ভয় করার থাকবে না। রাজার যিনি রাজা তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকলে আর কারো প্রতি আনুগত্যের দরকার হয় না। তাই হল আর সমস্ত আনুগত্যের ভিত্তিভূমি।

গভীর দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে ছাত্ররা ক্রমেই ধর্মবিশ্বাস হারাতে বসেছেন। কোনো হিন্দুছেলেকে রামনামের শরণ নেবার উপদেশ দিলে তিনি অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন এবং সবিস্ময়ে ভাবেন—রাম কে! কোনো মুসলমান ছেলেকে কোরাণ পড়তে বা আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বললে তিনি কোরাণ পড়তে অক্ষমতা প্রকাশ করেন; আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে মুখের কথা মাত্র! কি করে আমি এই সব ছেলেদের বোঝাই যে শুদ্ধ মনই প্রকৃত শিক্ষার প্রথম ধাপ! যে শিক্ষায় ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস আসে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে, কি করেই বা তোমরা জগতের উপকার করবে! সেবার মধ্যেই আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই। ঈশ্বর স্বর্গে বা পাতালে থাকেন না—হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পঞ্চম বর্ণ, মুসলমান, পার্সী, খ্রীষ্টান, স্ত্রী-পুরুষ - সকলের মধ্যেই তিনি আছেন।

শুধু বই পড়ে পরবর্তী জীবনে তোমরা খুব সামান্যই উপকার পাবে। ভারতবর্ষের সমগ্র ছাত্রসমাজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। রাশি রাশি বই পড়ে প্রচুর তথ্যের দ্বারা মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে কী সর্বনাশই না তাঁদের হয়েছে। কিছু লোক হয়েছেন অস্থিরচিত্ত, কেউ হয়েছেন বিকৃতমস্তিষ্ক, আর কিছু লোক দারুণ অপব্যয়ী জীবন যাপন করেছেন। তাঁরা নাকি প্রাণপণ চেষ্টা করেও যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছেন—কারণ তাঁরা সত্যতামসকে জয় করতে পারেন নি। এই কথা শুনে তাঁদের প্রতি আমার বড়ো করুণা হয়। সত্যতামের কবল থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়—তা তাঁরা জানতে চান। তাঁরা আরো জানতে চান যে, কি করে তাঁরা অসাধুতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। রামনাম করতে এবং নতজানু হয়ে ঈশ্বরের শরণ নিতে বললে তাঁরা বলেন,—"ঈশ্বর কোথায় জানি না। জানি না উপাসনাতে লাভ কি।" এই তাঁদের অবস্থা। তাই ছাত্রদের সাবধান হতে বলছি—যা হাতে পান তাই যেন তাঁরা না পড়েন। আর শিক্ষকদের বলছি—হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করে তাঁরা যেন ছাত্রদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আমি একান্তভাবে অনুভব করি যে বিদ্যালয়ের বাইরেই শিক্ষকদের কাজ বেশি। দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষকেরা জীবিকার জন্যে কাজ করেন। বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্রদের জন্যে কোনো সময় তাঁরা দিতে পারেন না। ছাত্রদের উন্নতির পথে এটাই দারুণ অন্তরায়। শিক্ষকেরা যদি সর্বদা ছাত্রদের কাজে নিযুক্ত না থাকেন তবে তেমন কিছু হবে না। সুতরাং শিক্ষকদের মস্তিষ্ক চালনার চাইতে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন অধিকতর প্রয়োজন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষেরা সর্বদাই ছিলেন একা। জরথুস্ত্র, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ সকলেই ছিলেন একা। এইরূপ আরো অনেকের নাম করা যায়। তাঁদের আত্মবিশ্বাস ছিল গভীর, ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল অটুট। তাঁদের সকল কাজেই সর্বদা ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে আছেন—এই বিশ্বাস থাকায় কখনো তাঁরা নিজেদের একাকী বোধ করেন নি। তোমরা মানুষকের কথা স্মরণ করতে পার। হজরত

মহম্মদের পলায়নে তিনি তাঁর অনুগামী ছিলেন। অসংখ্য শত্রু তাঁদের অনুসরণ করছে দেখে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বলেছিলেন,—"দেখুন, শত্রুরা সংখ্যায় কত! আমরা দুজনে এই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে কী করে পারব?" মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেই মহম্মদ তিরস্কার করে তাঁকে বলেছিলেন,—"না আবুবকর, আমরা তিনজন, আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন।" বিভীষণ ও প্রহ্লাদের অটল বিশ্বাসের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যায়। তোমাদেরও সেরূপ গভীর আত্মবিশ্বাস, অটুট ভগবদ্বিশ্বাস থাকা চাই।

ধর্ম ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। কেউ কেউ তাঁদের যুক্তির অহঙ্কারে বলে থাকেন যে তাঁদের ধর্মের কোনো দরকার নেই। কিন্তু এ বলা কেবল, না যেন একটি লোক নিঃশ্বাস নিতে নিতেও বলছে তার নাক নেই। যুক্তি বা প্রবৃত্তি বা সংস্কার —যে জন্যই হোক, মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকেন। গোঁড়া অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিকও নীতিকে স্বীকার করে, আর নীতিপরায়ণ হওয়া ভালো, না হওয়া খারাপ স্বীকার করে। ব্র্যাডলের নাস্তিকবাদ বিখ্যাত। তিনিও তাঁর অত্যন্ত গোপন ত্রুটিগুলি প্রকাশ করেছেন। সত্য-কথা বলে তিনি প্রচুর দুঃখ ভোগ করেছেন। তবু তাঁর আনন্দ হয়েছে; তিনি বলেছেন—সত্যই এর পুরস্কার। সত্যনিষ্ঠার যে আনন্দ তা তিনি বুঝতেন না তা নয়। এতে ঐহিক সুখ নেই, কিন্তু এতে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হয়ে থাকে। তাই আমি বলছি যে, যার কোনো ধর্ম নেই সেও ধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না এবং বাঁচেও না।

ঈশ্বরকে জীবন থেকে সর্বতোভাবে বাদ দেওয়াই আজকাল একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং মানুষ মনে করে যে ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ব্যতিরেকেও জীবনকে চরিতার্থ করে তোলা যায়। যাঁরা তাঁদের চাইতে অনন্তগুণ শক্তিমানকে বিশ্বাস করেন না এবং তাঁর কোনো দরকারও বোধ করেন না, তাঁদের কাছে নীতির তাৎপর্য প্রচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। নীর অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই বুঝি যে যে-নীতির উপরে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে তাতে বিশ্বাস ছাড়া জীবনের পূর্ণতা সম্ভব নয়। সমুদ্র থেকে এক কোটা জল তুলে ফেললে তা যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি নীতিজ্ঞানহীন মানুষও ধ্বংস হয়ে যায়। সমুদ্রের প্রতি জলবিন্দুর তরঙ্গ আছে এবং তা আমাদের জীবনীশক্তি দেবার ক্ষমতা রাখে।

• • •

নীতি, নীতিশাস্ত্র এবং ধর্ম আমার কাছে একই জিনিস। ধর্মবিহীন নৈতিক জীবন যেন বালুচরে বাঁধা ঘর। নীতিবিহীন ধর্মও কাঁসরের শব্দের মতো শুধু হট্টগোল সৃষ্টি করে মানুষের মাথা বিগড়ে দেয়। সত্য, অহিংসা ও সংযম এই তিনটে মিলে হয় নীতি। যে কোনো ধর্মেরই অনুশীলন মানুষ করুক না কেন, তা এই তিনটের উপর নির্ভরশীল এবং এই তিন মূলনীতি থেকেই তার উৎপত্তি। আবার অহিংসা এবং সংযমের উৎপত্তিস্থল সত্য। সত্যই আমার ঈশ্বর।

• • •

যদি 'আত্মিক শক্তি' ছাত্রদের কাছে নিরর্থক হয় তবে বোঝা যায় কী দুর্দশা আমাদের হয়েছে। এটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক যে আত্মার সম্পদ ও নিত্য সত্যকে আমাদের যুবকেরা কাল্পনিক মনে করেন, আর অলীক ফিকিরকে তাঁরা মনে করেন বাস্তব।

শুধু সংখ্যা যে কিছুই নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা প্রতিদিন পাই। ত্রিশ কোটি ভারতবাসী আজ এক লক্ষেরও কম ইংরাজের অধীন—এর চাইতে বড়ো প্রমাণ আর কি? একটি সিংহকে দেখেই হাজার হাজার ভেড়া দৌড়ে পালায়। কারণ অতি স্পষ্ট। ভেড়ারা তাদের দুর্বলতার কথা জানে; আর সিংহ তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। সিংহের শক্তি সচেতনতাই অসংখ্য ভেড়ার শক্তিকে পরাভূত করে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে 'আত্মিক শক্তি' বা 'ঐশী শক্তি' অলীক কল্পনা মাত্র নয়।

(ক্রমশঃ)

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : আষাঢ়, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ১১৩

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থতার হেতু ১১৪
শ্রীশীষদেন্দু সান্যাল

শিক্ষার মাধ্যম ১১৭
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ইন্‌স্টিটিউট অফ এডুকেশন
শ্রী বিদ্যার্থী ১১৯

আদর্শ গ্রাম ১২৩
শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

ছাত্রদের প্রতি ১২৭
শ্রীহারাধন রক্ষিত

পুস্তিকা-সমালোচনা ১২৮
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা। অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণরূপং কিঞ্চিদ্ বুধ্যন্তিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৬৬ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

আসন্ন তৃতীয় পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রথম ও দ্বিতীয়, কার্যে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা এখন করা হইতেছে। ফলে কি হইবে তাহা জানিতে পারা না গেলেও শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে ইহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। সম্প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইয়া গেল তাহা হইতেও কি আশা করিবার কিছু নাই? অবশ্যই আছে। শিক্ষা তো আর শুধু বই পড়া বা শাস্ত্রজ্ঞানের সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—মানুষের বাঁচিবার শিক্ষা, পরিবেশ হইতে পুষ্টিসংগ্রহের শিক্ষা, জীবনযুদ্ধে প্রতিকূল ঘটনাকে অনুকূল করিবার শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে মঙ্গল লাভ করিবার শিক্ষা। গত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে শব্দগত কথার অর্থ ছাপাইয়াও শিক্ষার ভাবের অর্থ অগ্রসর হইতেছে।

শিক্ষাব্রতীর স্মরণে

৺কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ২২।২৩ বৎসর বয়সে শিক্ষকতা সুরু করেন ও অনুমান ১৯০৯ সালে উত্তর কলিকাতার বেহুয়ার কাছে মডেল পাঠশালা নামে এক আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৯ সনের জুন মাসে মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর একাদিক্রমে এই স্কুলের শিক্ষকতা ও পরে নানাভাবে ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। অন্য নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি এই বিদ্যালয়ের কাজকে জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ছাত্রদের চিত্ত তিনি এমনভাবে জয় করিয়াছিলেন যে প্রাপ্তবয়স্ক, সম্প্রতি কৃতবিদ্য, বহু ছাত্র তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার দেবচরিত্র, সদাহাস্যময় মিষ্ট স্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়া শিক্ষাগুরুর গুণকীর্তন ও নিজেদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এইরূপ একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের জন্যই আজও শিক্ষকতা বৃত্তির প্রতি সমাজের লোকের শ্রদ্ধা জাগিয়া আছে। ইঁহারা অরণ্য-কুসুমের মত আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া শুকাইয়া যান। কিন্তু যে পথিক একবার ইহাদের সুবাস পায় সে আর ভোলে না। শিক্ষকদের অমরতা

তো ছাত্রদের মনে আর জীবনে। ৺ভট্টাচার্য মহাশয় শিক্ষায় নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য শিক্ষার অন্যতম লেখক। আমরা শিক্ষার এই সংখ্যায় ইঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি ও তাঁহার পুত্রকন্যা ও পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাইতেছি।

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা

শিক্ষা লাভ করিতে কাহাকেও বেতন দিতে হইবে না, এবং সকলেরই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে—আলো বাতাস জলের মত শিক্ষাতেও থাকিবে সকলের জন্মগত অধিকার, এমনই একটা কথা আমরা বহুদিন শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু গোখলের সময় হইতেই বাধা চলিয়া আসিতেছে যে ইহা কাজের কথা নয়, যে টাকা লাগিবে তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। গোখলেও ভাবিয়াছিলেন, বড় জোর শহরাঞ্চলে সকলকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যায় কি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির নিকট এরূপ নাকি পরিকল্পনা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবং কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি তাহা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশন এরূপ কোনও পরিকল্পনা প্রণয়নের ধার দিয়াও যান নাই কেন? লোকে বলে, ভয়ানক খরচ হইবে বলিয়া। খরচ তো হইবেই, কিন্তু ন্যায্য খরচ হইতে পিছাইয়া আসিলে চলিবে কেন? আমরা ছেলেবেলায় একজন পণ্ডিত ব্যক্তির কথা শুনিয়াছিলাম, যিনি নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সজ্জনেরা বাড়িতে আসিলে কি করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইবে তাহার ভাবনায় অস্থির হইয়া তক্তাপোষের নীচে গিয়া আশ্রয় লাভ করিতেন! এইরূপ বহু পণ্ডিত নিশ্চয় পৌরসভা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। স্বাধীনতা লাভের পর বারো বৎসর—কিন্তু দাঁড়ীরা দাঁড় টানিলেও নৌকার নোঙ্গর তোলা হয় নাই। ঘড়িঘড়া সব ঠিকই তীরের সঙ্গে বাঁধা আছে। তাই গতিই হয় নাই, তাহার উপর আবার প্রগতি!

তথাপি আশা করিব, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে কিছু চেষ্টা, কিছু দ্রুততর বেগে চলার প্রবৃত্তি এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যেও দেখিব।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থতার হেতু

শ্রীমীরবেন্দু সান্যাল

আজ কাল বনস্পতি তৈলে পোলাও রান্না হইতেছে। রান্না করা বস্তুটি পোলাও শব্দবাচ্য কি না জানি না—কিন্তু ঘৃতান্ন বা ঘি-ভাত শব্দবাচ্য নহে। কারণ উহার সহিত ঘৃতের সম্পর্ক নাই।

বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়া পাকা ইমারত তৈয়ারি করা যায় না। কারণ বাঁশ, খড়, মাটি প্রভৃতি বস্তু ইট, কাঠ, চুণ, সুরকী প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র।

নাচ শিখিতে হইলে দাঁড়াইবার এবং চলাফেরা করার শক্তি থাকা চাই। শুইয়া শুইয়া নাচ শেখা যায় না। ছবি আঁকা শিখিতে হইলে স্থির, ধীর হইয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারা চাই। নাচিতে নাচিতে ছবি আঁকা শেখা যায় না।

সকল কাজের জন্যই চাই প্রাক্-প্রস্তুতি: অধিকারি-বিচার ও উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা।

শিক্ষা ব্যাপারে প্রাক্-প্রস্তুতি শিক্ষক ও ছাত্রের মনে শান্ত, দান্ত ও সমাহিত অবস্থা, ছাত্রের জ্ঞানলিপ্সা ও শিক্ষকের ছাত্রের মধ্যে আত্ম-সংক্রামণ

বা সর্বজন লাভের আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষকের বাৎসল্য এবং ছাত্রের শ্রদ্ধাভক্তি। শিক্ষকের শিক্ষাদানের এবং ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণের যথোচিত যোগ্যতা আছে কি না তাহা নির্ণয় করাই অধিকারিবিচার। শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম বলিতে শুধু বই, খাতা, পেন্সিল, চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, বীক্ষণাগারের যন্ত্রপাতি, রেকর্ড কার্ড প্রভৃতিই বুঝায় না। শিক্ষার অনুকূল নৈতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক পরিবেশ ও শৃঙ্খলাজ্ঞান (discipline) উক্ত সাজসরঞ্জাম সমূহ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এই পরিবেশ না থাকিলে এই সাজসরঞ্জামগুলির দ্বারা যথোচিত কাজ হয় না।

এখন বিচার করিতে হইবে, আমরা যে শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া তুলিতে চাই তাহার উপযোগী মানসলা আমাদের আছে কি না। যদি না থাকে, শিক্ষাসৌধ গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ হইতেছেও না।

প্রাচীনকালে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের প্রাক্-প্রস্তুতি কিরূপ ছিল তাহার কিছু আভাস উপনিষদের শান্তিপাঠে পাওয়া যায়। উহা এইরূপ :—

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।

আচার্য ও শিষ্য একযোগে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"ভগবান্ আমাদের দুইজনকে একসঙ্গে রক্ষা করুন এবং পালন করুন। আমরা যেন এই কার্যে একযোগে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজঃসমন্বিত হউক। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন না হই।"

এই শান্তিপাঠে উভয়ের যে আন্তরিকতা, ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা ও প্রীতির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে, তাহা বর্তমান যুগে দুর্লভ। এ যুগে শিক্ষকগণ "ভারতীং বানরীং কৃত্বা বর্ততন্তি গৃহে গৃহে।" বিদ্যাবাণিজ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা বিদ্বেষহীনতার আশা করা যায় না।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি শিষ্যকে আচার্যদেব হইতে অর্থাৎ গুরুকে দেবতার মত শ্রদ্ধাভক্তি করিতে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমরা—ইদানীন্তন আচার্যেরা-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করার মত জীবন গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। অতএব ছাত্রদের পক্ষে আচার্যদেব হওয়া শক্ত। অতএব

যত্রে তীর্থে শিবে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

—এই বচনের অর্থ সর্বত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

অতএব শিক্ষাসৌধের প্রধান স্তম্ভ আচার্য বাদ গেলেন।

তার পর ছাত্র। ছাত্রবাচক শব্দ অনেকগুলি, ব্রহ্মচারী, বিদ্যার্থী, অন্তেবাসী প্রভৃতি। শব্দার্থ বিচার করিলে এই শব্দগুলির কোনটিই আমাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এখনকার যৌনআবেদনমূলক চলচ্চিত্রের যুগে ব্রহ্মচারী শব্দ লইয়া আলোচনা না করাই ভাল। বিদ্যার্থী খুব কমই আছে। অধিকাংশ ছাত্রই যতখানি সম্ভব কম শিখিয়া যায়, অন্যায় যে কোন উপায়ে পাশ করিতে চায়। এখন গুরুগৃহও নাই, অন্তেবাসীও নাই। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণকে অন্তেবাসী বলিলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থের অপলাপ করা হয়। ছাদ্যতি দোষান্ গুরোরিতি ছাত্রঃ। এখনকার ছাত্রেরা গুরুর দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করে না। গুরুর দোষ ধরিতে পারিলে তাহারা আনন্দিত হয় এবং ইটপোষ্টিতে তাহার আলোচনা করিয়া অবসর বিনোদন করে। এ দোষের সবটুকু ছাত্রদের নহে। গুরুর আচরণও এজন্য কিছু পরিমাণে দায়ী।

অতএব অধিকারিবিচারে প্রকৃত ছাত্রও খুব কম পাওয়া যাবে।

সুকেশাপ্রমুখ ছয় জন ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে এই ঋষিগণকে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া এক বৎসর কাল তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে বলিয়াছিলেন। এইভাবে সে যুগে অধিকারিবিচার হইত। এখন অধিকারিবিচারের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। উপযুক্ত মার্কসীট ও প্রবেশভত্বাদি দিতে পারিলেই অতি দুর্বিনীত ছাত্রকেও বিদ্যায়তনে ভর্তি করা হয়। এই ভাবে বহু অনধিকারীর অনুপ্রবেশের ফল নানারূপ শৃঙ্খলাভঙ্গ, ধর্মঘট প্রভৃতি।

আজকাল বিদ্যায়তনগুলিতে ছাত্রসংখ্যার বহর খুব বেশি। যেন বিরাট্ ভোজের আয়োজন। কিন্তু আয়োজনকর্তাদের মনে নাই যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই উদরাময়গ্রস্ত। এগুলিরও প্রয়োজন আছে—যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু চাষের জমি না থাকিলে বা উপযুক্ত বারিপাত না হইলে যেমন মূল্যবান্ সার, বীজ প্রভৃতি কোন কাজে লাগে না—সেই ভাবেই শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহীতার যথোচিত আন্তরিকতার অভাবে এইগুলি হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না।

শিক্ষার অনুকূল নৈতিক, বৌদ্ধিক বা সামাজিক পরিবেশ নাই। শৃঙ্খলাজ্ঞান নাই, শৃঙ্খলাভঙ্গের আলস্য ও উৎসাহ অপরিসীম। বর্তমান আবহাওয়ায় নৈতিক নির্দেশ মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা আন্তরিক ভাবে স্বীকৃত হয় না। বৌদ্ধিক বিচারের দ্বারা তায়, অন্যায় স্থির করার কষ্ট কেহ স্বীকার করে না—হুজুগের দ্বারা চালিত হয়। সামাজিক পরিবেশও অনুকূল নহে। শিক্ষকের মর্যাদা নাই, কারণ তিনি দরিদ্র। বিদ্যা যদি প্রচুর ধনাগমের হেতু না হয়, তাহা হইলে তাহারও কোন সম্মান নাই। অবৈধ উপায়ে বিত্তশালী মূর্খ বা অল্পবিদ্য ব্যক্তি, দরিদ্র বিদ্বান্ অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। এরূপ পরিস্থিতিতে বিদ্যার্জনের প্রেরণা আসিবে কিরূপে?

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ যতই সুচিন্তিত পরিকল্পনা করুন না কেন, গোড়ার গলদগুলি দূর না হইলে ঐ সকল পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইবে না। শিক্ষা-ব্যাপারে যথোচিত বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষকোচিত আচরণ-সম্পন্ন শিক্ষক এবং শান্ত, দান্ত, বিনীত, জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী—এই দুইটিই প্রধান বস্তু। এই দুইটির মিলন ঘটিলে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষাদান কার্য ভালভাবেই চলিবে। আর এই দুইটির বা দুইএর একটির অভাব ঘটিলে সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে। স্কুলের একটি শ্রেণী কলেজের অন্তর্ভুক্ত করা বা কলেজের একটি শ্রেণী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে সমস্যার সমাধান নাই। প্রকৃত শিক্ষক ও প্রকৃত বিদ্যার্থী সৃষ্টি করার কোন উপায় যদি উদ্ভাবিত হয় তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

অপ্রিয় বাস্তব সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার আশ্রয়ে কল্পিত স্বর্গে বাস করা বিজ্ঞোচিত নহে। টাইট্যানিক জাহাজ ডুবিতেছে শুনিয়াও যাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহারা ডুবিই করিয়াছিলেন।

শিক্ষার মাধ্যম

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আধুনিক গান শুনিতেছিলাম, 'কথা বলা হোলো না, ভাব ভাষা পেল না।' কথার দ্বারাই প্রধানত আমরা শিক্ষা পাই ও দিই। শিক্ষা তো একতরফা ব্যাপার নয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই ব্যাপার। 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে।' বোঝাপড়া করিতে হইবে, আজকাল অবশ্য কম কথা বলিয়া শিখাইবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা আছে। ছবি দেখাইয়া চোখের সামনে বস্তু ধরিয়া দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী আজ আর দেশে বিরল নয়। আমাদের দেশে কথা না বলিয়াও শুধু ভাবনা দ্বারা যে উচ্চস্তরের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার স্বীকৃতি সর্বযুগে আছে। হিমালয়ের গুহাতে বসিয়াও চিন্তার দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করা যায়, মহাপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন, বিনোবাজী এখনকার যন্ত্রযুগেও সে কথা পুনরায় আমাদিগকে শোনাইতেছেন।

তথাপি কথা না ভাষাই তো শিক্ষার প্রধান বাহন। কিন্তু সে কোন ভাষা? মাতৃভাষা, না ইংরাজি ভাষা, না রাষ্ট্রভাষা? বড় কঠিন সমস্যা, বিশেষ করিয়া আজকার দিনে। অনেক লোকের মনে বিশ্বাস, ইংরাজি ভাষা না শিখিলে জগতে বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকিতে পারা যাইবে না। এমন কি, ইংরাজি যে জানে, সেই শিক্ষিত। অন্য সকলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং ইংরাজি শিখিতেই হইবে, এবং ইংরাজিকে মাধ্যম করিলে আর কোথাও বিপদ থাকিবে না।

এই কথা বড় বড় পণ্ডিতেরাও বলিতেছেন। তাই আমাদের বিপদ। তাই দেখি, সকলে বলে প্রথম হইতে ইংরাজি শিখাও, না হইলে কাঁচা থাকিয়া যাইবে। কলিকাতা শহরে ইংরাজি ইস্কুলে পড়াও, তাহা হইলে আর কিছু দেখিতে শুনিতে হইবে না। অবশ্য ইংরাজি ইস্কুলে পড়ানোর ধরন ধারণ যতখানি সম্ভব আমাদের ভালো ভালো বাংলা বা হিন্দী ইস্কুলও গ্রহণ করিতেছেন, শুধু তাদের জন্য নয়, অন্য কারণেও বটে। সে সব বিষয়ে প্রবেশ না করিয়া উল্লেখ করি। এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন এবং সত্যসত্যই মনে করেন যে বাংলার চেয়ে ইংরাজি আমাদের ছেলেমেয়েরা বেশি সহজে আয়ত্ত করিতে পারে! আমি অবশ্য নিজে একথা বিশ্বাস করি না।

কিন্তু আমার সহানুভূতি তাঁহাদের সঙ্গে খানিকটা আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের বক্তব্য খানিকটা বুঝিতে পারি, যাঁহারা ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে চায়। আমার এক বন্ধু বহুদিন পূর্বে তাবনগরে অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় ভালো কাজ পাইলে তাহা ছাড়িয়াই কলিকাতায় আসিলেন, ছেলেরা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া। সিহার হইতেও অধ্যাপনা ছাড়িয়া বাংলা-দেশে আসিতে দেখিয়াছি ঐ একই কারণে। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যম নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। মাতৃভাষার শিক্ষালাভ অনেকেই শিক্ষাবিজ্ঞানের অতি আধুনিক পুস্তক না পড়িয়াও পছন্দ করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মাতৃ-ভাষাই তো শিক্ষার প্রকৃত বাহন। 'বিদেশে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?' সহজবুদ্ধিকে দৃঢ় করিবার জন্য শুধু নয়, আশাপূরণও তো একটা দিক।

আমির হোসেন কমিটি বুনিয়াদি শিক্ষার স্তর শেষ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বুনিয়াদি শিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে, এবং বুনিয়াদি শিক্ষার সত্যসত্যই সাধারণ হইতে

হইলে পুরা সময়টাই ৬ + হইতে ১৪ + অর্থাৎ আট বৎসরই দিতে হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টা সমিতি পরীক্ষামূলক ভাবে ইহাকে গ্রহণ করিবার সময় প্রথম পাঁচ বৎসর ও পরের তিন বৎসর, এই দুইভাগে ভাগ করিলেন, ইহার ব্যাপক প্রয়োগ রহিল না। প্রথম পাঁচ বৎসরের মাধ্যম মাতৃভাষায় হউক, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা ও মাতৃভাষায় যেখানে প্রভেদ আছে, সেখানে কি করা হইবে? বাংলাদেশে বাংলা সকলের মাতৃভাষা নয়, বিহারে হিন্দী সকলের মাতৃভাষা নয়, সেখানে তাঁহারা এই নির্দেশ দিলেন—

"নিম্ন বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার বাহন অবশ্যই শিশুর মাতৃভাষা, তবে যেখানে মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা হইতে পৃথক, সেখানে বিদ্যালয়ে যাহাদের মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা হইতে পৃথক, অন্তত এরূপ চল্লিশজন ছাত্র পাওয়া গেলে তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যেখানে আঞ্চলিক ভাষা তৃতীয় শ্রেণীর পূর্বে নয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর পরে নয়, অর্থাৎ তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে শিখিতে হইবে। উচ্চ বুনিয়াদি স্তরেও প্রথম দুই বৎসর ছাত্রদের ইচ্ছামত তাহারা মাতৃভাষায় প্রশ্নাদির উত্তর করিতে পারিবে।"

কিন্তু বড় বড় শহরে যেখানে নানা প্রদেশের অর্থাৎ নানা ভাষার লোক একত্র বসবাস করে সেখানে তো সরাসরি কোনও ব্যবস্থা করা সহজ নয়। উড সাহেবের ডেসপ্যাচে কিন্তু ইংরাজী ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবে নাই, ভাবিয়াছিল ভারতীয় ভাষার মধ্যে সেই শিক্ষা বিতরণ করিবার কথা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া কিন্তু এখনও আলোচনা হইতেছে। বহুদিন পূর্বে একজন চিন্তাশীল লেখক একটি নাম্রে অভিজ্ঞ, অথচ ইংরাজিতে তেমন নয়, এরূপ একটি ছাত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ছাত্র ফরাসী ও তুর্কি ভাষা ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ পড়িয়াও ভাল ভাবে পাশ করিতে পারে নাই, কারণ গ্রন্থের ভাষা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই বিশেষ করিয়া পানিপথে বাবরের military deposition-এর কথাটার অর্থ!

কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, আজকাল স্কুল ও কলেজে মাধ্যম হইতেছে মাতৃভাষা—ইংরাজি তাহার স্থান হারাইয়াছে। আমরা যতই রাগ করি দুঃখ করি যে আজকাল আর ইংরাজির কোনও মান নাই, প্রতিষ্ঠাও নাই, শিক্ষার মানও নাই, তথাপি এই প্রবৃত্তি যে বাংলাতে বা হিন্দীতে ভাল করিয়া বুঝিব, এই প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া বড় সহজ, এখন কি সম্ভব নহে। আর যদি মনে করি যে মাতৃভাষায় বড় বড় তত্ত্ব বুঝানো, কি জটিল তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়, তবে তাহাতে মাতৃভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতাই সূচিত করে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তো বহুপূর্বে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, জাপানীরা মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে অগ্রসর, আর আমরা বাঙালীরা ততটা সাহস পাই না, চেষ্টাও নাই—এবিষয়ে তিনি প্রাচীন শ্লোকের উল্লেখ করিয়াও বলিয়াছেন—উদ্যোগিনং পুরুষ-সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ, আর শুধু লক্ষ্মী নয়, সরস্বতীও বটে। তাহার পর বহুদিন গত হইয়াছে, অনেক শুধু কমিশন বসিয়াছে, বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষাও আর বসিয়া নাই। অনুবাদ, গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনের উন্নতি—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মাতৃভাষাকে তাহার প্রাপ্য আসন হইতে বঞ্চিত করা আর সঙ্গত নয়। তাহাতে একমাত্র ইহাই ফল হইবে যে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িব, জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস হইবে। ইহা নিতান্ত জ্বরোগের কথা নয়, ইহার পিছনে যে যুক্তিটুকু আছে, আশা করি পাঠক তাহা প্রণিধান করিবেন। ইংরাজি শেখা নিশ্চয় ভালো, কিন্তু তাহা মাতৃভাষার পরিবর্তে হইতে পারে না।

ইন্‌স্‌টিটিউট অফ এডুকেশন

শ্রী বিভাষী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইন্‌সটিটিউট অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি জগৎজোড়া। নিউ ইয়র্ক শহরের 1 East 67th Street ঠিকানায় ইহার নিজস্ব বিরাট বাড়ি আছে। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯১৯ সালে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিস্তারক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিদেশী বিভিন্ন জাতির ছাত্রগণকে আমেরিকায় পড়িতে সাহায্য করিবার বিষয়ে, ইহার দান অসীম। প্রত্যেক বৎসর ইহার সাহায্যে বহু ছাত্র এবং শিক্ষক বিনিময় হয়। বিদেশী বা আমেরিকান ছাত্র ও বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করিবার জন্ত এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন তহবিল নাই।

প্রতিষ্ঠানটির একটি ট্রাস্টি বোর্ড আছে। ১৯৫২ সালে এই বোর্ডের ৩৫ জন সভ্য ছিলেন। প্রেসিডেন্টের নাম Kenneth Holland। যুক্তরাষ্ট্রে সাতটি ও ইউরোপে প্যারিস শহরে একটি, মোট আটটি নিজস্ব অফিস আছে। Midwest, Rocky Mountain, West Coast, Southwest এবং Los Angels এই পাঁচটি প্রদেশের পরামর্শদাতা কমিটি আছে।

এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় বিশেষ কিছু নাই সম্পূর্ণ গভর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ, ব্যক্তিগত সাহায্য ও আংশিক গভর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ, ব্যক্তিগত সাহায্য ও গভর্ণমেণ্ট যাতায়াত সাহায্য (Fulbright Travel grant), যে সকল ব্যক্তিগত সাহায্য এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা তদন্ত করিয়া নির্দ্দেশাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাও গভর্ণমেণ্ট যাতায়াত সাহায্য, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্কলারশিপ, এবং UNESCO সাহায্য—বিদেশী ছাত্রদের জন্ত এই প্রকার আমেরিকান সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই বিতরণ করা হয়। মোট ২৮১৩ জন ছাত্র এই প্রকার সাহায্য ১৯৫২ সালে পাইয়াছিল। ঐ একই সালে ৮৬৩ জন আমেরিকান ছাত্র সম্পূর্ণ আমেরিকান স্কলারশিপ, ব্যক্তিগত সাহায্য ও গভর্ণমেণ্টের যাতায়াত সাহায্য, এবং শুধু ব্যক্তিগত স্কলারশিপ এই প্রতিষ্ঠান দ্বারাও পাইয়াছিল।

Humanities, Natural Sciences, Social Sciences, এবং Liberal Arts, এই চারটি বিভাগের যে কোন বিভাগে পড়িতে এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়া আন্তর্জাতিক ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময়ে উৎসাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ও গ্রাজুয়েট ছাত্র, বিদেশী বিশেষজ্ঞ, আমেরিকান ছাত্র এবং ছাত্র নন, এমন সকলেই আছেন। পশ্চিম গোলার্দ্ধে ২৩টি দেশের এবং পূর্ব গোলার্দ্ধে ইউরোপের ২২টি দেশের, আফ্রিকার ১৩টি দেশের, এশিয়ার নিকট-প্রাচ্যের ৮টি দেশের এবং অন্যান্য অংশের ১৭টি দেশের ছাত্রগণ সাহায্য পাইয়াছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের মোট সংখ্যা ৮৩।

প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে বার লক্ষ ডলার, ব্যয়ও তাহাই। এই আয়ব্যয় নিজস্ব কার্য পরিচালনার জন্ত। এই আয়ের মধ্যে দান করা টাকার সুদ থেকে (Foundations) দুই লক্ষ পাঁচ হাজার ডলার, কর্পোরেশন থেকে আট হাজার ডলার, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে কুড়ি হাজার ডলার, ব্যক্তিবিশেষ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সত্তর হাজার ডলার, আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ ডলার, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে চার লক্ষ দশ হাজার ডলার এবং বাকীটা অন্যান্য সূত্রে পাওয়া গিয়াছে।

পুয়েটোরিকো এবং হাওয়াই দ্বীপ এবং অন্যান্য

আটচল্লিশটি রাজ্যের ৪৯১টি উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে এমন সব বিদেশী ছাত্রগণ থাকিয়া পড়াশুনা করিত। এই সকল উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রতিষ্ঠান বিদেশী ছাত্রগণকে হয় বেতনসম্পর্কিত স্কলারশিপ, না হয় সম্পূর্ণ খরচ, না হয় অন্যান্য কোন না কোন সুবিধা দিয়া সাহায্য করে। আর ত্রিশটি দেশে আমেরিকান ছাত্র, শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞগণ থাকিয়া পড়াশুনা ও কাজকর্ম করিতেছেন। ১৯৫১-৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় তিন হাজার বিদেশী ছাত্রের পড়াশুনার তদারক করিতেছিল। আবার, এক বছর পরে (১৯৫২-৫৩) যে সকল বিদেশী ছাত্র বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হইবে, তাহাদের ভর্তির আয়োজন করিতেছিল (আমেরিকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে ভর্তির জন্য এক বছর আগেই চেষ্টা করিয়া ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে হয়)। উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়িয়া দিলেও চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান বিদেশী ছাত্রগণকে পড়াশুনার সুবিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের মারফত আর্থিক সাহায্য করিয়াছিল। আরও ষোলটি প্রতিষ্ঠান বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া কাজকর্ম করিতে অথবা ভ্রমণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, ও এশিয়ার তেইশটি প্রতিষ্ঠান এইভাবে আমেরিকান ছাত্রগণকে নিজেদের দেশে পড়িতে সাহায্য করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে সকল আমেরিকান ছাত্র বিদেশে গিয়া পড়াশুনা করে তাহাদের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্র হইতে আর্থিক সাহায্য পায়।

বিদেশী ছাত্রগণকে পড়াশুনা বিষয়ে সাহায্য করিতে গিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে অনেক বিভিন্ন কাজ করিতে হয়। তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি, ভাষা ভিন্ন। সুতরাং সমস্যাও জটিল, আর দুই একটি দেশ নয়, আশিটির উপর দেশ জড়িত! ছাত্রসংখ্যাও দুই একশ নয়, কয়েক হাজার। ইহার উপর আন্তর্জাতিক ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় পরিকল্পনাকে প্রত্যেক বৎসর রূপায়ন দিবার জন্য শুধু যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন ব্যক্তি এবং নানাবিধ সংস্থা জড়িত। যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহা আলোচনা করিলে ইহার কার্যের জটিলতা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

১। নির্বাচন :—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক কমিটি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে পড়িবার জন্য এই সকল কমিটির নিকট আবেদন করিতে হয়। প্রাথমিক নির্বাচন এই কমিটির দ্বারা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের সংস্থা (Private organisation) কতগুলি স্কলারশিপ দিবে তাহা এই প্রতিষ্ঠানকে জানায়। প্রতিষ্ঠানটি তখন ঠিক করে যে প্রত্যেক দেশ কয়টি স্কলারশিপ পাইবে। উপরে যে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের নিমিত্ত এক বা একাধিক কমিটির কথা বলা হইয়াছে, ইহা ছাড়াও সর্বনিম্নস্তরে নির্বাচনের জন্য ছোট ছোট কমিটি থাকে। যে সকল ছাত্র উচ্চতর বা উচ্চ পর্যায়ে পড়াশুনা করিতে চায়, তাহাদের নির্বাচন করিবার দায়িত্ব এই ছোট ছোট কমিটি লয়। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, প্রার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ, ভাষার পরীক্ষা, সার্টিফিকেটগুলি যথার্থ (genuine) কিনা, প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিষ্কার করিয়া দেখান, ইত্যাদি কাজ কমিটিগুলিকে নিয়মিতভাবে করিতে হয়। অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া যোগ্য প্রার্থী বাছাই করিতে হয়, উচ্চতম শিক্ষা না পাইলে প্রায়ই প্রার্থী যোগ্য হয় না, আবার শুধু যোগ্য হইলে চলিবে না, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া প্রার্থী নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে কিনা, সেখানে গিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে কিনা, শিক্ষা সমাপ্তে প্রার্থী স্বদেশে ফিরিবে কিনা, স্বাস্থ্য ভাল কিনা এবং স্বদেশে ফিরিয়া প্রার্থী দেশের

উন্নতির কাজে আসিবে কিনা, ইহাও প্রত্যেক কমিটিকে দেখিতে হয়। আবার অনেক কমিটি হাজার হাজার মাইল দূরে এই বিশাল পৃথিবীর দূরতম কোণে থাকে। তাহাদের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা করা সময়সাপেক্ষ।

নির্বাচন কিভাবে হয় লেবানন দেশের কমিটি তাহার অন্যতম উদাহরণ। এই কমিটির নাম Committee on Study and Training in the United States; ইহা বেইরুট শহরে অবস্থিত। একজন মৃতপূর্ব জজ ইহার চেয়ারম্যান। আটজন শিক্ষাবিদ, একজন সম্পাদক, এবং অন্য একজন ইহার সভ্য। উপরে লিখিত গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রার্থীর মান বিচার হয়। ইহার পর লেবানন দেশে যে কয়টি স্কলারশিপ দেওয়া হইবে সেই সংখ্যার কয়েকখানি বেশি আবেদন পত্র অনুমোদিত করিয়া নিরাপত্তার জন্য লেবানন গভর্ণমেণ্ট ও আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐ নামের তালিকা পাঠান হয়। দুই গভর্ণমেণ্ট মত রিলে ইন্‌স্টিটিউট অফ ইণ্টার-ন্যাশনাল এডুকেশন তখন শেষ বিচার করেন। অনেক দেশ হইতে হাজার হাজার আবেদন পত্র পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক প্রার্থীর সবনিম্ন যোগ্যতা থাকে। নির্বাচন দিয়া তখন এক সমস্যা দেখা দেয়, কমিটির উপর ভীষণ কাজের চাপ পড়ে। ভর্তির শেষ তারিখ যখন নিকটে, তখনও হয়ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাকে দেওয়া হয় নাই বা তাকে কোন কোনটা খোয়া গিয়াছে। ইহার উপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত শব্দাবলীর অর্থ অনেক দেশে অজ্ঞাত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বাধা বিঘ্ন অনেক কাটিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন দেশের কমিটি-গুলি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছে। তাহার ফলে বহু যোগ্যতম শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাবিদ প্রতি বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে যাইতেছেন।

২। কাজে নিয়োগ (Placement):—নির্বাচন কমিটির কাজ শেষ হইবার পর এই প্রতিষ্ঠানের কাজে নিয়োগ করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আবেদনপত্রগুলি বাছাই করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া দেন, পাঠাইবার আগে প্রত্যেক প্রার্থীর নিজস্ব প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করা হয়। ১৯৫২ সালে ৩৯০০ আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে ২৪০০ জনকে কাজ দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা কলেজ হইতে নানাবিধ আর্থিক সাহায্য পায় তাহারা সেখানে কাজ করে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু আর্থিক সাহায্য পাইলেই সব সময় ছাত্রকে পাঠান হয় না। ছাত্র যদি এমন এক দেশ বা সমাজ হইতে আসে যেখানকার ভাষা, কৃষ্টি, খৃষ্টিওলী যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সেখানে সব সময়ের জন্য বিদেশী ছাত্রদের একজন পরামর্শদাতা থাকেন। তখন তাঁহাকে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান হয়, কাজে নিয়োগ করিবার সুবিধা সুযোগের খবর জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হয়। আগে ভর্তি হইতে হয়, তারপর কাজে নিয়োগের প্রশ্ন আসে।

আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। কাজ পাইবার পর ছাত্র হয়ত অন্যত্র বদলীর জন্য অনুরোধ করিল। কলেজ হয়ত ছাত্রটির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট বা ছাত্র হয়ত কলেজটির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইল, শিক্ষার সাথে সমান তালে পা রাখিয়া চলিতে হয়ত ছাত্র অসমর্থ হইলে, বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা অথবা রোগ দেখা দিলে, এই সকল অসুবিধা মনে রাখিয়া কাজ করিতে হয় এবং অসুবিধা দেখা দিলে যথা সম্ভব দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

ছাত্রগণকে কাজে নিয়োগ করিবার জন্য ভর্তির উদ্দেশ্য থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করিয়া সবচেয়ে বেশি উপকার, জ্ঞান, সুযোগ সুবিধা পাইয়া, অর্জিত বিদ্যা যাহাতে ছাত্রের দেশের উপকারে

লাসে সেই দিকে এই প্রতিষ্ঠান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণ বিচার করিয়া সেখানে ছাত্র ভর্তি করা হয় না। সেই সব প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম কি, এবং বিভিন্ন সূত্রে তাহাদের গুণ কি, তাহা বিচার করিয়া সংবাদ রাখা হয়। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ হইলেই যে সেখানে সব বিষয়ে পড়াশুনা ভাল হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। অনেক ছোট ছোট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগের খ্যাতি জগৎ জোড়া। Southern Illinois University একটি ছোট বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ইহার Education এবং Microbiology বিভাগ দুইটির যথেষ্ট সুনাম আছে। University of California এবং University of Wisconsin পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। গুণবিচারে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে বিভাগের উৎকর্ষ জানা যায় সেই বিভাগে ছাত্র ভর্তির জন্য চেষ্টা করা হয়। ভর্তির পর ছাত্রদের আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা সংগ্রহ করাই এই কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য। মেসনের ক্লাব, রোটারী ক্লাব, এই জাতীয় আরও চল্লিশ পঞ্চাশটি সংস্থা বিদেশী ছাত্রগণকে নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করে।

Institute of International Education এই সকল সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখিতে বাধ্য, তাহা না রাখিলে বিদেশী ছাত্রগণকে আশানুযায়ী সাহায্য দেওয়া যায় না। যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি হইবে সেখান থেকে আর্থিক সাহায্য সকল সময় পাওয়া যাইবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। বাহিরের নানা প্রকার সাহায্য পাওয়া যায়। ইহার উপর খাস আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব আর্থিক সাহায্য ত আছেই, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আংশিক সময়ের জন্য কাজও পাওয়া যায়।

৩। পরিচিতির ব্যবস্থা (Orientation): যে সকল বিদেশী ছাত্র আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে কোন না কোন সাহায্য পায় তাহারা আসিয়াই প্রথমে যাহাতে দেশের ছাল চালের সঙ্গে পরিচিত হয় গভর্ণমেণ্ট সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৯৪৯—৫০ সাল হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সেই ভার এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে. ১৯৫১—৫২ সালে দেশের সব অঞ্চলেই ইহার জন্য আঠারটি কেন্দ্র ছিল। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে বহিরাগত ছাত্রদিগকে আমেরিকার রীতিনীতি, জীবনযাত্রা, চালচলন, উচ্চতর সংস্থাগুলির নিয়মকানুন, ব্যবস্থাপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় শিখান হইত। ইংরাজী কথাবার্তায় যাহাতে জড়তা না থাকে, এবং আমেরিকার বিশেষ ধরণের ইংরাজীর সাথে যাহাতে পরিচয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইত। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং শাসন ব্যবস্থাও শিখান হইত। প্রতি বৎসর এই ব্যবস্থা হয়। আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনের সহিত ভালভাবে পরিচিত হইবার জন্য অনেক বিদেশী ছাত্রকে ঐ বৎসর গৃহস্থপরিবারে একমাসের জন্য অতিথি রাখা হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়া রাখা ভাল যে, কলেজের বৎসর সেপ্টেম্বর মাস থেকে আরম্ভ হইয়া মে মাসে শেষ হয়। জুন, জুলাই এবং আগষ্ট গরমের ছুটি থাকিলেও উৎসাহী ছাত্রগণকে পড়াইবার পৃথক ব্যবস্থা থাকে।

৪। খোঁজ খবর নিবার কাজ (Supervision): পরিচিতির ব্যবস্থার পর ছাত্রদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ যোগাযোগ আর থাকে না। কলেজ কর্তৃপক্ষই তখন সোজাসুজি ভার নিয়া থাকেন। তবে এই বলিয়া ইহার কাজ শেষ হয় না। প্রতিষ্ঠানটির Foreign Students Department এর Students Relations Division যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া নিজ দেশে ফিরিয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজনমত খোঁজখবর ও

সাহায্য করিয়া থাকে। ১৯৪১—৪২ সালে Studente Relations Division ২৯৬০টি ছাত্রের খোঁজখবর নিয়াছিল। এই কাজ করিতে গিয়া কলেজগুলির বিদেশী ছাত্রদের পরামর্শদাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অফিসগুলির সহিত মিউইয়র্কের হেড অফিসের কর্মচারীদের রুটিন বাঁধিক কাজ ছাড়াও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিতে হইয়াছিল। ছাত্রদের পড়াশুনার বিষয়, বা personal adjustment অথবা পছন্দাকড়ি সংক্রান্ত অসুবিধার বিষয় প্রভৃতি সব ব্যাপারেই নজর রাখা হইয়াছিল। অবশ্য যে সকল ছাত্রের গুরুতর অসুবিধা অথবা সমস্যা দেখা দেয়, তাহাদের সংখ্যা অল্প।

৫। আমেরিকান ছাত্রদের প্রোগ্রাম (U. S. Studonts Program) : বিদেশে গিয়া উচ্চাঙ্গের পড়াশুনা করিবার জন্য আমেরিকান ছাত্রগণকে সাহায্য করিতে এই প্রতিষ্ঠানের দান কম নয়। ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম ও ব্যক্তিগত প্রোগ্রাম (Private Program) মারফত এই সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত প্রোগ্রামের মধ্যে Ford Foundation, Rockfeller Foundation ও Carnegie Corporationও আছে।

(ক) ফুলব্রাইট :—আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের Educational Exchange Program এর জন্য বিদেশে উচ্চাঙ্গের পড়াশুনা করিতে এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকান ছাত্রগণকে নির্বাচিত করে। ছাত্রগণ সকলেই ফুলব্রাইট বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে। ১৯৯২ সালে ৩৮৪টি কলেজ থেকে ৪০২৯ জন প্রার্থী দরখাস্ত করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি জাতীয় নির্বাচনকমিটি (National Selection Committee) আছে। দেশের সকল স্তরের (সংবাদ পত্র, স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিবার ইউনিয়ন, বয়ন কলের শ্রমিকদের ইউনিয়ন, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা কাউন্সিল, হাসপাতাল, সমাজ সেবা কাজ, থিয়েটার, লাইব্রেরী, বই প্রকাশন সংস্থা, মুদ্রণ শিক্ষালয়, মিউজিয়াম ইত্যাদি এবং ইহাদের সঙ্গে কলেজগুলি আছে) প্রতিনিধি এই নির্বাচন কমিটিতে আছেন। শিক্ষার বহুবিধ বিষয় এবং বিভিন্ন শ্রেণী আছে বলিয়া নির্বাচন কমিটির সভ্যের শ্রেণী ও সংখ্যা বহু। বিদেশী ছাত্রদের বেলায় বাছাই করিবার কঠোরতা যতখানি, আমেরিকান ছাত্রদের বেলায়ও প্রায় ততখানি। ১৯৪২ সালে ৮১৭ জন ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছিল। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি যে, Smith Mundeu Act অনুযায়ী নির্বাচিত ভারতীয় প্রার্থীগণ খাস আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট থেকে বৃত্তি পাইলে সঙ্গে সঙ্গেই Fulbright Travel Grant (যাতায়াত খরচ) পান। যে সকল ভারতীয় প্রার্থী অন্য উপায়ে সে দেশে থাকিবার খরচ সংগ্রহ করেন তাঁহারা প্রায়ই Fulbright Travel Grant পান।

(খ) ব্যক্তিগত (Private) : প্রায় তেইশটি ব্যক্তিগত সংস্থা আছে। এইগুলি প্রায়ই বিদেশী এবং আমেরিকান ছাত্রগণকে নিজ নিজ দেশে পড়িতে সাহায্য করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়। এই প্রতিষ্ঠানকে ঐ ব্যাপারে এই বিদেশী সংস্থাগুলি, (যেমন জার্মাণীর Deutsche Akademische Austauschdienst, সুইজারল্যাণ্ডের University of Bern, University of Basel, University of Zurich, ফ্রান্সের Wooley Foundation ইত্যাদি) উপযুক্ত আমেরিকান ছাত্র নির্বাচন করিতে অনুরোধ করে। তখন এই প্রতিষ্ঠান ছাত্র বাছাই করিয়া দেয়।

(গ) বিশেষ প্রোগ্রাম (Special Program) : বিদেশী বিশেষজ্ঞ অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক নেতাকে অথবা উচ্চাঙ্গ পাঠে রত ছাত্রকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনুশীলন করিতে প্রায় পনেরটি আমেরিকান সংস্থা আর্থিক সাহায্য করে। তাহাও এই প্রতিষ্ঠানের মারফত হয়। আমেরিকান বিশেষজ্ঞ-

গণকে শিক্ষামূলক বক্তৃতা বা ভ্রমণে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করে, তাহাও এই প্রতিষ্ঠানে মারফত হয়।

আশা করি, এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকগণ প্রতিষ্ঠানটির কার্যকর্মের বিবরণ মোটামুটি জানিতে পারিবেন। এই প্রবন্ধে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক পৃথক কলেজগুলিতে নিজেরাই পড়াইয়া ডিগ্রী দেয়। ডিগ্রী দিবার বিষয়ে তাহারা আমাদের দেশের মত কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী নয়। আবার, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিভিন্ন বিভাগ থাকে। তাহাদিগকে কলেজ নাম দেওয়া হয়, যেমন College of Liberal Arts, College of Liberal Science, College of Medicine, College of Engineering প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কেহ আরও বেশি সংবাদ জানিতে চাহিলে ইহার নিউ ইয়র্ক শহরের অফিসে অথবা আমাদের দেশে U. S. Education Foundation in India, ১৭ নং কার্জন রোড, নিউ দিল্লী, ঠিকানায় চিঠি লিখিলে জানিতে পারেন।

আদর্শ গ্রাম

শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের কীর্তি দেখে অবাক হয়েছে সকলে। আধুনিক সমাজ যাদের আজও আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেনি মানুষ বলে, ভাই বলে, —সেই জংলী মানুষের সংগঠনক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হতে হল। এদের কোন ডিগ্রিগত বিদ্যে নেই। নিজেদের আটপৌরে শিক্ষার সুন্দর মিষ্ট সৌজন্যে জীবনকে সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে বলেই জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে।

লোকশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা আজ সমাজজীবনে কতখানি প্রয়োজন, তা এ অঞ্চলের জনগণ বেশ ভাল করে বুঝল।

যন্ত্রমহীন হৃদয়হারা মানুষ এরা। নিজেদের ভাল মন্দের খতিয়ান কোন দিনই রাখে না, রাখতে জানেও না। জংগলের সঙ্গে চেনা জানা, তাই তার হাত-ছানিতেই ছোটে। ঘর বাঁধার তাগিদ নেই, জীবনের পরিপূর্ণতার বালাই নেই, বেশ মজার মানুষ এরা। জাতে এরা মুণ্ডা (আদিবাসী), তাও আবার ছিন্নমূল। যাদাবর জীবনের অভিশাপে এরা অর্জর কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে এলো এক বাঁচবার তাগিদ। সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠল উদ্যম আর কর্মশক্তি নিয়ে। আশার মুকুরে দেখতে পেল জীবনের ছবি।

মাটি—মাটি—মাটি। এই মাটিতেই আছে আসল জীবন, আছে স্বপ্ন, আছে সাধ। অমূল্য রত্নের সন্ধান পেল এরা। মুছে গেল অনাসক্তির রেখা! সর্বশক্তি নিয়োগ করল নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকালের অতল তল থেকে তুলে আনতে।

নতুন পরিবেশে উন্নততর সমাজব্যবস্থার প্রস্তাবে এদের সমাজে আসে বিপ্লব। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা ও স্বার্থলেশহীনতার ফলেই একদিন দেখা দিল উন্নতির জোয়ার।

সমস্যার তো তালিকা রয়েছে তবু শিক্ষা ব্যবস্থার আশু সমাধান করতে অগ্রণী হল সকলে, কারণ এর উপরই নিজেদের ভবিষ্যৎ একান্ত ভাবে নির্ভর করছে। নিজেরাই জমি দিল, বাঁশ, খড় সব দিল, আর দিল স্বেচ্ছাশ্রম। গ্রামের সুন্দর পরিবেশে মাথা তুলে দাঁড়াল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৬ষ্ঠ থেকে ১৪।১৫ বছরের ছেলেমেয়েরা নাম লেখা হল স্কুলের খাতায়। যাঁরা নিয়ে অনেক মনীষী অনেক গবেষণা করেছেন কিন্তু এদের পাঠে আগ্রহ দেখলে অনেকেরই মনে বিস্ময় জাগবে। ছাত্রদের অভিভাবকগণ বিশেষ দায়িত্বশীল। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে গ্রামকে গড়ে তুলতে সকলে হল সচেষ্ট ও সতর্ক।

বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র অনুপস্থিত হলে তখন কয়েক জন মোড়ল মাতব্বর লোক ছুটবেন তাদের বাড়ি বাড়ি। অনুসন্ধান করবেন তাদের কাছে —উপযুক্ত কৈফিয়ৎ ছাড়া কারো নিষ্কৃতি নেই— বিদ্যালয়ের উপস্থিতি দেখে সরকার থেকে যে দুজন special cadre শিক্ষক দিয়েছেন তাঁরাও খুব উৎসাহী ও কর্মী যুবক। এঁদেরই উৎসাহে ও গ্রামের জনসাধারণের সহযোগিতায় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় প্রস্তুত করলেন গ্রামীণ সভ্যতার উন্নতিকল্পে এক সুন্দর পরিকল্পনা।

পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে স্থিরীকৃত হল প্রত্যেককে সপ্তাহের একদিনের শ্রম দান করতে হবে। মেয়েরাও এথেকে বাদ পড়বে না। এদের এই কল্যাণকর উদ্যোগে মাত্র কয়েক মাসেই গ্রামের রূপ গেল পালটে। পথঘাট ঝকঝকে তকতকে হয়ে গেল, সমস্ত কিছুর মধ্যে দেখা গেল পরিচ্ছন্ন হাতের মনোমুগ্ধকর ছাপ।

এবার মনের সুপ্ত মাথা তুলে দাঁড়াল। বোবা মন তাদের জন্য আকুলি বিকুলি করে ওঠে। পথ খোঁজে মুক্তভাবে আত্মপ্রকাশ করতে। এরই প্রবল তাড়নে গাঁয়ের লোক বয়স্ক বিদ্যালয় খুলে ফেলল। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যায় কোন রকমে দেহটাকে বয়ে নিয়ে যায় সেখানে। রস-কসহীন শুধু মাত্র আঙ্কিক পরিচয় সেখান হয় না। সামান্য গল্প, আলাপ আলোচনা, গান বাজনা, খেলাধূলার মাধ্যমে চলতে থাকে মুখ্য কাজ। যে দেহ ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ত তা আবার সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। একটা পরম তৃপ্তি নিয়ে সকলে বাড়ি ফেরে।

এমনি করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমনকি কয়েকটা বছরও কেটে গেল। আজ এরা অনেক কিছু শিখেছে জেনেছে। আজ এরা দৈনিক খবর পড়ে, নিজেদের হিসাব রাখে, মহাজনের খাতায় ছুপ ধরতে পারে। নিজেদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে চিঠিপত্রে আলাপ করে। ভারতের অগ্রগতির সংবাদ বলতে পারে। তার ওপরে জেনেছে এদেশের মহাজীবনের মহান কথা। তারা যত পড়ে তত ভাবে, আর তার চাইতে বেশী চোখের জল ফেলে—নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য। সে লজ্জা ক্ষালন করতে সংকল্প করে।

নিজেদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়াতে গাঁয়ে তৈরী করেছে ছোট এক গ্রন্থাগার। বইএর সংখ্যা খুব বেশী না হলেও নিজেদের কাজ চালানো মত আছে। তার ওপরে সরকার থেকে কিছু পুস্তক পুস্তিকা নিয়মিত ভাবে সাহায্য করা হয়। দৈনিক পত্রিকাও একখানা আছে।

স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার সহৃদয় কর্মচারি-বৃন্দের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের ফলে আজ এরা কৃষির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছে। এরা জেনেছে এটা বিজ্ঞানের যুগ, তার সাথে তাল রেখে না চলতে পারলে পতন ও বিফলতা অনিবার্য। আজ বাংলার চাষী চরম সংকটের সম্মুখে, তবু আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতেই চাষ করি। জমির পুষ্টির জন্য মাথা ঘামাই না, অথচ তার কাছ থেকে আশানুরূপ ফসল না পেলে ভাগ্যের দোহাই দিই। ওড়লামাটি,

আবর্জনা, খড় কুটা, মলমূত্র যে মাটির কতখানি উপকারী তা অনেকেই আগে জানত না। যেদিন এসবের গুণাগুণ জানল সেদিন থেকে কোমর বাঁধল নিজেদের দুঃখদুর্দশা গ্রাম থেকে দূর করতে। এরা মিশল সবুজ সারের প্রয়োগ, মিশল কম্পোষ্ট, কার্বহিয়ার্ড কম্পোষ্ট সার তৈয়ারী করতে ও কাজে লাগাতে। জাপানী প্রথায় চাষ করায়, আর সারের গুণে, ফসলের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। নিজেদের বহুদিনের অজ্ঞতা ধরা পড়েছে। আধুনিক উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বীজ সার ব্যবহার করতে এরা কৃষিকার্যে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছে তা সত্যই প্রশংসনীয়।

নিজেরা কৃষকের চিরাচরিত অব্যবস্থা দূর করতে তৈয়ারী করেছে কৃষিসমিতি, সে সমিতি আরও উন্নত হয়ে পাইলট প্রজেক্টের কাজ চালু করেছে। এর জন্য সরকার মোটা রকম অর্থ সাহায্য করছেন। এতে চাষীদের কাজ ছাড়া অর্থচিন্তার আর বালাই নেই। এরা মক্কিকা পালন করতে শিখেছে। গুড় শিল্পের জন্য তৈয়ারী হয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সুদূর কেরল থেকে ট্যাপিওকা এনে চাষ সুরু করেছে, এবং এই উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ট্যাপিওকা দানা তৈয়ারী করে গ্রামের অর্থনৈতিক সমস্যাটাকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে। অনেক বেকারের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

নিজেদের ঘরগুলো ভেঙেচুরে নূতন পরিকল্পনায় তৈয়ারী করছে সুন্দরভাবে। তার ওপরে সরকার থেকে আদিবাসী কল্যাণ পরিকল্পনা অনুসারে আরও নূতন ধরণের বাড়ি তৈয়ারী হয়েছে। প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে আছে সব্জী ক্ষেত ও ফুলের বাগান। এইসব বাগানগুলো দেখলে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। গ্রামের লোক বিভিন্ন প্রকার পালপার্বণ উৎসব আনন্দে মুখর করে তোলে গ্রামকে। বিত্ত না থাকলেও চিত্ত আছে। তাই নিয়ে লড়াই চালায় অর্থ দিয়ে হাতের কাজের কলাকৌশল জাহির করে।

এরা লোকসঙ্গীত থেকে সাহিত্য রামায়ণ পুরাণ বেদ, রামায়ণ মহাভারতের অনেক কিছুই জানে। এগুলো ওদের চলার পথে এক মহা পাথেয়। নিজের দোষ ত্রুটি দেখা দিলে নিজেদের সংশোধন করে ঐসব যুক্তিতর্কের উপযার অবতারণা করে। ঝগড়া লোকদরা আজ পর্যন্ত একটিও ঘটেনি এগ্রামে।

এ গাঁয়ের মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তারা সর্বদা সচেতন। নিজেদের অঙ্গন প্রাঙ্গণে কোমল হাতের স্পর্শে ফুটিয়ে তুলেছে শ্রী। ঘরে এসেছে লক্ষ্মী। সংসারের কাজকর্ম সেরে গাঁয়ের মেয়েরা ঠিক দুপুরে এক জায়গায় জড়ো হয়। পড়া-শোনা করে। সেলাই কোঁড়াই শেখে, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান পেয়েছে। পরিবেশ সাফাই-এর দিকে এদের সতর্ক দৃষ্টি আছে।

এ গাঁয়ের বৈশিষ্ট্য এখানে।—এরা ছুঁৎমার্গের ধার ধারে না, জাত্যভিমানের বালাই নেই। হিংসা দ্বেষ ঘৃণা সংশয় ছলনা দূর করে দিয়েছে। গ্রামের সকলেই সকলের প্রিয়জন। পবিত্র ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধনে আজ দৃঢ় আবদ্ধ।

এরা বলে, আমাদের অর্থসম্পদ কিছু না থাকুক তার জন্যে কিছু যায় আসে না। আমাদের আছে শুভ বুদ্ধি আর সবল বাহু, এ দুটোর সুখেই আমরা গাঁয়ের আরও উন্নতি করতে পারব, আর আমাদের গ্রামকে আদর্শরূপে স্থাপন করতে পারব।

আজ এদের দেখলে গর্ব হয়। জীবনপ্রবাহকে যে ভাবে দুর্গম গিরি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে এরা সাফল্যের সাগরসঙ্গমে ছুটে চলেছে, তাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি নেই।

এরা হল—মদীয়া জেলার রাণাঘাট থানার লাহুপুর গ্রামের অধিবাসী। লাহুপুর গ্রাম ১৯৫৮ সালে এ জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রামরূপে ভারত সরকারের কাছে পুরস্কার পেয়েছে।

ছাত্রদের প্রতি

(মহাত্মা গান্ধীর রচনা হইতে)

শ্রীনারায়ণ রক্ষিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংখ্যার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করি না। আত্মিক শক্তির যোগ হলেই শুধু তা কার্যকরী হয়। হাজার হাজার পিঁপড়ে সমবেতভাবে ঠিক জায়গা মতো আক্রমণ করে একটি হাতিকে মেরে ফেলতে পারে। এমনি তারা পৃথক হলেও তাদের আত্মিক শক্তির ঐক্যবোধ তাদেরকে অদম্য করে তোলে। এইরূপে আমরাও পিঁপড়েদের মতো এক হতে পারলেই পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা যদি সত্যই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁদের আদর্শে বিশ্বাস করেন, তবে তাঁরা সরকারি বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের চাইতেও দেশকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন। এটা সর্ববাদীসম্মত যে ভালোর অল্পও ভালো। কারণ তা-ই খাঁটি। পক্ষান্তরে আমি মনে করি, অবাস্তব চিন্তা মূল্যহীন।

যখন গ্যালিলিও বললেন—পৃথিবী একটি বলের মতো গোল এবং পৃথিবী স্বীয় কক্ষের উপর ঘোরে, তখন তাঁকে কল্পনাবিলাসী ও স্বপ্নচারী বলে উপহাস করা হয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট তিরস্কৃতও হয়েছেন। আজ গ্যালিলিওর কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর বিরোধীরা মনে করত পৃথিবী স্থির এবং থালার মতো সমতল। তারা ছিল অজ্ঞানের অন্ধকারে।

আমাদের দৃষ্টিকে সত্যভ্রষ্ট করার দিকেই আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা। তাই আমাদের কাছে আত্মিক শক্তি বা ঐশী শক্তির কোনো মূল্য নেই, অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকতার প্রতিই আমাদের লক্ষ্য। সত্যিই ঐ হল জড়বুদ্ধির গতি।

আমি ধৈর্যসহকারে আশা করে আছি। আমার নিজের এবং আমার সহকর্মীদের অভিজ্ঞতার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে এসেছি তার সত্যতায় আমার অবিচলিত বিশ্বাস আছে। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করলে প্রত্যেক ছাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন :

১। শুধু সংখ্যা নিরর্থক।

২। আত্মিকশক্তি ছাড়া আর সব শক্তিই অনিত্য, সব শক্তিই ব্যর্থ।

বলাই বাহুল্য—উক্ত সিদ্ধান্তগুলি সত্য হলে, প্রত্যেক ছাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির দ্বারা অপরাজেয় ঐশী শক্তিতে নিজেকে সবল করে তোলা কর্তব্য।

ভীরুদের কাছে সংখ্যার গুরুত্ব আছে। একক সংগ্রামই বিভীষক পুরুষের কীর্তি। এখানে তোমরা সকলে সেই সাহসিকতারই অনুশীলন করবে। তোমরা একাই হও আর অনেকেই হও, সাহসই একমাত্র শক্তি, আর সব মিথ্যা। ত্যাগ, সংকল্প, বিশ্বাস ও বিনয় ব্যতিরেকে সাহস লাভ করা যায় না।

পুস্তিকা-সমালোচনা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বুনিয়াদী শিক্ষা কি।

ওরিয়েন্ট সংস্করণ। সম্পাদক হংসরাজ ভাটিয়া। ৬৪ পৃঃ। মূল্য এক টাকা। এপ্রিল, ১৯৪৮

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য কি, ইহার সুফলই বা কি, যুগানুপাতে শিশুর শিক্ষাধারার পরিবর্তনের ব্যবস্থা কি করিতে না—এগারোটি প্রবন্ধে বিভক্ত আলোচ্য পুস্তিকাটি এইসকল প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছে। আলোচনা ভাল, বিহার সরকারের পরীক্ষিত কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের আয়ের হিসাব বুনিয়াদী শিক্ষার ফলাফল ইহার নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী পাঠক পদে পদে মুদ্রাকরপ্রমাদ ও ভ্রান্ত শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাইয়া বিব্রত হইবেন। নীচে কয়েকটির উল্লেখ করি:—(১) 'কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা জন-সাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন', পৃঃ ৪; (২) 'বহি পরীক্ষা', পৃঃ ৫; (৩) 'বুনিয়াদী শিক্ষাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে' পৃঃ ৬; (৪) 'প্রতিক্ষা নিত', পৃঃ ৮: (৫) 'চরম পরিণামরূপে দেখানো হয়': পৃঃ ৯; (৬) 'প্রতিও শিত', পৃঃ ১০ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন কয়েকজন শিক্ষাবিদের নাম ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি করিয়া 'পরিভাষা' সংজ্ঞা পায়, তাহা বলাও সম্ভব নয়। ডক্টর জাকির হোসেনের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি যে বর্তমানে বিহারের গভর্নর, একথাটিও পাঠকদিগকে জানানো উচিত ছিল। সমুদ্দেশ্য নিশ্চিত এই পুস্তিকা কোনও শিক্ষিত বাঙালী পাঠককে দিয়া সংশোধিত করিয়া লইলে ও অতিরিক্ত প্রুফ-রীডারকে দিয়া দেখাইয়া লইলে ভালো হইত।

———

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : শ্রাবণ, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ১২৯

শিক্ষা, কারুশিল্প দর্শন ও সুইডিশ্ স্লয়েড
শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ ১৩১

শিক্ষাশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ১৩৮
শ্রীহারাধন রক্ষিত

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৬৬ | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষা-সংকট

দেশে যখন রাজনৈতিক অশান্তি, তখন ছাত্রসমাজ সেই অশান্তির আবর্তে পড়িয়া আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি। শুধু যদি সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া শিক্ষকগণও বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতেও বলিবার কিছু নাই। কারণ পড়াইবেন তাঁহারা কাহাকে? শুধু তাঁহারা প্রস্তুত ও ব্যগ্র হইলে চলিবে না, যাহারা পড়িবে তাহাদের মন পাওয়া চাই। চারিদিকের আর্থিক কষ্ট দেখিয়া ও কষ্টের কথা শুনিয়া শিক্ষকের মনকে অস্থির হইতে দিয়া চলিবে না, তিনি যে কাজ লইয়াছেন, বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও সেই কাজের মূল্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে, নিজের কাছে যদি একথা স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারেন ও সেইমত কাজে লাগিয়া থাকিতে পারেন, তবেই তিনি শিক্ষক। আমাদের বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা কম নহে। তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠার জন্যই আজও শিক্ষক সমাজের সামাজিক মর্যাদা। তাঁহাদের নমস্কার করি।

রবীন্দ্রনাথ

প্রতি শ্রাবণে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করি, যেমন করি ২৫শে বৈশাখে। তাঁহার উদার দৃষ্টি শিক্ষার ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া, তাহার যে সংস্কার সাধন করিয়া দেশের সম্মুখে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিল, আমরা আজও তাহার যোগ্য নহি। আজও আমরা বাংলা ভাষার গৌরব শুধু মুখেই প্রকাশ করি, জ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহার আশ্রয়ে বিচরণ করিতে ভরসা পাই না। বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়া ও শিক্ষার বিকীরণ সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা, তাহার অনুসরণ আমরা করি নাই। শান্তিনিকেতনে তিনি যেভাবে শিক্ষকতা করিতেন, সেভাবের কোনও রাগই আমাদের মনে বসে নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন তাহা অমূল্য। আজিকার শিক্ষক সমাজে, শুধু শিক্ষক সমাজে কেন, অভিভাবক সমাজেও তাহা প্রচারিত হওয়া উচিত। কবিশ্রেষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথ, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, অধ্যাত্ম, পল্লীসমাজ যেদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন সেই দিকেই তাঁহার আলোচনার সোনা ফলাইয়াছেন। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী আগতপ্রায়, এই সময়ে তাঁহার শিক্ষানীতি ও শিক্ষক জীবন সম্বন্ধেও আমাদের শিক্ষালাভ করার বড়ই প্রয়োজন, এবার যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

জলপাইগুড়ির পলিটেকনিক

জলপাইগুড়ির পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। তাহার একটা সুমীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সহযোগী 'ত্রিস্রোতা' সংবাদ দিতেছেন। যেভাবে মীমাংসা হইয়াছে, তাহার পোষকতা করিতে গিয়া 'ত্রিস্রোতা' যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

"এবিষয়ে ছাত্রদিগকে আমাদের কিছু বলার আছে। আমাদের দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, ইউনার প্রথমে তাঁহারা অভিভাবকদের কিছু জানিতে দেন নাই। তাঁহারা সভা করিয়া যে জাতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত অভিভাবকদের কাহারেও দেখান উচিত ছিল। তাঁহারা যথেষ্ট হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিক্ষা মাত্রেই সাধনা। যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করার সময় মানসিক স্থিরতা, সংযম ও বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ প্রয়োজন। ধর্মঘট শুরু করার পূর্বেই তাঁহারা ঘটনাবলী অভিভাবকদের দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারিতেন এবং তাহাই উচিত ছিল।

ম্যানেজিং কমিটির নিকটও আমাদের কিছু বলার আছে। ছাত্রদের অভিযোগ তাঁহারা যেন ছাত্র-মারফত ও সরাসরি শুনিবার ব্যবস্থা করতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আমরা অধিকতর আলোচনার ব্রতী হইতে চাহিনা। আশা করি ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হইবে এবং আমাদের এ জাতীয় মতামত প্রকাশেও বিরত থাকিতে হইবে।"

বিপদ তো এখানেই। ছাত্রসমাজও চঞ্চল হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কর্তৃপক্ষও বিদ্রোহ দমনে সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। না হইলে বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ না হইয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা যদি এযুগে বিবাদ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়, তবে সেই একই যুগে আমাদের বিদ্যালয়গুলি ঘিরিয়া একটা অশান্তির পরিমণ্ডল এবং পরিণামে ধর্মঘট কি করিয়া সম্ভব হয়? বাস্তবিক, অপরিণামদর্শী কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ছাত্রসমাজ—উভয় পক্ষেরই এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিয়া স্থির নীতি গ্রহণ করা উচিত।

শিক্ষা, কারুশিল্প দর্শন ও সুইডিস্ প্লয়েড

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখিতে গেলে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভারতীয় আধুনিক কালে তথা হস্তশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেশের জাতীয়তাবাদের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশে একদা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে; সেইসঙ্গে ভারতীয় কারুশিল্পের মর্যাদাপূর্ণ যোগ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। বর্তমানে একদিকে পল্লীশিল্প, গৃহশিল্প, কুটীরশিল্প ও সবশেষে শিক্ষাশিল্প প্রভৃতি একাধিক—যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক উদ্দেশ্যমূলক শিল্প প্রসারলাভ করিতেছে। ভারতীয় জীবনে শিল্প সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সঠিক উপলব্ধি না হইলে কারুশিল্পের ব্যাপক ও যথার্থ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেষতঃ এই কলের যুগে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ড; কারণ দেশের 'ইণ্ডাষ্ট্রি' বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং কারুশিল্প দর্শনের আলোচনা প্রয়োজন। নতুবা এতদুভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই সময়ে সুইডেনে কারুশিল্পের পূর্বজীবনলাভের ইতিহাস ও আধুনিক যন্ত্রযুগে ইহার পরিণতির বিবরণ এদেশের কারুশিল্পানুরাগী মাত্রেরই কাজে লাগিতে পারে, সেইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন কলের প্রভাব ইউরোপীয় দেশসমূহে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং প্রাচীন কারুশিল্পের ধারা লুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম, তখন সেইদেশে কারুশিল্প জীবনের পুর্ণ গঠনের এক আন্দোলন আরম্ভ হয়।

কলের যুগ সূচিত হওয়ার পূর্বে অন্যান্য দেশের ন্যায় স্কান্ডিনাভীয় দেশ সমূহের অর্থ ও সমাজ-নীতিতে কারুশিল্পেরই প্রাধান্য ছিল। গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র এমনকি পরিধেয় বস্ত্রাদি হাতেই তৈরী হইত। উত্তরদেশসমূহে আলোকময় গ্রীষ্মঋতু স্বল্পায়ু। ইহার পর একটানা দীর্ঘ অন্ধকারময় শীত ঋতু, তখনকার দিনে দেশের শতকরা ষাট জনই কৃষিজীবি ছিল। অন্ধকার ও তুষারময় শীত ঋতুতে কৃষির কাজ চলিত না কিন্তু পূর্ব পুরুষের প্রথানুযায়ী গৃহে বসিয়া কৃষিজীবিগণ জীবিকার প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত উৎপাদনমূলক শিল্পের কাজে লিপ্ত থাকিতেন। শীতাধিক্যের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৃহচুল্লিতে অগ্নি জ্বালিয়া গৃহবাসিগণ একত্র সমবেত হইতেন। বৃদ্ধগণ প্রাচীনযুগের কাহিনী ও ছড়া আবৃত্তি করিতেন, কেহ কেহ বা পল্লী সঙ্গীতে গৃহ মুখরিত করিতেন, এবং আনন্দময় গৃহপরিবেশে সকলের হস্তই শিল্প-চর্চায় লিপ্ত থাকিত। পুরুষেরা গৃহের আসবাবপত্র ও কৃষিযন্ত্রাদির হাতল ও অন্যান্যিক বস্তু তৈরী করিতেন, মেরামত করিতেন, আর নারীরা দেহাভরণ তৈরীর জন্য সূত্রকাটা, তাঁতবোনা, সেলাই ও লেসের কাজ করিতেন। এরূপ প্রয়োজনীয় কাজে অর্থলাভের অপেক্ষা সুন্দর বস্তুর দ্বারা প্রয়োজন পূরণের তাগিদ অধিক ছিল। সেইজন্যও সৌন্দর্য-সৃষ্টির পূর্ণ প্রয়াস করিবার অবসর তাঁহারা পাইতেন। কারুশিল্পের এরূপ ব্যাপক চর্চা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহাই সুইডেনে "হোম ক্রেড" বলিয়া অভিহিত হইত।

কলের যুগের সূচনায় সঙ্গে সঙ্গে দেশে দরবার আন্দোলনের সুরু হয়। কারুশিল্পের যে সচল প্রবাহ যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছিল, তাহাতে ক্রমশঃ ভাটা পড়ে। এমন কি যন্ত্রশিল্পপ্রধান স্থানসমূহে কারুশিল্প লোপ পাইতে থাকে। পূর্বে যে সকল

বস্ত্র গৃহে গৃহে হাতে তৈরী হইত, তাহা উদীয়মান ক্রমবর্ধিষ্ণু কলে তৈরী হইতে লাগিল। সর্বজন আচরিত হস্তকলা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্যে হস্তনৈপুণ্য হ্রাস পাইতে লাগিল। রেলগাড়ী ও অন্যবিধ দ্রুতগামী যান চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলে তৈরী বস্তু সর্বসাধারণের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে লাগিল। যে সকল বস্তু মানুষ হাতে তৈরী করিয়া প্রয়োজন ও সৌকর্যস্পৃহা মিটাইত, সেই কাজের ক্ষেত্র দ্রুত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সুইডেনে এইরূপ যান্ত্রিক কলের প্রভাব যখন কায়েম হইতে বসিতেছিল, ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে এক চিন্তাশীল মনীষী সমাজ ও শিক্ষা-সেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল ওট্টো সালোমন (Otto Salomon)। তিনি কৃষিবিদ্ ছিলেন। কৃষিবিদ্রূপে তিনি দেশের কৃষি ও কৃষককুলের উপর আধুনিক যান্ত্রিকশিল্পের প্রতিকূল প্রভাব লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইলেন। পরিবারে, গৃহে সার্বজনীন কায়িকশিল্পের স্থান কল অধিকার করার ফলে নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটিল তাহা সমাধানের চিন্তায় তিনি মগ্ন হইলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে ব্যক্তির নৈতিক ও সামাজিক জীবনে সৃষ্টিশক্তির ধারা অপ্রতিহত না রাখিলে যন্ত্র বা কল সমৃদ্ধ নতুন সমস্যা মানুষকে বিপন্ন করিবে। কর্মচর্চা ও কর্মদক্ষতার মূল্য নিরূপণ করিতে যাইয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে মানবের কর্মচেতনা প্রসূত করে মানুষের হাতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চা। এইরূপে শিক্ষাশিল্প বা শিক্ষানৈতিক ব্লয়েড জন্মলাভ করে। শিক্ষানৈতিক জগতে তাঁহার অপূর্বদান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

কলের প্রভাবে নতুন সুখ সুবিধার চিন্তায় মানুষের গৃহকর্ম ও জীবনধারা দ্রুত পরিবর্তন লাভ করিতেছিল। গৃহজীবনে অবকাশ বাড়িয়া উঠিল। সালোমন দেখিলেন যে সেই অবকাশ সময় জনসাধারণ নিজ বা সমাজকল্যাণে নিয়োগ না করিয়া ব্যভিচারমূলক উচ্ছৃঙ্খল কাজে লিপ্ত হইতেছে, অবসর সময় অলসতায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জীবনে এই অপচয় প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ইহার প্রতিকার কল্পে একটি শিক্ষাশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পূর্বপুরুষদের কর্মদক্ষতা অর্জনের দ্বারা পুনরায় সুগম করিয়া তুলিতে ব্রতী হইলেন। শিক্ষানৈতিক ব্লয়েড এইভাবে জন্মলাভ করে। তখনকার দেশের রাজা ও চিন্তাশীল মনীষীরা তাঁহার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। এইরূপে নৈতিক কারুশিল্পের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলস্বরূপ কলের নতুন আধুনিক সমাজ প্রগতির পটভূমিকায় সুইডেনে শিক্ষানৈতিক ব্লয়েড ও হোমব্লয়েড নতুন চেতনা ও প্রেরণা লাভ করে।

সুইডেনের আধুনিক হোমব্লয়েড অর্থাৎ গৃহ-শিল্পের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহার অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক রূপের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। গৃহশিল্পের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা এইরূপ: স্বভাবজাত বাঁচা মরা দ্বারা গৃহে গৃহেই প্রয়োজনে গৃহবাসী কর্তৃক যে শিল্প অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই গৃহ-শিল্প বলা চলে। পুরুষপরম্পরায় গৃহবাসীর হস্ত যে শিল্পধারা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার স্থান অন্যশক্তি অধিকার করার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া। কলের স্থান কল অধিকার করার ফলে আপাতদৃষ্টিতে মানুষের শ্রম সময় ও অর্থ বাঁচাইতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু সেই শ্রম, সময় ও অর্থ মঙ্গল কাজে নিয়োজিত না হইলে তাহা শুধু নৈতিক ও সামাজিক জীবন নহে উপরন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনকেও বিপন্ন করে। মানুষের শ্রম বাঁচানো কল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, কল জীবনের যে শক্তি বাঁচাইতে চায়, সেই শক্তি সৃষ্টিমূলক কাজে না লাগিলে মানুষকে সামাজিক দিবালৈ পঙ্গু করিয়া তোলে। ব্লয়েড শব্দের প্রকৃত অর্থ কর্মদক্ষতা—যে দক্ষতা মানুষের

স্বাভাবিক সৃজনীশক্তির উৎসকে সচল করে। চক্ষু, হাত ও বুদ্ধির সহজ ও স্বাভাবিক সমন্বয় স্থাপিত হইলে মানবশিশুর কর্মচেতনা সম্পূর্ণ স্ফূর্তি লাভ করে। এই চেতনাশক্তির উদ্বোধন এবং ইহাকে স্থায়ীরূপ দিবার জন্য শিক্ষানৈতিক শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে সালোমন যত্নবান্ হন। শিল্পকাজ নির্বাচন, বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন কাজের শিক্ষানৈতিক মূল্য বা স্তর ইত্যাদি নির্ণয় কাজে বহু বৎসর তিনি শ্রম করিয়াছিলেন। কর্মচেতনা জাগ্রত হইলে মানুষের সৃষ্টিশক্তি স্ফুরিত হয় এবং নিজের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে নিজের যে বোধ বা উপলব্ধি আছে তাহা স্বভাবতই মানুষের আত্মপ্রত্যয়কে বৃদ্ধি করে। তাহা শিক্ষানীতির দিক দিয়া বড় জিনিস। শিক্ষানৈতিক জীবনে কর্মবৃত্তিগুলি পুরাপুরি গঠিত হইবার সুযোগ পাইলে, তাহা পরিণত বয়সে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানুষের বিশেষ সহায়ক হয়।

কলের যুগের পূর্বে মানুষের জীবনে হস্তশিল্পেরই প্রাধান্য ছিল। গৃহস্থ হস্তশিল্পের অর্থ নীতি আপনার রূপান্তর লাভ করে, যখন পরবর্তী যুগে গৃহস্থালির বাজারে চালু করার প্রথায় রূপান্তরিত হয়। নিজের ও গৃহের প্রয়োজন পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ার্থ বা বিনিময়ের জন্য অতিরিক্ত শিল্পদ্রব্য তৈরীর প্রথা প্রচলিত হয়। ইহারই ফলে সর্বজন আচরিত গৃহশিল্প কুটীরশিল্পে পরিণত হয়। গৃহশিল্প ও কুটীরশিল্পের এই প্রভেদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রধানতঃ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অবকাশ মত গৃহে গৃহবাসী কর্তৃক দ্রব্য তৈরী এক বিষয়, এবং বাজারে অর্থ বা অন্যান্য বিশেষের বিনিময়ে বিক্রয়ার্থ দ্রব্য তৈরী অন্য বিষয়। দুইয়ের মূলনীতি ও লক্ষ্য বিভিন্ন। গৃহশিল্পে বাহিরের কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ কুটীরশিল্পে অতিরিক্ত সাহায্যকারীর প্রয়োজন, নতুবা বাজারের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। এইরূপ সাহায্যকারীকে মজুরী বা মাহিনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সুতরাং গৃহশিল্প ও কুটীরশিল্পের পার্থক্য মৌলিক। গৃহশিল্পের স্বরূপ ও সংজ্ঞা এইরূপ: অন্য উপজীবিকার বিশেষতঃ কৃষিকর্মের অবকাশ সময়ে অনুষ্ঠিত শিল্পচর্চা, যাহাতে সমস্ত সময় ব্যয় করিবার প্রয়োজন অপরিহার্য। গৃহশিল্পের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্বাধীন কাজে আত্মপ্রকাশের নীতিধারায় অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় ও কর্মীর আপন রুচির স্বকীয়তা ইহাতে বিশেষত্ব জ্ঞাপক মৌলিক রূপ দেয়।

শহরে সভ্যতা ও আধুনিক ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজমের প্রভাবের ফলে কৃষিজীবির ও রুচির পরিবর্তন দেখা দেয়। পল্লীবাসী কৃষকের রুচি ইহাতে রূপান্তর লাভ করে। তাহারা গৃহশিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ সন্তোষ লাভ করে না। ইহার এক পরিণতি এই দাঁড়াইয়াছে যে বস্তুতান্ত্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের প্রভাবে ইউরোপের বহুস্থানে গৃহশিল্পধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে গৃহশিল্প কুটীরশিল্পে অবনত হইয়াছে এবং মাধ্যমিক একজন ব্যবসায়ী পরশ্রমে দেশ ও সমাজকে প্রতারণা করিতেছে বলা যায়। অনুরূপ অবস্থা আজ এদেশের কারুশিল্পের জীবনেও প্রবেশ লাভ করিতেছে।

ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে যাহারা গৃহশিল্পের ধারা জাতীয়-জীবনে সফল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, স্কাণ্ডিনাভীয় দেশসমূহ ইহাদের অন্যতম এবং সুইডেন এক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী। সুইডেনের রাজেন্দ্র ঐতিহাসিক ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। পুরাকাল হইতেই সুইডেনের অধিবাসীরা প্রয়োজন ও সৌন্দর্য স্পৃহা মিটাইবার জন্য সৃজনী শক্তি বিকাশের সুযোগ মনোরম দ্রব্যাদি তৈরী করার ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল। বসন্ত ও কার্তিক কারুশিল্পের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানের সফলধারা গভীর ছিল, যাহার ফলে আধুনিক যান্ত্রিক যুগে তাহারা সেই ধারা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সুইডেনের গৃহশিল্পের এই প্রগতি অব্যাহত থাকার

অন্য কারণ, দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান। বাল্টিক ও উত্তর সাগর কর্তৃক সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ইউরোপীয় মূলভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মূলভূমির ইউরোপের সামাজিক প্রভাব হইতেও অনেকখানি মুক্ত। ভিন্ন সুইডেনের জনবসতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। সেইজন্য প্রকৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন জনবসতির অধিবাসীরা আজও স্থানে স্থানে পূর্বপুরুষের প্রথানুযায়ী গৃহে তৈরী বস্তু দ্বারাই আপনাদের প্রয়োজন পূরণ করিয়া থাকে। ইহার অন্যবিধ কারণও বর্তমান আছে। স্থানবিশেষে প্রস্তরময় ভূমি কৃষিকর্মের অনুকূল নহে, মেরুপ্রান্তবর্তী প্রদেশের আবহাওয়া কৃষির প্রতিকূল। সেই সকল স্থানে গৃহশিল্প সমগ্রভাবে জীবিকার জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া লাভজনক। তথায় গৃহশিল্প বহু অধিবাসীর আয়ের বিশেষ উৎস। প্রতি বৎসর (শরৎকালে) সূর্যালোকের অভাব ও শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত কৃষিক্ষেত্রেও কাজ চলে না, সেরূপ ক্ষেত্রে বিকালবেলাটা গৃহশিল্পেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন পরিবারের লোক শীতকালেও বনের কাজ করিয়াও জীবিকার্জন করিয়া থাকেন। সেই সকল পরিবারে অনুষ্ঠিত গৃহশিল্পকর্ম একটা আনুষঙ্গিক আয়ের উৎস। নৈতিক জীবনে ইহার প্রধান সার্থকতা এই যে স্বজনীশক্তিদানকারী গৃহ-শিল্পানুষ্ঠান বহুলোককে অলসতা ও অলসতাজনিত দুশ্চিন্তা বা দুষ্কর্মের হাত হইতে রক্ষা করে। গৃহ-শিল্পের নৈতিক ও ইহার আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক মূল্যের জন্যই অনলেবাহিত নেতৃবৃন্দ ও গভর্নমেণ্টের সম্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সর্ববিধ উপায়ে লোককল্যাণ ক্ষেত্রে গৃহশিল্পের বর্তমান প্রতিষ্ঠা সেইজন্যই সুইডেনে সম্ভব হইয়াছে। বস্তুত ফলের দিক দিয়া সুইডেনে যন্ত্রশিল্পের অসম্ভবসাধারণ উন্নতি সত্ত্বেও গৃহশিল্প বা হোম ইণ্ডাস্ট্রির এই সার্বজনীনত্ব বর্তমানকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার ফলে সুইডেনবাসীর জীবনে গঠনমূলক আদর্শ-বাদের এমন ধারা আসিয়াছে, যাহা মানবসভ্যতার পরিপোষকরূপে সুইডিশ্ সাহিত্যে ও অন্য কলায় রূপ লইতেছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষানৈতিক জীবনে শিল্পশিক্ষের ব্যাপক চর্চা ও সৃজনী শক্তি বিকাশের সুযোগ লাভ করায় গৃহশিল্পও এরূপ ব্যাপক ও মহিমময় রূপ লাভ করিতে পারিতেছে।

গৃহশিল্পের মর্মকথা

গৃহের প্রয়োজনে গৃহশিল্প অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, পরিকল্পিত বস্তু নির্মাণে কর্মীর সমগ্র সৌন্দর্য-চেতনা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতে পারে এবং করেও। সেজন্য যে জিনিসটি তৈরী হয়, তাহা যথাসম্ভব নিখুঁত বলিয়া দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। বাজারে বিক্রয়ার্থ তৈরী বস্তুতে কর্মকুশলতার এরূপ প্রকাশ সম্ভব হয় না। গৃহে তৈরী বস্তু যতকাল টিকিয়া থাকিবে, ততদিন একাধারে কর্মী ও ব্যবহারকারীর যথোচিত মমত্বপূর্ণ ব্যবহার পাইয়া থাকে, যাহা বাজারে ক্রীত বস্তুর পক্ষে সচরাচর সম্ভব হয় না। বস্তুটি সুচারু না হইলে কর্মী তাহা অপরকে অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখাইতেও সংকোচবোধ করে। সেজন্য গৃহশিল্পী আপন সৃষ্টির তাগিদে নিজের সৌকর্য্যবোধ প্রকাশের জন্য লালায়িত হইয়া কর্মবিন্যাসের পুরাপুরি প্রয়োগে কাজ করিতে পারে। ফলে কর্মকুশলতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির চেতনা সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে। নিছক অর্থোপার্জনের জন্য হস্তশিল্পের অনুষ্ঠানে এই সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ কর্মীর জীবনে কাজ করিতে পারে না; সেজন্য বস্তুটি অপেক্ষাকৃত শীঘ্রগ হইতে বাধ্য হয়। কারণ সেখানে ক্রেতার সৌন্দর্যবোধ ও বাজারের চাহিদাই কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। পূর্বেই বলিয়াছি, সম্পূর্ণ জীবিকার জন্য হস্তশিল্পের অনুষ্ঠান একদল লোকের মধ্যে সুইডেনেও আছে। এই ধরণের শিল্পীরা প্রায়শঃ ভূমিবিহীন অথবা

কৃষিকর্মে অপারগ, এবং হস্তশিল্পই তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

অনুসন্ধিৎসু দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুইডেনের জাতিগত গৃহশিল্পের এক বৈশিষ্ট্য। একাধিকবার সমগ্র সুইডেনে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া তথাকার গৃহশিল্প অধ্যয়নের সুযোগ লেখকের ঘটিয়াছিল। সুইডেনের প্রত্যেকটি প্রদেশে স্বকীয় ও স্বাদীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ গৃহশিল্পের ধারা স্বতঃস্ফূর্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপে ডালার্না (Dalarna) নামক সুইডেনের মধ্যপ্রদেশের হোম ইণ্ডাস্ট্রির কথা উল্লেখ করা যায়। ডালার্নার মৌলিক লেসের কাজ, বিশেষ টেক্সটাইলের রঙিন ডিজাইন্, মেঝেতলের পাটকাপড়, কাঠের সুরম্য আসবাব ও গৃহের প্রয়োজনীয় বহুবিধ শিল্পদ্রব্য স্বকীয় রূপবৈশিষ্ট্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দক্ষিণ সুইডেনের স্কানিয়া নামক প্রদেশের গৃহশিল্প। সেখানকার রঙিন পশমের কাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশ যথা ব্লেকিঙ্গে (Blekinge), স্মোলাণ্ড (Smoland), হেলসিংল্যাণ্ড (Helsingland), বহুস্ল্যাণ্ড (Bohusland), ওঙ্গেমারল্যাণ্ড (Ongemarland), প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রদেশই কারুশিল্পের জন্য খ্যাত। মোতালা (Motala), ভাডস্টেনা (Vadstena), সেনিঙ্গে (Seninge) প্রভৃতি মধ্যযুগীয় নগরগুলির চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন লোকশিল্পের সাংস্কৃতিক ধারা আজও প্রবহমান। চামড়া, হাড়, কাঠ, শিং প্রভৃতি বস্তু দ্বারা মেরু প্রদেশবাসী ল্যাপরা যে অপূর্ব শিল্পবস্তু তৈরী করে, তাহা উপযোগীও। সুইডেনের এই ব্যাপক ও বিচিত্র লোকশিল্পের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯১২ সালে তথাকার গভর্ণমেণ্ট একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির বিবরণী হইতে জানা যায় যে একমাত্র পল্লী গৃহের অত্যাবশ্যকীয় শিল্পবস্তু তৈরীর প্রথা দেশের কৃষকসমাজে তখনও অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের কৃষকসমিতি ও হোম ইণ্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন সকলের বিবরণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৃহ-বস্ত্রাদির প্রয়োজনীয় সুতা বহু কৃষক পরিবার নিজেরাই তৈরী করেন এবং বয়ন শিল্পের প্রথা ইহা অপেক্ষাও ব্যাপকতর। বিশেষ করিয়া দেশের অভ্যন্তরস্থ পল্লীগুলিতে আজও গৃহে কাটা সুতায় বুনন বস্ত্রাদি, পোষাক পরিচ্ছদ, মোজা প্রভৃতি তৈরী হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশেই স্বকীয় জাতীয় পোষাক প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পোষাক দেখিলেই বুঝা যায় লোকটি কোন প্রদেশের। সূঁচের কাজ, ঝিনুর কাজ বাদ দিলেও হাতে তৈরী বস্ত্রাদির বাৎসরিক মূল্য কমপক্ষে তের মিলিয়ন ক্রাউন হইতে বলিয়া ধরা যায়। ইহা ১৯১২ সালের কথা, বর্তমানে অর্থের হিসাবে ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গৃহশিল্প যখন অর্থোপার্জনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় তখন ইহার আটিষ্টিক্ গুণ ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করে। কারণ তখন ক্রেতার রুচিকে স্বীকার করিয়া কাজ করিতে হয়। তথাপি হোম ইণ্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন মতের ভাল বলিয়া বেকার লোকদিগকে এ কাজে লাগাইয়া থাকেন। ১৯১২ সালে এরূপ কর্মীর সংখ্যা ৪১,০০০ ছিল এবং তাহাদের তৈরী বিক্রয় লব্ধ অর্থ ১৬ (ষোল) মিলিয়ন ক্রাউনে দাঁড়াইয়াছিল।

বিগত চারিদশক মধ্যে গৃহশিল্প আরও ব্যাপক-রূপ লইয়াছে। সুইডেনে সূত্রকর্তন শিল্পের ইতিহাস কৌতূহলজনক। কলের প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও সূত্রকর্তন লাভজনক গৃহশিল্পরূপে বিবেচিত হইত। গভর্ণমেণ্টও এই শিল্প প্রসারের জন্য উৎসাহ দিতেন। ইহার মূল কারণ ছিল, গৃহজাত সুতা কাপড়ের কলের চাহিদা পূর্ণ করিত। এই শিল্পে লোকের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বহু শিক্ষাকেন্দ্র স্থানে স্থানে স্থাপন করেন। প্রত্যেক মৌজা হইতে নির্বাচিত একজনকে সূত্র কর্তন বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক

প্রথায় শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্ব অঞ্চলে ফিরিয়া বৈজ্ঞানিক সুতাকাটা পদ্ধতি বিস্তারে সহায়তা করিবে। পশমের সুতার জন্য মেষপালনের পথ সুগম করা হয়। কিন্তু এই প্রথা দেশবাসীর মনঃপূত হয় নাই বলিয়া ক্রমে প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কারণ কাপড়ের কলগুলি গৃহোৎপন্ন সুতায় যে হার নির্দেশ করেন, তাহা নগণ্য মনে হওয়ায় কাটুনীদের উৎসাহ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়। উপরোক্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও কলকুল পূর্বাপর একই প্রথায় নিজেদের সুতায় নিজেদের তাঁতের তৈরী কাপড় বাজারে উপস্থিত করিতে থাকে। তবে উৎকৃষ্টতর তাঁতের কাপড় ১৯১১ সালে বাজারে আড়াই মিলিয়ন ক্রাউন হারে বিক্রিত হইয়াছিল। অবশ্য এই হিসাব মধ্যে নিজেদের ব্যবহারের বস্ত্রমূল্য ধরা হয় নাই এবং ইহার মূল্যও কম ছিল না।

আমাদের দেশে বহুদিন কাটুনী প্রথা স্থানে স্থানে অনুসৃত হইতেছে। এই প্রথার ত্রুটি অনেক। কারণ গৃহস্থ বস্ত্রশিল্পের প্রাণই হইল নিজের উৎপন্ন তুলায় কাটা সুতায় গৃহে বা আপন পল্লীর তাঁতীর তাঁতে নিজেদের বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা।

বর্ষিন্ লেস্

বাজারে বিক্রয়ার্থ বর্ষিন্ লেস তৈরীর প্রথা সুইডেনে অত্যন্ত হইতে এ যাবত ডালটেনা, বোত্যলা, লেনিদে প্রভৃতি অঞ্চলে চলিয়া আসিতেছে। কাপড়ের উপর সুরম্য সূত্রের কাজ সুইডেনের অন্তর্গত হাল্যাণ্ড (Halland) প্রদেশে ব্যাপকভাবে বহুযুগ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

পূর্বোক্ত কাঠের জিনিস বাজারে ১৯১১ সালে প্রায় চারি মিলিয়ন ক্রাউনে বিক্রয় হইয়াছিল। কাঠের মামুলী আসবাবপত্র যথা টেবিল, চেয়ার, আলমারী, খাট, বিছানা ইত্যাদি সুচারু কাষ্ঠ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু লোহার কাজ, কুমারের কাজ, তারের জাল, মাছ ধরিবার জাল, জুতা বুট তৈরী প্রভৃতি গৃহজ শিল্পের ধারা অপ্রতিহত গতিতে আজ সমৃদ্ধ হইতেছে। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল শিল্পবিশেষের জন্য প্রসিদ্ধ।

কৃষিজীবিদের কৃষিকাজের স্বাভাবিক অঙ্গরূপে বহুবিধ গৃহশিল্প অনুষ্ঠিত হয়। গৃহশিল্পে নারীদের দাম অসাধারণ, এবং এ ধরণের শিল্পবস্তুর সাকুল্য মূল্য নিরূপণ করাও সহজ নয়।

কলের শ্রমিকেরা এক সময় কারুশিল্প চর্চায় উদাসীন ছিল, কিন্তু শিক্ষাশিল্পের প্রসার ও গৃহ-শিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক সমাজেও গৃহশিল্পের চর্চা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সারা দেশেই শিল্প শিক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। নারীরা এই সকল বিদ্যালয়ে নিজের গৃহের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করিতে শেখে। সম্প্রতিবর্তী কালে এই ভাবে অবসর বিনোদন সহজ হইয়াছে এবং সমাজনৈতিক জীবনে শিল্পচর্চার মূল্য ক্রমেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

বস্তুত গৃহশিল্প (হোমক্রেফ্ট) আন্দোলন দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে বিরাট যুগান্তর আনিয়াছে এবং ইহার পরিচয় দেশের সাহিত্যে দেশবাসীর সৌজন্যে নিরলসতায় ও স্বাবলম্বনের চেষ্টায় সুপ্রকাশমান।

আজ বিশ্বময় 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' রক্ষার বিরাট আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু জাতির জীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা তখনই অর্থপূর্ণ হয়, যখন ব্যক্তি ও সমষ্টির সুকৃচির মান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। শিক্ষাশিল্প, গৃহশিল্প ও পল্লীশিল্পের প্রসার দ্বারা তাহা সম্ভব।

———

শিক্ষাশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ

(শ্রীহারাধন রক্ষিত)

"আমি কবি"—এটাই রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে বড় পরিচয়। সহস্ররশ্মি রবিপ্রতিভার কাব্যরশ্মিই উজ্জ্বলতম। বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আরম্ভ করে লোক সাহিত্যের গ্রাম্য ছড়া সব কিছুই রবীন্দ্রনাথ অপূর্বরূপে অনুশীলন করেছেন। কবি ভারতীয় সৃষ্টি ও সাধনার সার্থক প্রতিনিধি, ওদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলনভূমি রবীন্দ্রমানস।

নবরস সাহিত্য এবং রম্যবোধের কবি রবীন্দ্রনাথ দেশ ও সমাজকে নানা দিক থেকে উদ্বোধিত করার জন্যে বহু প্রবন্ধও রচনা করেছেন।

শিক্ষা মানুষকে তৃতীয় নেত্র দেয় না কিন্তু দিয়ে থাকে তৃতীয় একটি দৃষ্টিশক্তি। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তু সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ খবর সংগ্রহ করিতে পারে।

দিনের আলোর মত প্রয়োজনীয় এই যে শিক্ষা তা আমাদের কতখানি দরকার, কতটুকু আছে এবং আমাদের শিক্ষালাভের কি অন্তরায় সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রচুর সাহিত্যে অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশে শিক্ষার ভুল ব্যবস্থা কবিকে হতাশ করেছে। তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"তে এ আক্ষেপ বার বার ধ্বনিত হয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ ভারতবর্ষ। তবুও রবীন্দ্রনাথ তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর জন্যে সিন্তিত হতে পারেন নি—দেশে শিক্ষা নেই বলে। অশিক্ষাপ্রসূত অগণিত সমস্যা তাঁকে পীড়িত করে তুলল। তিনি দেখলেন, "ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। 'ভারত তবুই ঘুমায়ে রয়' কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি—যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।" তাই তিনি বুঝতে পারলেন,—"মানুষের সকল সমস্যা সাধনের মূলে হচ্ছে তার পুঁথিকা।" সুতরাং মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার শিক্ষাদানে প্রত্যেকেই তিনি শ্রেষ্ঠকাজ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

"আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা।" এই সমস্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষার বাহনটির কথা খুব বেশি করে ভেবেছেন। একে তো শিক্ষার বাহন ইংরেজি, তার উপর বিষয়বস্তু বিদেশী। তাহা শিখতেই যথেষ্ট সময় আমাদের চলে যায়, তারপর অপরিচিত বিষয়বস্তু কোনোমতেই অধিগত হতে চায় না। কেনই বা হবে। অনভ্যস্ত খাদ্য যেমন অতি উত্তম হলেও মুখে রোচে না, তেমনি একান্ত অপরিচিত বিষয় অত সহজে গ্রহণ না করাই মনের পক্ষেও স্বাভাবিক। উপরন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কোনো মিল নেই, নিত্য পরিচিত পরিবেশের ছবি আমাদের পুঁথি-পুস্তকে নেই। "দশটা হতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা-ভাইবন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরং অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায় প্রাণ জোগায় না।" কি দারুণ বৈপরীত্য। বাড়িতে আটপৌড়ে মাতৃভাষায় কথা বলি, মা-ঠাকুরমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনি। অথচ স্কুলে শিক্ষার ভাষা ইংরেজি, বিষয়বস্তু বিদেশী। এতে বিদারুণ ফল ফলে। একদিকে

বিদেশী ভাষা ও বিষয় শিক্ষায় পাই না উৎসাহ, অন্যদিকে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন থেকে হই নির্মম ভাবে বঞ্চিত।

পশুর জীবনে জৈব প্রবৃত্তিই যথেষ্ট। প্রকৃতিদত্ত শক্তি নিয়েই তারা খুশি। সুতরাং তাদের চিন্তা করতে হয় না, কল্পনার দরকার নেই। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিদত্ত সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে তৃপ্ত নয়, তাকে শক্তি বৃদ্ধি করতে হয় প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডার লুট করে। তাই মানুষের "চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" "কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ।...ইংরেজি ভাষের সহিত কিংবা পরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিষ্চেষ্টভাবে থাকে। এণ্ট্রান্স এবং ফার্স্ট আর্টস্ পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি.এ ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রবন্ধ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়—তখন সেগুলা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই—সমস্তগুলা মিলাইয়া এক একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।" এর সঙ্গে আর এক মুস্কিল ঘটে। কবি সে কথাও বলেছেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে চলছে কুস্তি অথচ দৈহিক শক্তিবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা নেই। দুর্বল দেহে সবল মন—আশা করা যায় না, এবং চিন্তাশক্তির বিকাশের প্রচেষ্টা বার্থতায় পর্যবসিত হয়। সুশিক্ষা আর হয় না।

আবার আমাদের শিক্ষা অর্থকরী। প্রতিটি মানুষ হতে, প্রতিটি বস্তু হতে শিক্ষার আলোকে সত্য উপলব্ধির ইচ্ছায় আমরা শিক্ষালাভে ব্রতী হই না। শিক্ষিত হব, কেরানীগিরি মিলবে—এই থাকে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষার জন্যে ব্যস্ততা থাকে না, আমরা ব্যস্ত হই পাসের জন্যে। কবি সুন্দর করে বলেছেন,—"মাষ্টারও বলে, ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ ধারা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই; আপিসে চাকরি জোটে।"

তাই খান কয়েক বই মাত্র কোনোমতে মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস দেবার চেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠে। প্রচুর বই পড়ে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজনবোধ থাকে না এবং সে চেষ্টাও সম্ভব নয়। অথচ "একটা শিক্ষা পুস্তককে গীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক।"

এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের অতি সামান্য সংখ্যক লোকমাত্র শিক্ষা পায়, এতে দেশের সব লোকের অংশ গ্রহণের সুযোগ নেই। তাই প্রচলিত ব্যবস্থায় যেটুকুই হচ্ছে তাও মুষ্টিমেয় কটি লোকের জন্যে। সুতরাং জাতির বিরাট অংশই অন্ধকারে পড়ে।

পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও কবি কঠোর সমালোচনা করেছেন। যার প্রচুর মুখস্থ করার শক্তি আছে সে পাস করে যায়। পক্ষান্তরে ইংরেজি মুখস্থ করতে না পেরে অনেকে ব্যর্থ হয়। তাদের ভালো পাস মিলে না। লুকিয়ে বই নিয়ে পরীক্ষাগারে গেলে বহিষ্কৃত হতে হয়। অথচ মুখস্থ করতে পারলেই পাস। কবি এই পরীক্ষা পদ্ধতিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। "...যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসত্যরকমে চুরি করে অথচ সত্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই।"

শিক্ষার বিশ্ব এবং প্রকৃতির সহিত যোগের বিচ্ছিন্নতা ভীষণ ক্ষতিকর বলে কবি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যে শিক্ষায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট প্রকৃতির সহিত গভীর যোগ থাকে না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। তাতে মানুষের অন্তরে মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত হয় না।

গ্রন্থাগার সমূহ শিক্ষার পদ্ধতি সহায়তা করে তার চাইতে বেশি করে বিরোধিতা—এ কথা কবি উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থাগার বাদে বইতে ভর্তি থেকেই এ অনর্থ সৃষ্টি করে। তিনি বলেন,—"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহার-যোগ্য অন্ত চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে।" তাঁর মতে গ্রন্থাগার ছোট হবে। "তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে কিন্তু একেবারে চোখা বই।" তাই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর কবি খুব জোর দিয়েছেন।

মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই সব নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সমাধানের কি উপায় নির্দেশ করেছেন তা' এবার দেখা যাক।

এই সম্পর্কে গোড়াতেই তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষা করার জন্যে জোর দিয়ে বলেছেন। এরপর ছাত্রকে অন্য ভাষা শিখতে তিনি আপত্তি করেন নি বরং উৎসাহই দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে যাদের অন্য ভাষা আয়ত্ত করার শক্তি নেই তারা যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তাই তিনি চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যাদের সামর্থ বেশি তারাই বিভিন্ন ভাষা শিখে সে-সব সাহিত্যের সম্পদ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে আমদানী করবেন এবং দেশের লোক মাতৃভাষার মাধ্যমে তা' জানবে। জাপানীরা কি করে মাতৃভাষার বিশ্বসাহিত্য ও বিজ্ঞানের সব কিছুকে নিজের করে নিয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলায় প্রচুর শিক্ষাগ্রন্থ নেই। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন—"বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।" "এমনি করিয়া বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মত মিলিয়া যায় তবে বাঙালী বিদ্যার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।" কিন্তু হায়, আজও তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অন্যত্র থাক, কবির বিশ্বভারতীতেও তা হল না। এর চাইতে আপশোসের কথা আর কি আছে। তবে ভরসা এই যে সারা ভারত জুড়ে এই চেষ্টা সুরু হয়েছে।

সর্বাঙ্গীন শিক্ষার কথা কবি বহুস্থলেই বলেছেন। সর্বাঙ্গীন শিক্ষা তাকেই তিনি বলেছেন যাতে অংশবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও বিকাশ হয়। সেই শিক্ষাতে বাস্তবের সহিত পরীর যোগ থাকবে। দেশ, সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষা থাকবে ওতপ্রোত, শুধু পুঁথিতে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। জ্ঞানের সহিত কর্মের নিবিড় যোগ না হলে তা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা হবে না। "কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে এদের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।" "ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি নিয়মরক্ষা, যাহাতে সামাজিকতা বুদ্ধির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন; আপৎকর্মে অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার আনুকূল্যে তৎপরতা; স্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে জাগরূকতার বিকাশ সাধন; সত্য সমাজে লোকহিতের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে সকল নূতন প্রচেষ্টার প্রবর্তন ঘটিতেছে সে-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ;—এইগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ। সংক্ষেপতঃ, মনে ভবনে ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রেরা মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই সত্য হইতে পারে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিজেদের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন, ছাত্রদিগকে হাতে কলমে তাহাই বুঝাইতে হইবে।" "জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে মানি কিন্তু রসের প্রাবল্যকে মানিনে। তার সঙ্গে কঠিন

সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে।... নির্মল আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা বিশুদ্ধ অন্তরমন নিয়ে সৌন্দর্য সম্ভোগ করো তেমনি মানবসমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ঔৎসুক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং আপন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করো।" "দেখিতে হইবে, আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন কি বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উহার বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত শুষ্কপাক অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।" "তাই আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সমস্ত সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন হবে যাতে জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সব কিছু সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকে। যাতে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অর্থাৎ স্বাবলম্বন শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হবে। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিতও শিক্ষার যোগ রক্ষা করতে হবে, "অগ্নি বায়ু জল-স্থল বিশ্বকে বিদ্যালয় দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।"

এই সর্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্যে কবি তপোবন বা আশ্রমে আবাসিক শিক্ষাপদ্ধতির উপরই খুব জোর দিয়েছেন। এই আশ্রম বা তপোবনের প্রধানবস্তু হবে আনন্দময় স্বাধীন পরিবেশ। রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের এই চিন্তা পাশ্চাত্যের Play Way of Education-এর সঙ্গে হুবহু এক নয়। "রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের মূলতত্ত্ব হইতেছে স্বাধীনতা ও আনন্দের দ্বারা দিয়া শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মোচন (রবীন্দ্র জীবনী)।" "সেইজন্য ছেলেদিগকে শিশুকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।" অবশ্য "ব্রহ্মচর্য পালন বলিতেই যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে।" "ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার ক্ষেত্র নয়।" "এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই।" এখন এ তপোবন বা আশ্রমের স্থান কিরূপ হবে—তাও কবি বলেছেন। "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।...যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক;...ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের সহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।" দৈহিক এবং মানসিক শিক্ষার উপর কবি সমভাবে জোর দিয়েছেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সফলতার সঙ্গে মনের সফলতার যোগ আছে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঔষধের মধ্যে ভালোরকম বিষ করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়।" এখন এ দৈহিক শিক্ষার উপায় কি হবে সে একটি প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ খেলাধূলার উপর এইজন্যে বেশি জোর দেন নি। তিনি বলেন—"দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা

যেসব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুবিকশিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।" গান্ধীজি যে শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বহু আগে থেকে ভাবছিলেন এবং যাকে আমাদের জীবনে বাস্তব করে তুলতে চেয়েছিলেন সে-শিক্ষার সূত্র রবীন্দ্রনাথে। স্বামীজির Man-making Education-এর চিন্তাও অনুরূপ। দেহ ও মনের সমতাল শিক্ষা সম্পর্কে বাপুজী বলেছেন,—"The principal means of stimulating the intellect should be manual training." এই প্রসঙ্গে দামবীর মহেশচন্দ্রের কথাও মনে পড়ে। তাঁর গ্রামমালা ছাত্রাবাসে আজও স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়েই ছাত্রদের শিক্ষা চলছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকরা সর্বপ্রধান—এ বিষয়ে আশা করি কেউ দ্বিমত করবেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্ররা শিক্ষকদের জীবনাদর্শ ও চরিত্র দ্বারা প্রকৃতরূপে প্রভাবান্বিত হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং শিক্ষকদের কিরূপ হতে হবে শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে সেটি একটি বড় প্রশ্ন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট চিন্তা করেছেন। ছাত্রদের স্বাবলম্বন ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের উপর কবি খুব জোর দিয়েছেন—তা আগেই বলেছি। এখন এই স্বাবলম্বন ও অনাড়ম্বরতা ছাত্ররা শিখবে কোত্থেকে। এ'ত গাছের ফল নয়, টুপ করে মাটিতে পড়বে। এইরূপে ছাত্রদের গড়ে তুলবার জন্যে শিক্ষকদের রীতিমত সাধনা দরকার। তাঁরা জীবনে হয়ে উঠবেন সরল, স্বাবলম্বী ও অনাড়ম্বর। একদিন ভারী আসেনি বলে যে শিক্ষক জলের জন্যে হায় হায় করে বেড়ান, সে শিক্ষকের কাছে স্বাবলম্বন ও অনাড়ম্বরতার আদর্শ অন্বেষণ কি অরণ্যে রোদন হবে না! শিক্ষকদের স্বরূপ সম্পর্কে কবি বলেছেন,—"এখানে (শান্তিনিকেতনে) এমন সকল মহত্তম হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইএর সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিস্তারিত্বারে, যাঁদের প্রেরণা শক্তি সহযোগী-মণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।" বিচার্য বিষয়, আজ আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষক দু'চার জনও আছেন কি না। আমরা গড্ডলিকা প্রবাহেই ত' ভাসিয়ে দিয়েছি আমাদের জীবনতরী। খেয়ালও নেই কখন ভরাডুবি হয়ে যাবে।

খুঁটে খুঁটে বছরে দু'তিন খানা বই না পড়ে ডিঙিয়ে অনেক বই পড়ার ব্যবস্থার কথা কবি বলেছেন। আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী প্রসঙ্গে জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠির অংশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাতে তিনি বলেছেন,—আমার মনে হয়েছে এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা বই পড়াবার দিকে একটু ঝোঁক দিয়েছি। আমরা একদিকে যেমন ইংরাজি সোপান, সংস্কৃত প্রবেশ প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে ধাকে ধাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিত, অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ—একেবারে বেশি তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই—তাড়াতাড়ি কোনমতে কেবলমাত্র মানে করে এবং আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ রকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা নয়, কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিবর্তনটা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে।"

এর পর কবি বলেছেন যে, সংস্কারমুক্ত হয়ে সব কাল, সব দেশ ও সকল সাহিত্য থেকে সত্য সংগ্রহ করে শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠু করে তুলতে হবে। প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতা, প্রাচ্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে যে সত্য সাহিত্য গড়ে উঠবে তাই হবে আমাদের জীবনের

প্রয়োজন নিটাবার শিক্ষা। প্রাচীন কালের বোলে যা বিদেশী বোলে কোন সত্যকে শিক্ষায় বা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই অবজ্ঞা করা বুদ্ধির কাজ নয়। "যা সত্য তার জিম্মোগ্রাফী নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়।" তাই "বাহ্যান্তের অনুনিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।" "এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে।"

অর্থকরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃত শিক্ষার পথে অন্তরায় হলেও কবি জীবিকার সমস্যাকে শিক্ষা হতে একেবারে বাদ দিয়ে নিঃসীম ধ্যানলোকের তুরীয় আদর্শবাদের বোহাই পাড়েন নি। তাঁর শিক্ষা দর্শনে জীবন এবং জীবিকা মিলে একটা সত্য দৃষ্টি রূপ লাভ করেছে। পরে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করছি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের কোনো তারতম্য নেই। তাদের জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মক। এই নীতি জাতিবিধ্বংসী। সুতরাং একই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা অভিপ্রেত—এটা কবির মত। "ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু লইয়া কেহ জন্মায় না।" সহজ ধনীর ছেলে যথেষ্ট চেষ্টাতেও মানুষ হয়ে উঠেনি সেরূপ নজিরের অভাব নেই। সুতরাং এক ছাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় এবং দেশের সকল লোক যাতে করে শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সকল লোক সমভাবে শিক্ষিত না হলে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হয়। একে তো উৎকট জাতিবিদ্বেষী জাতিভেদ শক্তভাবেই আস্তানা গেড়ে বসে আছে আমাদের সমাজে। কিন্তু "দেশে সকলের চাইতে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই —শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।" 'শিক্ষার বিকীরণে' তিনি বলেছেন, "আমার আজকের আলোচ্য বিষয় সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছায় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা।" কবি বার বার সরকারের কাছে, জনগণের কাছে এই আবেদন করেছেন। সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে দেশের কি চেহারা হয় তা তিনি দেখে এসেছিলেন রাশিয়ায়।

শিক্ষা সমস্যাগুলো কবি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সে-সবের সমাধানের সুচিন্তিত পন্থাও নির্দেশ করেছেন। এতেই তাঁর কাছে সমগ্র জাতি চিরঋণী হয়ে থাকত। কিন্তু আরও বড় জিনিস তিনি করলেন ব্যক্তিগত জীবনে ভারতবাসীর জন্যে আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা করার চেষ্টা করে—শান্তি-নিকেতনে। এবার আমরা দেখব শান্তিনিকেতনে কিরূপ শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে তিনি দেশ ও জাতির মধ্যে সত্যের আলো বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন; তা কতটা সার্থক হয়েছে এবং দেশ কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে।

গোড়াতেই আমাদের দেখা উচিত কেন শান্তি-নিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। কবি বলেছেন,—"আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম—জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি।" ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই কবি বিচার করছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শগগনে, তপোবনে। তাই ১৯০১ সনে একদিকে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা অন্য দিকে নৈবেদ্য রচনা। সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় পারিপার্শ্ব ও অনাড়ম্বরতার সম্পর্কে কবির দৃঢ় বিশ্বাসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম নিয়মাবলী কবির 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। তাতে পারিপার্শ্ব এবং অনাড়ম্বরতাকেই তিনি প্রধান স্থান দিয়েছেন। আর এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও উদার প্রান্তরে মুক্ত আকাশের নীচে শ্যামলা প্রকৃতির

নিবিড় সান্নিধ্যেই। শান্তিনিকেতনে তিনি এমন শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন—যাতে জ্ঞান আহরণই উদ্দেশ্য থাকবে।

এই শিক্ষায় পরীক্ষা পাসটা প্রধান নয়। ১৯০৪ সালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে কবি বলেছেন,—"এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।" "যাহাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও বস্তু পরিচয় বটে আমাদের আশ্রমে ছেলেদের সেই রকম শিক্ষা দিবার জন্য বহুকাল হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।" সর্বপ্রথম ১৯১৯ সনে বিশ্বভারতীর যে প্রসপেক্টাস প্রণীত হয় তাতে আছে, "The system of examination will have no place whatever in the Visva-Bharati, nor is there any conferring of degrees. Students will be encouraged to follow a definite course of study but there will be no compulsion to adopt it rigidly." তারপর যখন পরীক্ষা প্রথা প্রচলিত হল তখনও পরীক্ষাপদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। "ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে কী স্বাধীনতা ছিল, তাহা বর্তমানে কল্পনাতীত। পরীক্ষার স্থানে 'পাহারা' বসানোর রীতি আশ্রমে ছিল না; ছাত্রদের আত্মসম্মানে আঘাত করার অর্থ তাহাদের ব্যক্তি পুরুষকে অপমান করা। ছাত্ররা পরীক্ষা পত্র লইয়া যেখানে সেখানে বসিয়া পরীক্ষার উত্তর লিখিত। নীচের ক্লাশের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপরের ক্লাশের ছাত্রেরা সাইক্লোস্টাইল করিয়াছে কিন্তু প্রশ্ন 'out' হইয়াছে এ কথা তখনও শুনা যাইত না।" এই প্রসঙ্গে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের কথা মনে পড়ে। তিনিও তাঁর প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ পরীক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করে আশাতীত রূপে কৃতকার্য হন।

এই শিক্ষাদর্শকে সার্থক করার জন্যে কবি নিজে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর শিক্ষকতার পদ্ধতি ছিল অপূর্ব অভিনব। এই সম্পর্কে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় "বিশ্বভারতীর অঙ্কুর" প্রবন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন,—"সন্ধ্যার পূর্বে ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিত। সন্ধ্যার পর সংগীত, আবৃত্তি, গল্প প্রভৃতি। ছাত্রগণকে অনুমানে পারদর্শী করিবার অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন দেখিলাম, ছোটো বড়ো ভাঙা ইট আনাইয়া একস্থানে রাখা হইয়াছে। ইটগুলি কি হইবে জিজ্ঞাসা করাতে কবিবর বলিলেন, 'এখনই দেখিতে পাইবে।' খেলিবার ছুটি হইলে কবিবর ছাত্রদের লইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন এবং একজনের পর একজন ছাত্রকে ডাকিয়া এক একখানা ইটের ওজন কত হইবে ছাত্রদিগকে আন্দাজ করিতে বলিলেন। ছাত্রগণ বলিল, তিনি তাহা একজন শিক্ষককে লিখিতে বলিলেন। তারপর একখানির পর একখানি ইট তৌলদাঁড়িতে ওজন করিয়া ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যে ওজন অনুমান করিয়াছিল তাহা প্রকৃত ওজন হইতে কত তফাৎ। অন্য একদিন দেখিলাম, তিনি একটি বল ঘুরে ছুঁড়িয়া সেটা কতক্ষণ ঘুরে পড়িল তাহা ছাত্রগণকে অনুমান করিতে বলিলেন এবং পরে গল্পের ছারা মাপিয়া দেখাইলেন যে, প্রকৃত ঘুরত্ব হইতে তাহাদের কথিত আনুমানিক ঘুরত্বের পার্থক্য কিরূপ। এইরূপে তাঁহার অনুমান, ঘুরত্বের অনুমান, সময়ের অনুমান সম্বন্ধে ছাত্রগণের একটা ধারণা হইত।" এরূপ আদর্শ মানুষ তৈরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠার কবি প্রাণপণ চেষ্টা করে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এর পিছনে তাঁর সাধনা কত বড় তা অনুমান করাও কঠিন। এ আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় তীব্রতম শোক-দুঃখের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তাঁর মনের উপর দিয়ে, চলার পথ ছিল দুর্গম। দারুণ অর্থকষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী নিজের গহনা বিক্রি করে কবিকে অর্থসংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই আর্থিক কষ্টের চাইতেও বড় কষ্ট এল মৃত্যুর তাণ্ডবরূপে।

১৯০২ সন থেকে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আরও কয়েক প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ ঘটে। কিন্তু আশ্রমের কাজ করি নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যক্তিগত দুঃখকে উপেক্ষা করেছিলেন সমগ্র দেশ ও জাতির দুঃখ চিন্তা করে।

কিন্তু করি আশানুরূপ সার্থক হতে পারলেন না—শান্তিনিকেতনে। অচিরেই শুরু হল প্রতিক্রিয়া। প্রভাতবাবু এই সম্পর্কে বলেন যে, করি তাঁর কল্পিত শিক্ষাদর্শকে শান্তিনিকেতনে সার্থকরূপে রূপ দিতে পারেন নি। "শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ এবং ছাত্রদের অভিভাবকগণই ছিলেন ইহার বাধা।" শিক্ষকরা চাইতেন গতানুগতিক নিয়মে শিক্ষা দিতে আর অভিভাবকরা চাইতেন—তাঁদের ছেলেরা এমন শিক্ষা পাবে যাতে তারা তালভাবে পাশ করে ডিগ্রি পায় এবং তাদের ভাল চাকরি জুটে। তাই করি বলেছেন,—"Therefore it is not possible to give them the ideal kind of education." "The tradition of the community which calls itself educated, the parents' expectations, the upbringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University were all over-whelmingly arrayed against the idea I had cherished." তাই পরীক্ষা পাস নিরপেক্ষ সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের জন্যেই ১৯২৪ সনে শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশবৎসরাধিকাল চেষ্টার পর করি আবার তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন 'শিক্ষাসত্রে'। প্রভাতবাবু এই প্রসঙ্গে বলেন,—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধনী বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; তাহারা সকলেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকে, উচ্চেস্ত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা। তাহাদের পক্ষে রন্ধন করা, জলতোলা, বাগান করা, হাটবাজার করা সম্ভব নহে। শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা দরিদ্র ঘরের ছেলে—পরীক্ষায় পাশ করার কথা তাহাদের মনে আসে না।" করি বলেছেন, —"I had to start a parallel school where the villagers who do not have ambitions for finding Government employment in merchant offices come and join. There I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education. Before long, the village school will be the real school, ideal school, and the other one will be neglected." শিক্ষাসত্রের কার্যে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন ভারত-বন্ধু এলমহার্স্ট ও সন্তোষ মজুমদার। শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা সব কাজ নিজহাতে করত। শান্তিনিকেতনের কর্মবিমুখ ডিগ্রিলোভী ধনী ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের কর্মধারার ভিন্নতা হেতু ১৯২৭ সনে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনের স্কুল ভেঙে দিলেন না। তাঁর আদর্শবাদ বাস্তবের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা লক্ষণীয়। করি বাস্তবজীবনের কর্মধারার সঙ্গে শিক্ষার যে সম্পর্কের উপর যতই জোর দিয়ে থাকুন না কেন, তিনি সংস্কৃতি ও শিল্পকে শিক্ষা থেকে বাদ দিতে পারেন নি এবং সে-ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তাই শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন শিল্পচর্চার আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষাসত্রেও সংগীত ও চিত্র ইত্যাদি শিল্পচর্চার ব্যবস্থা ছিল। করি বলেছেন, "...সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।"

শিক্ষাসত্রের আদর্শের সহিত মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষার অনেক মিল আছে। গান্ধীজী এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন যা হবে মানুষের "Insurance against unemployment." রবীন্দ্রনাথও শিক্ষার্থী সম্পর্কে বলেন,—He must be so equipped as no longer to be anxious about his own self preservation. গান্ধীজীর অনেক পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এই বুনিয়াদী ধরণের মানুষ তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থার চেষ্টা করেন। আজ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতিকে অবলম্বন করেই সারা ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে।

এখানেই করির সার্থকতা। তাঁর কল্পনা আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে।

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : ভাদ্র, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ১৪৫

শিক্ষা সংকট ১৪৭

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

জাতিপুঞ্জের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ১৫৫

শ্রীঈশ্বর ঘোষ

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কল্পিত্ব্ তুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৬৬ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষায় ভাদ্র মাস :

ভাদ্রমাসে এবার সেই কাঠফাটা রৌদ্র নাই। এবার শুধু জল আর জল। শ্রাবন এবং বর্ষণ এমন যে বড় বড় সহরে রাস্তায় জল দাঁড়াইবার কথা বলিতেছি না, তাহা তো শহরের অভিশাপের অঙ্গভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রাস্তার জলে মানুষ ডুবিয়া মরে, বনেদী বাড়ি চাপা পড়িয়াও মারা পড়ে—ভাদ্রমাসে ঘোর বর্ষা! আমরা জানিতাম, বাংলা দেশে বর্ষাকালের পর ভাদ্রমাসে প্রচণ্ড রৌদ্রের দরুণ বিদ্যার্থীরা কাজে লাগাইতেন তাঁহাদের পুঁথিপত্র বই রৌদ্রে দিয়া। অত প্রবেশে দেওয়ালি বা ঐরূপ কোনও পর্বোপলক্ষে ঘর দরজা পরিষ্কার করিয়া কোথাও বা শিশুদের খেলনা সাজাইয়া সাধারণ পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু এবার ভাদ্রমাসে শুধু জল আর জলে বিদ্যার্থীদের অনধ্যয়ন তো বটেই, তা ছাড়া ইহাতে তাহাদের নিয়মিত পুস্তকাদি রৌদ্রে দিবার বার্ষিক ব্যবস্থাও ওলটপালট করিয়া দিল। তার সঙ্গে সঙ্গে বন্যা, শুধু নদীর জলের নয়, ছাত্রমহলে অসন্তোষ ও অশান্তির বন্যাও বটে। শিক্ষার পরিবেশ কবে অনুকূল হইবে, কে জানে।

"শিক্ষকে"র বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি :

ভাদ্রের "শিক্ষকে" বুনিয়াদী শিক্ষার সম্পূর্ণ রূপ জানিবার কৌতূহলী মনোভাব দেখিয়া ভাল লাগিল। এযাবৎকাল আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার নামেই বিরূপ মনোভাব দেখিয়া আসিতেছি। বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধী মার্কা শিক্ষা বলিয়াই ভাল, তাহা নহে; ইহা শুধু কৃষিজীবিরই উপযোগী, এবং বিশেষ করিয়া শরণার্থীদের জন্য পরিকল্পিত ও কিছুটা নিম্নমানের শিক্ষা, তাহাও নহে; কিন্তু বিশিষ্ট শিক্ষাশাস্ত্রীদের কাহারও কাহারও অনুমোদিত, এবং সকল শিক্ষা সংস্কারের ন্যায় ইহাও যে পরীক্ষাধীন, এবং নিখিল ভারতের শিক্ষানীতিরূপে বিবেচিত হইবার উপযোগী, সেই কথাই বলিয়া আসিতেছি। এজন্য যেখানে ভালভাবে অর্থাৎ প্রাণপণে এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা চলিতেছে এমন বিদ্যালয়ের সন্ধান লওয়া কর্তব্য। হাতের কাজকে মাধ্যম করিয়া চালাইতে গেলে হাতের কাজ

সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার তাহা পরীক্ষকদের অবশ্যই চাই। নতুবা তাঁহারা এ বিষয়ে সুবিচার করিতে পারিবেন না। শুধু নাম বদলাইয়া রাতারাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করিলে সুবিধা নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সুতাকাটা ও চরকা চালানোর উপর জোর না দিয়া বরং তাঁতের উপর, বোনার উপর জোর দিলে, তাহাই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিলে অনেক ভাল হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার এরূপ পরীক্ষারও দরকার বড় নাই। "শিক্ষকের" সদিচ্ছাকে তাই আমরা অতিমাত্রিত করিতেছি।

"শিক্ষা-সংকট":

আমরা বর্তমান সংখ্যায় সুলেখক শিক্ষানুরাগী ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের পুরাতন একটি লেখা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতের দিকে ইহা আলোকপাত করিবে, এরূপ আশা করি। 'প্রবাসীর' সৌজন্যে ইহা সম্ভব হইল। আমাদের এইরূপ আরও পুরানো লেখা—যাহার বিষয়বস্তু পুরানো হয় নাই—একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে শিক্ষকের ও শিক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিদের সুবিধা হইত। কিন্তু একাজ কে করিবে?

শিক্ষা-সংকট*

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সেদিন গোবরডাঙ্গায় গিয়াছিলাম। নেতাজীর জন্মদিন উৎসব। এই সুযোগে নানা লোকে নানা রকম প্রচারকার্য চালান। ঐখানকার সভায়ও কেহ কেহ এই সুযোগ লইতে ছাড়েন নাই। এক বক্তা তাঁহার সাম্প্রতিক চীনভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিলেন। সেখানকার সবই ভাল। অল্প সময়ে এত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে সেখানকার রাষ্ট্র যে, তিনি এবং তাঁহার মত আরও অনেকে, যাঁরা তাঁহার সঙ্গীরা অবাক্ বনিয়া গিয়াছেন! তবে উক্ত বক্তা নূতন চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা যাহা বলিলেন তাহা বাস্তবিকই মনে লাগিল। চীনে যে শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে তাহা ভাল কি মন্দ, কি মন্দের ভাল কিছুই বলিতেছি না, তাহা বলিবার অধিকারও হয়ত আমার নাই। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ স্বল্পকালের ভিতর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নূতন যুগের নূতন বাণী অনুগত করাইতে সক্ষম হইয়াছেন শুনিয়া খানিকটা ভূয়োদর্শন হইল। আমরা এখানে কি করিতেছি? আজ সাত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল—জাতির ভবিষ্যৎ কিশোর ছেলেমেয়েদের ভূমিকা তথা জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে? প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আজ এই প্রশ্ন। পিতা-মাতা, অভিভাবক-অভিভাবিকা আর কি করিবেন, তাঁহারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যায়কত ছেলেমেয়েদের কি ভ্রান্ত পথেই না চালনা করিতে বাধ্য হইতেছেন।

আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা-গবেষণায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। এই ঘুঁচড়াতেই নূতন শিক্ষার প্রবর্তন, কলিকাতায় নয়। পাদ্রী ব্লবার্ট মে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রচার ছাড়িয়া নূতন ধরণের পাঠশালা স্থাপনে মন দিলেন—ঘুঁচড়ায় ও তার আশেপাশে। এ সব পাঠশালা ছিল বাংলা শিক্ষার পাঠশালা। পরে কিছু কিছু ইংরেজী শিখাইবারও ব্যবস্থা হয় এখানে। মুখ্য ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে কিন্তু কলিকাতাই অগ্রণী, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহার প্রথম স্থান। আজকাল এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সংবাদিকও আছেন,—বলিয়া থাকেন বাঙালী কোন বিষয়েই অগ্রণীত্বের দাবি করিতে পারেন না—কি শিক্ষায়, কি দাতব্যসমিতি প্রতিষ্ঠায়, কি রাজনৈতিক প্রচেষ্টায়। তাঁহারা এরূপ দাবির মধ্যে নাকি প্রাদেশিকতার গন্ধও পান! আমরা প্রাদেশিক-ভাবাপন্ন, প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট—কয়েক বৎসর যাবৎ এই কথা শুনিতে শুনিতে নিজেদের যেন এইরূপ ভাবিতেই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইতেছি। অনবরত মিথ্যাপ্রচারের এমনই মাহাত্ম্য।

যাহা হউক, শিক্ষা-ব্যাপারে আমরা কখনই পশ্চাৎপদ ছিলাম না। শত শত বৎসর ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণ, স্বার্থ ও ধর্মান্ধদের অত্যাচারে—নানা বিপদ-আপদের মধ্যেও ভারতবাসী শিক্ষার পুঁথি আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের প্রতি ভারতবাসীর স্বাভাবিক প্রীতির কথা শত্রু-মিত্র অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে

* প্রবাসী ১৩৫০ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে প্রবাসীর সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত

হইবে। আমরা কখনও নূতনকে ভয় করি নাই। নূতনের আহ্বান সাগ্রহে শুনিয়াছি, দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী যাচাই করিয়া যতটুকু লইবার লইয়াছি, যতটুকু বর্জন করিবার, ছাড়িয়াছি। ভারতবর্ষের মাটিরই এই গুণ।

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগেও এইরূপই ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। তখন শিক্ষায়—বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় রাষ্ট্র গ্রহণ না করিলেও আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ নিজ নিজ সন্তানকে ইংরেজী শিক্ষাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যবস্থাও করিতেছিলেন। ইংরেজী শিখিলে রাজ-সরকারে চাকরি পাইব—এ বোধ আমাদের মধ্যে জন্মে মোটামুটি ১৮৩৫ সনের পর হইতে। ১৮৪৪ সনে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় এই বোধ সম্পূর্ণ পাকা হয়। ইহার পূর্বে নহে। হার্ডিঞ্জের ঘোষণার ত্রিশ বৎসর আগেই যে এদেশে বাঙালীদের মধ্যে নব্য-শিক্ষার আয়োজন হয় তাহার তাগিদ ছিল দুইটি—এক : ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সহযোগিতা করা; দুই : পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়লাভ। তখনকার সমাজ আমাদের নিকট যে রকম চিত্রিত, তাহাতে শেষোক্তটি সম্বন্ধে স্বতঃই মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে—সে যুগের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের বর্ণনা পাঠ করিলে একথা বুঝা আদৌ দুরূহ নয় যে, তখনও নব নব বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন-স্পৃহা আমাদের মন হইতে লোপ পায় নাই। হিন্দু কলেজ স্থাপনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম সিনেটের সভার (১৪ মে, ১৮১৬) কথা স্মরণ করা যাক্। সভায় প্রস্তাবে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, সভা-আহ্বানকারী সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের হাতে একটি ফুল দিয়া বলিলেন—প্রাচ্য-বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ একটি গ্রহণ করুন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার সার্থক অনুশীলন ও বিনিময়ের দ্বারাই এই ফুলটি উপহার দেওয়া হইয়াছিল। সামান্য ঘটনা। কিন্তু ইহার মধ্যেই ভারতবাসীর নূতন নূতন বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ-স্পৃহার পরিচয় মিলে।

সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য শুধু প্রসারিত নয়, ক্রমে একেবারে দৃঢ়মূল হইল। এরূপ বিরাট রাজ্য শাসনে বিস্তর লোক দরকার। আবার ইংরেজী-জানা লোক বেশী প্রয়োজন। কারণ ইংরেজের ভাষা না বুঝিলে তাহাদের মতানুবর্তী হইয়া কাজ চালাইবে কিরূপে? ১৮৩৫ সনে স্থির হইল শিক্ষায় বাহন ইংরেজী, ১৮৪৪ সনে প্রচারিত হইল ইংরেজী-জানা লোকেই সরকারে বেশী গৃহীত হইবে। সরকার বা রাষ্ট্র নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে অভিনিবিষ্ট হইলেন। এখানে বাংলাদেশের কথাই বিশেষ করিয়া জানা যাইবে। কারণ সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল এই কলিকাতা নগরী। এখান হইতেই সকল বিধি-বিধান প্রচারিত হইতেছিল। শিক্ষা-বিষয়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রধান জেলা-শহরগুলিতে কোন কোন স্থলে কলেজ,—যেমন হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, পাটনা প্রভৃতি, আবার বহু স্থলে ইংরেজী স্কুল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। ১৮৫২ সনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের, মায় দিল্লীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইত এই কলিকাতা নগরী হইতে। ইহার পর ১৮৫৭ সনে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও—(আধুনিক পরিভাষায়) সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা নিয়োগ দ্বারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতম শিক্ষা সাক্ষাৎ ভাবে নিয়ন্ত্রণে সরকার মনোযোগী হইলেন। কখনও প্রাথমিক শিক্ষা কখনও মাধ্যমিক শিক্ষা, আবার কখনও উচ্চতম শিক্ষার উপর ঝোঁক দেওয়া হইল। কখনও বা একটির প্রসারকল্পে অন্যটি সঙ্কুচিত করিতে সরকার প্রয়াস পান। কমিটি কমিশন কতই না বসানো হয়।

শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে মধ্যে পরিবর্তনও সাধিত হয় পাঠ্য বিষয় বদলাইয়া—প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া। এইরূপে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বহুতর বাঁক ঘুরিয়া আমরা যা-হোক একটা মানে উপস্থিত হইলাম। ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা লব্ধ হইল ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে।

৩

আমরা এখন সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ, নূতন দায়িত্ব এবং নব নব কর্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছি। পরাধীন অবস্থায় বিদেশী রাষ্ট্র যারা যে-যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা মূলতঃ নিরাকৃত হইয়াছে। এখন আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইবে। এই যাত্রাপথে সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতিই আমাদের জীবনে রস ও রসদ পরিবেশন করিবে। কিন্তু সেই সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতি—যাহা হইবে নূতন পরিবেশে নবজাতীয়তা তথা সত্যকার মনুষ্যত্ব-বোধ উন্মেষের সহায়ক, তাহা কি বস্তু? এই বিষয়ে পথ-নির্দেশের পক্ষে আবার একটু পুরনো ইতিহাসের খাতা উল্টানো আবশ্যক। ব্রিটিশ আমলে, আধুনিক যুগে 'জাতিভেদ' বা ইংরেজী 'Caste system' কথাটির খুব চল। এই কথাটির দ্বারা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সত্যকার রূপ আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না, ইহার দ্বারা আমরা বুঝি—সমাজের শ্রেণী বা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য, বিভিন্নতা, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু ভারতীয়—যাহাকে আমরা হিন্দুও বলিতে পারি—সমাজ-ব্যবস্থা বড়ই ঐতিহ্যিক। এই ব্যবস্থার যখন সুত্রপাত হইয়াছে তখন নিয়ন্ত্রণকারী বা বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বেদাদির আবির্ভাব কালেও যে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সূত্র-শ্লোকাদিতে ধৃত বিষয়াদিসমূহ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐতিহাসিক যুগে—বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত অনেকে সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি বা সংস্কারসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল সমাজ-ব্যবস্থা যুগে যুগে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়া বরাবরই অটুট ছিল, আর এইজন্যই বহু সহস্র বৎসরেও—যখন অন্যান্য দেশের বিভিন্ন সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া কতকগুলি নিদর্শন বা স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে তখনও—টিকিয়া রহিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মূল ধারক ও বাহক এই সমাজ-ব্যবস্থা। এমন একটি ব্যবস্থাকে 'জাতিভেদ' বলিয়া অসম্মান করিবেন না, অবজ্ঞা দেখাইবেন না।

৪

কিন্তু ইংরেজ আমলে আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থার মূলে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। ইংরেজ ইচ্ছা করিয়াই যে একার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্যে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়, প্রথম যুগে তাহার দ্বারা প্রভূত লাভবান হইয়াছে ব্রিটিশ জাতি। বিজ্ঞানের সহায়ে তাহারা পররাজ্য জয় করিয়াছে, অধীন রাজ্য হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিয়া যন্ত্র-সাহায্যে পণ্য উৎপন্ন করিয়াছে, এই পণ্য পুনরায় অধীন রাজ্যসমূহে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ শাসন ও শোষণের ফলেই যে তাহাদের এত সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সে কথা সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে বহুবার বহু রোম্য ব্যক্তি দর্শাইয়াছেন। ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থাকে তাহাদের এই শাসন ও শোষণকার্যের উপযোগী করিয়াই তৈরী করিয়া লয়। এদেশে যে শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন হয় তাহাতে শাশ্বত সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

তবে একটি কথা এখানে অবশ্যই বলিতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা এযাবৎ শুধু ব্রাহ্মণ এবং সংশবিশেষে শুধু বৈশ্যশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নূতন ব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমে সংস্কৃত অন্যতম অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য হওয়ায় তাহার দ্বার আপামর-সাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত হয়। সংস্কৃত-শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিল। নূতন ব্যবস্থায় এইটিই পরম লাভ। কিন্তু ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা জাতির অন্তর্দেশে বিষম আঘাত হানিয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতম শিক্ষা একই ছাঁচে ঢালায় সমাজে একই রকম জীবের আবির্ভাব হইয়াছে—যাহাকে সোজা সাদা কথায় বলিতে পারি—ইংরেজের শাসন এবং শোষণযন্ত্রের সহায়ক 'চাকর' বা আধুনিক তন্ত্রভাষায় 'কর্মী'। শিক্ষা আদৌ বৃত্তিমুখী হয় নাই। যে বিজ্ঞান ইংরেজকে অত শক্তিমান্ ও বিত্তশালী করিয়াছে তাহা আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে মাত্র এই সেদিন। শিক্ষা বৃত্তির অনুগামী না হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সরকারি বা সওদাগরী আপিসের দুয়ারে ধর্না দিতে হইয়াছে। শিক্ষা যখন অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন চাকুরি জুটাইতে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল।

গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা—বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, সূত্রধর, ধরামি, মিস্ত্রী, কুম্ভকার কর্মকার, কাঁসারি, শাঁখারি, রঙ্গসারি কারুশিল্পী, বণিক, কৃষক, বারজীবী, গোয়ালা, যোদক নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করে এবং সুলভ ও সহজ অর্থাগমের উপায়স্বরূপ চাকুরির অন্বেষণে ছুটিতে থাকে। ফলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সমাজ কেন্দ্রচ্যুত হইবার উপক্রম হয়। আমরা স্ব স্ব বৃত্তি খুলিয়াছি; কত শিল্প বিলুপ্ত, শিল্পীশ্রেণী মৃত, শিল্পকৌশলও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত। প্রাচীন সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি অনাদর এবং জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ইংরেজীয়ানার প্রসার আধুনিক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কুফল। এই দুইটি কুফলের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে জাতির কল্যাণ নাই, স্বাধীনতাও ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

জগতের সকল জিনিষই ভালয় মন্দয় মিশ্রিত, নিছক ভাল, নিছক মন্দ কিছুই নাই। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ভাল কিছুই হয় নাই, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষের ঘুরঘুরান্তের লোকের ভিতরে একটা শাশ্বত যোগ বরাবরই বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে এই যোগকে একটি জাতীয় রূপ দিতে বিশেষ সহায়তা করে ইংরেজী শিক্ষা। দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনও আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষে কম রসদ জোগায় নাই। এক আইন, একই সুবিধা, একই অসুবিধা, একই রকম অনাচার অত্যাচার শোষণ আমাদিগকে এক-জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যাহাতে এই একত্ববোধ বা এক-জাতীয়তা দেশের জলহাটিতে শিকড় গাড়িয়া একটি বিপুল শক্তিরূপ মহাবটীবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে সেই উপাদানসমূহ নিষীত হইবার সম্ভাবনা ঘটে নাই। এই সকল উপাদের প্রধানতম—শিক্ষা। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন যুগের নূতন শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ সেখানকার কর্তারা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিলেন। চীন পরিক্রমার পর কেহ কেহ যে সেখানকার নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু আমাদের দেশে—স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে এই মানুষ-গড়ার কাজ কি সুরু হইয়াছে? ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'Putting new wine into old bottle', অর্থাৎ পুরাতন বোতলে নূতন সুরা ভর্তি করা। আর যে বিষয়েই ইহা সত্য হোক, শিক্ষা-ব্যাপারে যে এটি একেবারেই সত্য নয় তাহা নিশ্চিত। তাই স্বাধীনতালাভের সাত বৎসর পরেও আমরা আজ বিভ্রান্ত। অনেকের

যুদ্ধে অনেক কথা শুনি। কেহ বলেন—তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রীকেও একাধিক বার বলিতে শুনিয়াছি—আমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া স্বাধীনতা লাভ করি নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বাধীন হইয়াছিল তখন সেখানকার দশ লক্ষ লোক সকলেই কি অস্ত্র ধরিয়াছিল? এরকমটি কোন দেশে কখন কি সম্ভব হইয়াছে? অল্পসংখ্যক লোক লড়ে, সমগ্র জাতি বা জাতির অধিকাংশ লোক তাহাদের পিছনে থাকিয়া সাহায্য করে। ইহাকে ইংরেজীতে বলা যায়—'moral support' বা নৈতিক সমর্থন। শতাব্দিক বর্ষে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে হাজারে হাজারে লোক শতবিধ অনাচার-অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, ফাঁসি-কাষ্ঠেও অনেকে আত্মাহুতি দিয়াছেন। শত সহস্র ভারতবাসী ছিন্নমূল হইয়া সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। শেষে যুগশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধীকেও প্রাণ হারাইতে হয়। ইহার পরও কি বলিব—আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিই নাই, সাধারণ লোককে ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা কি কর্তব্য?

৫

আসল কথা, নূতন পরিবেশে নূতন লোক চাই, নূতন সৃষ্টিকর্মী চাই। যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁহাদের নূতনকে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষাকে নূতন ধাঁচে গড়িতে হইবে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিতেছি পুরানো বোতল। যে বোতল আমাদের বাবা ভাঙিয়াছে, কারাগারে পাঠাইয়াছে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছে, আমাদের সকলের উপর অশেষ অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাইয়াছে, বিদেশী শাসকের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শাসন ও শোষণে সহায়তা করিয়াছে, সেই বোতলেরই প্রতাপ এখনও দেখিতেছি রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বোতলের চেহারার পরিবর্তন হয়ত কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে, কিন্তু প্রায়শঃ সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল সামগ্রিক উন্নতির পরিপন্থী মনোভাবই লক্ষ্য করিতেছি। মনের পরিবর্তন দরকার—মহাত্মা গান্ধী যাহাকে বলিতেন—'change of heart', হৃদয়ের পরিবর্তন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সবচেয়ে বেশী আবশ্যক। কারণ এখানেই তো মানুষ-গড়া হইবে। স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসী সৃষ্টি হইবে। আজ আপনাদের ভিতরে আসিয়াছি। 'দেশবন্ধু' নাম-পূত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস। সাতাশ বৎসর বিদ্যালয়টির বয়স। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে যেরকমটি ছিল, আপনাদের শিক্ষা-পদ্ধতি বা শিক্ষাদান-প্রণালীর এখনও কি তাহার কোন পরিবর্তন আপনাদের চোখে পড়িতেছে? এক-একটি বিদ্যালয় কি তখনকার মত এখনও বেকার এবং বেকারী সৃষ্টির এক-একটি কল রূপে বিরাজ করিতেছে না? আমরা তো এখনও যেন পরহস্ত-চালিত যন্ত্রবৎ রহিয়াছি। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির আয়োজন কৈ? বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কাজ সৃষ্টি হইতেছে কৈ? প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কঙ্কাল দেখিতেছি, ইহা রসপুষ্ট হইয়া সংহত ও শক্তিমান্ হইবে কিরূপে?

ইহার একমাত্র উত্তর—সন্তান-সন্ততিদের, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিমিত্ত সুশিক্ষার আয়োজন ও প্রসার। এখন সুশিক্ষা কাহাকে বলিব? গণতন্ত্রের একটি প্রধান কথা—সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা। যাহার যেমন ক্ষমতা বা শক্তি তদনুযায়ী যাহাতে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তাহার সুষ্ঠু আয়োজন। এ কথার তাৎপর্য, মৎস্যজীবী, সূত্রধর বা তন্তুবায়-পুত্রও যাহা শক্তিবিকাশের সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রের কর্ণধার হইতে পারিবেন, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বা কবি অথবা সাহিত্যিক হইতে সক্ষম হইবেন। ধনসম্পদেও এক-একটা কার্পেণী বা রথচাইল্ড-রকফেলার হইবার সুযোগ পাইবেন। সবই ঠিক, সকলই মানিয়া লই।

কিন্তু সমাজের স্থিতি চাই, অর্থাৎ সমাজের জন-সাধারণেরও কল্যাণ চাই। আমার কল্যাণকে তখনই সার্থক জ্ঞান করিব যখন ইহা অপর দশ জনের কল্যাণের পরিপন্থী না হইয়া সহায়ক হইবে। কি উপায়ে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি? গণতন্ত্রের মূলনীতি সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া সমাজের—জাতির—দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এখানে আবার একটু পুরানো কথায় যাই। তন্তুবায় কাপড় বুনিতেন, কুম্ভকার হাঁড়ি-কলসী-মূর্তি গড়িতেন, স্বর্ণকার, কর্মকার, শিল্পীকুল কত রকমারি অলঙ্করণ করিতেন। এসব কি তাঁহারা করিতেন শুধু নিজের জন্য? নিজ নিজ বৃত্তি—জীবিকা ছিল এই সব, কিন্তু তাঁহারা এ সকলে লিপ্ত হইতেন সমগ্র সমাজের জন্য, তাহার কল্যাণের নিমিত্ত। এই যে একই সঙ্গে সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত কল্যাণবোধ ইহাই তাঁহাদিগকে—তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে—জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যুগে যুগে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সমাজ-সৌধ টিকিয়া গিয়াছিল। সমাজের এই স্থিতিস্থাপকতার প্রতি বহু মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—গত যুগেও, এযুগেও। সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইবে, আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত মানব-সমাজকে স্থিতধী হইতে হইবে। বেকার সংখ্যা আমরা আর বাড়াইব না, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানহীন 'শিক্ষিতের' দল আমরা আর যেন সৃষ্টি হইতে না দিই।

৬

আজ ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্ব-সূরিগণ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। গত শতাব্দীতেই জাতীয় শিক্ষার আয়োজন হয়। শিক্ষার বাহন ইংরেজী হইবার পর তাহার প্রতিবাদেই যেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন (১৮৪০)। এখানে বাংলার মাধ্যমে বাংলা ও সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার তিন বৎসর পরে নবগোপাল মিত্র হিন্দু-মেলার আনুকূল্যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিজ্ঞানশিক্ষা ও শরীর-চর্চা এ বিদ্যালয়টির বিশেষত্ব হইল। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশন (স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিলেন শুধু কারিক মানসিক নয়, নৈতিক শিক্ষারও উদ্দেশ্যে। সত্য-প্রেম-পবিত্রতা বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত উচ্চতম শিক্ষার সংশোধনকল্পে যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, নানা পত্র-পত্রিকায় আলোচনাও হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' এইরূপ একটি যুগান্তকারী আলোচনা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্রে।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সারস্বত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া। স্বদেশী আন্দোলনকালে ন্যাশনাল কলেজ ও ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়, যেমন টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটও স্থাপিত হয়—একদিকে জাতীয় সাহিত্য-ইতিহাস ও জাতীয় ভাবধারা যুবমনে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার জন্য এবং অন্যদিকে যুবকগণের কারিগরি বিদ্যা শিক্ষালাভের পর স্বাধীন ভাবে, নিজদেশে নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জীবিকার্জনের নিমিত্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত সব আয়োজনেও মূল সমস্যার সমাধান হইল না। আমরা রাষ্ট্র হিসাবে বিরূপ, ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যলাভ সম্ভব নয় যতক্ষণ না রাষ্ট্র ইহার সহায় হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি একটি নূতন উপায় লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

৭

উপায়টি বুনিয়াদী শিক্ষা। আমাদের নিকট

নূতন ঠেকিলেও মোটের উপর এটি নূতন নয়। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ইয়াংকি জন ডিউয়ি এই উপায়টি —অর্থাৎ বৃত্তিমূলী শিক্ষা কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। বাংলার আদাদলোলের নিকটে উদ্বাগ্রামে খ্রীষ্টান মিশনরীরা এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র আগেই স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর চিন্তাধারার এ সকলের প্রভাব কতখানি জানি না। তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষাও মূলতঃ এইরূপ। তবে ইহার টেকনিক বা কৌশলে কতকটা তফাৎ রহিয়াছে। বৃত্তিমূলী শিক্ষা, আধুনিক বাঙালী বা ভারতবাসীর নিকটে এটি নূতন ঠেকিলেও, আমাদের সমাজ-জীবনে ইহা মোটেই নূতন নয়। মহাত্মাজী এক একটি শিল্পের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কোন গ্রাম তন্তুবায়প্রধান, কোন পল্লী সূত্রধরপ্রধান, কোন পল্লী কুম্ভকার-প্রধান। এইসব বৃত্তির মাধ্যমেই তিনি ছেলেদের অক্ষর-জ্ঞান হইতে সাধারণ-জ্ঞান পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। তবে তিনি চরকায় সূতাকাটা এবং তাঁতবোনার উপরই বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। কারণ আমাদের কাপড়ের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে এই শিল্পে বহুতর ব্যক্তির নিয়োগ আবশ্যক। এক-একটি শিল্প বা বৃত্তির মাধ্যমে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ্‌রা ভাল বলিতে পারিবেন। কিন্তু ঠিক প্রয়োজনকালে মহাত্মাজীর এই যে উদ্ভাবন—ইহাকে আবিষ্কারও বলা যায়—ঘন তমসার ভিতরে আলোকবর্তিকা-সদৃশ। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ইহা দ্বারা ধৃত হইবে। সমষ্টির জন্য যে ব্যষ্টি, (তাহা অবশ্য ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়া নয়)—এই জ্ঞান পুনরায় মানুষের মনে বদ্ধমূল হইবে। বেকার-সমস্যা এবং তদ্‌ভূত নানা নিরর্থক আন্দোলন-আলোড়নও আর মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে না।

১৯৩১ সন হইতে এ বিষয়ে পরীক্ষা সুরু হয়। মধ্যে কিছুকাল বন্ধ থাকিলেও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে আবার ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন রাজ্যে এদিকে কাজও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ইহার প্রচার বা প্রসারের সার্থক আয়োজন কোথায়? যাইগাছি (বর্তমানে, বাণীপুর) কেন্দ্রে যাহা কাজ হইতেছে তাহা ত পরীক্ষার স্তর পার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এখানে সরকার টাকাও ঢালিতেছেন প্রচুর। বলরামপুরে বেসরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু তাহার কার্য সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান অতি সামান্য। জানিতে বড় ইচ্ছা হয়—সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষা কতটা প্রসারলাভ করিতেছে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন আমি পৈতৃক বৃত্তিকেই সর্বত্র আঁকড়াইয়া ধরিতে বলিতেছি। বুনিয়াদীর বৃত্তি-অনুগামী শিক্ষা পাইয়া তন্তুবায় কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, সূত্রধর হইতে পারেন। তথাকথিত অন্ত্যশ্রেণীর লোকেরাও এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, যেমন এখনই কেহ কেহ করিতেছেন। এ ত সাধারণ ব্যবস্থা। আবার বুনিয়াদী শিক্ষার এরূপ সুযোগও থাকা চাই যাহাতে যে-কোন শিল্পী-সন্তান স্বশক্তি বলে রাষ্ট্রে উচ্চতম পদাধিকারী হইতে পারিবেন।

৮

বর্তমান সমস্যা সমাধানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়। অন্য উপায়ও থাকিতে পারে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন এই আণবিক বোমার যুগে বুনিয়াদী শিক্ষা কি আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিবে? শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া সমগ্র দেশকে শিল্প-কারখানায় পরিণত না করিতে পারিলে আমরা ধনৈশ্বর্যে গরীয়ান্ হইব কিরূপে? আবার উচ্চতম

বিজ্ঞান আয়ত্ত না করিতে পারিলে নবতম সমোপকরণই বা আমরা প্রস্তুত করিব কেমন করিয়া? অথচ পূর্ব-পশ্চিম হইতে আবদ্ধ। ঘরের দোরগোড়ায় পাক-মার্কিন চুক্তি, পাক-তুর্কি চুক্তি কতই-না শুনিতেছি! এ সকলের প্রতিষেধক তবে কি? এই প্রসঙ্গে জামসেদপুরের লৌহখনির আবিষ্কর্তা প্রমথনাথ বসু প্রণীত *Illusions of New India* বা 'নব্য ভারতের আলেয়া' শীর্ষক পুস্তকখানির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিশেষভাবে। তিনি আরও অনেকগুলি পুস্তকে বর্তমান ভারতের সমস্যা-সমূহের বিশদ আলোচনা করিয়া সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন। উক্ত পুস্তকখানিতে প্রমথনাথ প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে দেখাইয়াছেন, আমরা ইংরেজ-সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের কতকগুলি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। এ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হইয়া তিনি পাঠকগণকে ঐসকল সংস্কার মন হইতে দূর করিতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের শিল্পায়নের পক্ষে যে মূলধন আবশ্যক তাহা নাই। বিদেশ হইতে আজিকার দিনে অর্থ ধার করা মানে প্রকারান্তরে বিদেশীর অধীনতা-শৃঙ্খল গলায় জড়ানো। আমাদের নিজ শক্তি অপরিমেয়। দীর্ঘ দুই শত বৎসরের শাসন ও শোষণের পরেও ভারতবর্ষে এমন সম্পদ রহিয়াছে যাহার আহরণও যথোচিত বিনিয়োগ করিলে আমরা একটি শক্তিমান্ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারি। প্রমথনাথ ভারতবাসীকে মিথ্যা আলেয়ার পিছনে না ছুটিয়া আজ হইতে সেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীতে যে ভাববারা পরিপুষ্টি লাভ করে তাহার পূর্বাভাস পাই প্রমথনাথের এই চিন্তাধারায়। বিদেশী মূলধন, বিদেশী পণ্য, বিদেশী যন্ত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বদেশী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে পারিলে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে আমরা একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হইতে পারিব। প্রয়োজনমত বিজ্ঞানের সাহায্যও যে লইতে হইবে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমরা শক্তিমান্ যাহাতে না হইতে পারি তাহার জন্যই ত পশ্চিমের বন্ধুবর্গের এত তোড়জোড়। আজ শিক্ষার মোড় এমন ভাবে ঘুরাইতে হইবে যাহাতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ একই সঙ্গে সাধিত হয়।*

* চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে সভাপতির বক্তৃতার সারমর্ম।

জাতিপুঞ্জের কেন্দ্রীয় কার্যালয়

শ্রীশেখর ঘোষ

নিউইয়র্কের ঈষ্ট নদীর তীরে জাতিপুঞ্জের (United Nations Organisation) যে বাড়ীটি আছে সেই সম্পর্কে লিখিতেছি।

সভায় প্রবেশের অনুমতি

জনসাধারণের কাছে জাতিপুঞ্জের প্রধান কেন্দ্রে দুই একটি অনুষ্ঠিত সভা ব্যতীত সব সভাই খোলা। প্রবেশানুমতি বিনামূল্যে হয়। টিকিট চাহিলেই পাওয়া যায়।—Council Commission ও অন্যান্য সভা দর্শককে উৎসুক করে তাহার স্থান ও সময় জানাইতে হয়। যখন কোন দর্শক খুব তাড়াতাড়ি টিকিট চায় অন্ততঃ দশদিন পূর্বে চিঠি লিখিলে ভালো হয়। ঠিকানাটা এই :—

Admissions Office,
United Nations.
New York—17

দর্শক যদি টেলিফোন করেন তবে সভার নির্ধারিত দিনে কিংবা তাহার আগের দিনে টেলিফোন করিবেন : Plaza 4—1234, extension 684.

দর্শকদের নামে টিকিট লিখিত হইয়া থাকিবে, আর টিকিটগুলি সভার পূর্বে সংগ্রহ করা হইবে সাধারণ পরিষদের বিল্ডিংএর Admission Desk হইতে যাহারা যথা সময় পূর্বে যেন লেখেন, তাহা না হইলে টিকিট দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। তাহারা যেন এই ঠিকানায় চিঠি দেন :—

Public Reception Committee.
United Nations, New York 17, N. Y.

তাঁহারা সভায় উপস্থিত দলের জন্যে অনেক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জলযোগের ব্যবস্থাও করা হইতে পারে যদি পূর্বেই জানানো হয়। কিন্তু দর্শকগণ সভার সময় কোন হাততালি বা শব্দ করিতে পারিবেন না—নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতে হইবে। যেখানে ধূমপান চলিবে, সেখানে ছাইদানী আছে। প্রায় সব সভাতেই বক্তৃতা পাঁচ ভাষায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি আসনে earphone-এর বন্দোবস্ত আছে। এক নম্বর সুইচ টিপিলেই বক্তার মূলের স্বর শুনিতে পাওয়া যাইবে দুই নম্বর টিপিলে ইংরেজী ভাষায়, তিন নম্বর টিপিলে ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চার নম্বর টিপিলে রাশিয়ান ভাষায়, পাঁচ নম্বর টিপিলে স্পেনীয় ভাষায়, ছয় নম্বর টিপিলে চীনা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া যায়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

American Association-এর উদ্যোগে পরিচালিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্যস্থলের মধ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। সকাল ৯-৩০ হইতে বিকাল ৫-৪৫ মিঃ মধ্যে প্রায় মিনিটে মিনিটে এই কাজ চলে। পূর্ণ বয়স্কদের ভ্রমণের জন্য লাগে এক ডলার। পঁচাত্তর সেন্ট লাগে দশ কিংবা ততোধিক পূর্ণ বয়স্কদের জন্য, আর পঞ্চাশ সেন্ট লাগে ছাত্রদের জন্য। ওখানকার কর্মচারীদিগকে বিনামূল্যে যাইতে দেওয়া হয়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য এই ঠিকানায় চিঠি দিবেন :—

AAUN Guide Service
United Nations, New York 17.

কখন কোন সভা কোথায় হইতেছে, তাহা

Information Desk-এ গেলে জানাইয়া দেওয়া হয়। টেলিফোন যোগেও এই খবর লওয়া যায়।

জাতিপুঞ্জের কেন্দ্রস্থল

জাতিপুঞ্জের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আঠারো একর জমির উপর মানহাটান দ্বীপে অর্থাৎ নিউইয়র্ক সহরের মূলের উপরই। ফার্স্ট এভেনিউ হইতে ইস্ট নদী—এই দুই এর মধ্যে অবস্থিত। এখানে সাধারণ পরিষদ, সহাকরণ (Secretariat), নানাবিধ সভাসমিতি এবং গ্রন্থাগারের অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। জাতি সংঘের সভা পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, জাতি সংঘের প্রধান কার্যালয়ে সাধারণ পরিষদের সভার জন্যে সভাগৃহ আছে,—কাউন্সিল, কমিটি ও কমিশনের জন্য অনেক সভাগৃহ আছে কার্যাধ্যক্ষের জন্যও অফিস আছে। প্রায় সব সভাই এখানে হয়। ভূতপূর্ব লীগ অব নেশন্সের যে বাড়ী ছিল, সেখানে জাতি সংঘের ইয়োরোপের অফিস আছে।

সভাগৃহ

দর্শকদের প্রবেশদ্বার জাতিসংঘের প্রধান ব্যাদকনে মার্বেল পাথরের অট্টালিকার উত্তর দিকে। তাহার পাশেই ৩৯ তলা মহাকরণের ইমারত। সাতটা ব্রোঞ্জ নিকেলের দরজা পার হইয়া একটা লবীর মধ্যে যাওয়া যাইবে; তাহার সামনেই একটা ঘরের ছাদ। এখানেই দর্শকদের টিকিট দেওয়া হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি পার হইয়া প্রতিনিধিদের বসিবার জায়গায় (Auditorium) পৌঁছান যাইবে। ইহা ১৬৫ ফুট লম্বা ও ১১৫ ফুট চওড়া। মাঝখানে মঞ্চের পাশে চার ফুটের মতো ব্যাসার্ধ নিয়া একটা স্কাইলাইট আছে। দশ সারি পাথর কাঠের ডেস্ক আছে। ডেস্কের পিছনে গদীমোড়া চেয়ার। এখানে প্রতিনিধিগণ বসেন। তাঁহাদের সামনে প্রেসিডেন্টের বেদি এবং Podium। ইহার পিছনে ধূসর নীল রেশমের পর্দার উপর গোলাকার সোনালী ডিস্ক এবং প্রত্যেকটি সদস্য জাতির coats of arms আছে। Podium এর মাঝখানে জাতিপুঞ্জের প্রতীক রহিয়াছে। বেতার বার্তা প্রেরণ, ভাষার অনুবাদের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি দিকের দেওয়ালে রহিয়াছে।

প্রতিনিধিদের ৭১০ দর্শকদের ২৭০ সাংবাদিকদের ২৩৪টি আসন আছে, এবং জনসাধারণের জন্য ৮২৬টি আসন আছে।

সভা করিবার একটা বড় ঘর আছে, এইজন্য আবার চারটা ছোট ঘরও আছে। এইসব ঘরে সভা বলিতে আলাপ আলোচনা বোঝায়। সাতটা রেডিও স্টুডিও ও রেকর্ড করার জন্য ঘর আছে। এই প্রধান কেন্দ্রের চলাচল ব্যবস্থার প্রধান পরিচালনা কক্ষ বা কন্ট্রোল রুমও একটা আছে। জনসাধারণ যে ঘরে ভিড় জমায়, সে ঘরে জাতিপুঞ্জের দোকান আছে। সেখানে souvenir বা স্মারকচিহ্ন বিক্রয় হয়। একটি ডাকঘরও আছে। এখানে জাতি-সংঘের সমবায়ের দ্বারা পরিচালিত সস্তা দেশের হস্তশিল্পের ও সুকুমার শিল্পের দোকান আছে। জনসাধারণের বসিবার জায়গা ও টেলিফোনের ব্যবস্থা এই তলাতেই আছে। দর্শকগণ বা জনসাধারণ কিন্তু মহাকরণের ইমারতের মধ্যে যাইতে পারে না।

সভাগৃহ (Conference Building)

মহাকরণের অট্টালিকার নদীর দিকে একটা তিলকল্প বিশিষ্ট অনতি-উচ্চ গৃহ দেখা যায়। একটি কক্ষ অর্থনৈতিক সামাজিক কাউন্সিলের জন্য,—একটি অছি পরিষদের কাউন্সিলের জন্য, ও একটি নিরাপত্তা কাউন্সিলের জন্য। প্রত্যেকটি ঘর ৭২ ফুট চওড়া ও ১৩৫ ফুট লম্বা। এখানে অনুবাদ, রেডিও, টেলিভিসান এবং ফিল্ম দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটি কাউন্সিল ঘরের পাশে অফিসের কাজকর্মের সুবিধার জন্য ঘর আছে। সেখানে

কেরাণীরা বসে। কাউন্সিল ঘর তিনটির তলায় মাটীর নীচে সুবৃহৎ তিনটি পরামর্শ ঘর ও ছয়টা ছোট ঘর আছে। Conference Building এর পাঁচ তলায় অফিসের কর্মচারীদের জন্য কাফেটেরিয়া আছে। প্রতিনিধিদের রেস্টুরেন্ট আছে এবং আরো দুটি খাবার ঘর আছে। গোটা গৃহকে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার যন্ত্রপাতি নীচের তলায় আছে। মাটির নীচে যন্ত্রপাতি মেরামতের কর্মশালা, আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা ও দলিলপত্র অবিকল নকল করিবার ব্যবস্থা আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের ঘর :—অর্থনৈতিক ও সামাজিক গৃহটী সাজানো গোছানো করেন সুইডেনের সোয়েন সায়কেউলাস। সুইসের সরকার এই বাবৎ খরচ দিয়াছেন। পাবলিক গ্যালারিটি অতি সুন্দর হইয়াছে। অছি পরিষদের ঘর :—ডেনমার্কের ফিন্ জুল অছি পরিষদের কক্ষটিকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছেন। আর এক ডোমিনিকান শিল্পীর তুলির আঁচড়ে মানুষের শান্তির জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদের ঘর :—নিরাপত্তা পরিষদের কক্ষটিকে আরসেটেন্ আরনেবার্গ অদ্ভুত সুন্দর করিয়াছেন। তার ছবির মধ্যে মূর্তি হইয়াছে ভবিষ্যতের শান্তির জন্য আশা আর প্রত্যেকের স্বাধীনতা। পুরাতন পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া আসিয়া উঠিবে নতুন সমাজ। নৈরাশ্যবাতর নারী-পুরুষ ও ক্লান্ত, শ্রান্ত ও সংসার চালনার অসমর্থ গোটা মনুষ্যজাতি জাতিপুঞ্জের আশ্রয়ে চিরশান্ত ও স্বকীয় স্বাধীনতার দ্বারে প্রবেশ করিবে।

ডাকঘর

মহাকরণের গৃহের নীচের ঘরটায় জাতিসংঘের ডাকঘর। এখানে শুধু জাতিসংঘের স্ট্যাম্প বিক্রয় হয়। জাতিপুঞ্জের নিজস্ব স্ট্যাম্প আছে, কিন্তু তাহা বিক্রী এবং পোষ্ট অফিস পরিচালনার ভার আমেরিকার গভর্ণমেন্টের উপর।

সাধারণ পরিষদের গেটের নিকট গৃহের যেখানে লোকের ভীড় হয়, সেখানেই সাধারণের নিকট জাতি সংঘের ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়। জাতি সংঘের প্রথম ষ্ট্যাম্প ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে বিক্রয় হয়। জলপথ এবং স্থলপথের ডাকের জন্য একসেট হইতে এক ডলার মূল্যের এগারো শ্রেণীর ষ্ট্যাম্প আছে। আর ছয় সেন্ট থেকে পঁচিশ ডলার মূল্যের টিকিট আছে। বিমান ডাকের জাতি সংঘের পোষ্টকার্ড ও বিমান ডাকের কার্ডও ওখানে পাওয়া যায়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণার্থে ১৯৫২ সনে মানবের স্বাধীনতা দিবসে ষ্ট্যাম্প বাহির হয়।

মহাকরণ গৃহ

উনচল্লিসতলা—ওয়ালা মহাকরণ গৃহের পূব পশ্চিম দিকটা নীল-সবুজ কাঁচ ও এল্যুমিনিয়াম দিয়া গড়া। ইহা গরমটাকে তাড়িয়া দেয় বলিয়া শীততাপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকটা ধূসর ভারমেন্ট মার্বেলের। কার্যালয়ের গৃহের সামনেই একটা গোলাকার পুকুরের মতো আছে। একটা ঝর্ণাও আছে। এতে কালো ও সাদা পাথরের টুকরো আছে। ভূমধ্য সাগরের রোডস দ্বীপ থেকে এটা আনা হইয়াছে—গ্রীক সরকারের দান।

সাধারণ-পরিষদ (General Assembly):

সাধারণ-পরিষদ সম্মিলিত মনুষ্য-সমাজের পার্লামেন্ট। ইহাতে যে কোন প্রশ্ন কিংবা গোটা জাতিপুঞ্জের কি কি কাজ করা হয় কিংবা হইবে—তাহার আলোচনা করে। এই সব প্রশ্নের উপর জাতিপুঞ্জের সভ্যদের অথবা নিরাপত্তা পরিষদের সভ্যদের সুপারিশ (recommendations) করিবার ক্ষমতা আছে। একটা ব্যতিক্রম আছে। যে

বিবাদে কিংবা কোন অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ তাহা ক্ষমতা চালনা করিতেছে,—এই অবস্থায় ততক্ষণ না নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদকে চালনা করিবার ক্ষমতা দেন, ততক্ষণ এই পরিষদ নিরুপায়।

গঠনের দিন হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ কেন্দ্রে অবস্থিত। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ পরিষদ Secretary-General নিযুক্ত করে। পৃথক ও স্বাধীন নির্বাচনে সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণকে নির্বাচিত করে। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নূতন সদস্য নেওয়া হয়। এই পরিষদ জাতিপুঞ্জের বাজেট তৈয়ারি করে। পরিষদের সভাপতি থাকেন। প্রতিনিধিগণ তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি সেসন শুরু হইবার পূর্বে নির্বাচিত হন। Secretary-General ও তাঁহার Executive Assistant ঐখানেই উপস্থিত থাকেন।

উপরোক্ত-সভাগুলি বাকিগুলার কাটিয়া যায়—এবং তাহার পরে নিম্নলিখিত ছয়টি কমিটিকে আলোচ্য বিষয়গুলি নিষ্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হয়।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা
দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সম্বন্ধীয়
তৃতীয়তঃ সামাজিক, মানব হিতৈষণা ও সাংস্কৃতিক
চতুর্থতঃ অছি পরিষদ (নিজের শাসিত ভূমি সম্বন্ধ, এবম সরকারের)
পঞ্চমতঃ শাসন কার্য নির্বাহক এবং বাজেট বিষয়ক
ষষ্ঠতঃ আইন বিষয়ক

নিরাপত্তা পরিষদ

শান্তিরক্ষার জন্য সতর্কতা প্রয়োজন এবং সেইজন্যই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সেসন থাকে। একদিনের নোটিশে সভা ডাকা হয়, পনের দিন অন্তর একদিন। যদি এইভাবে নোটিশ দেওয়া হয় তবে হেড্ কোয়ার্টার্স ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সভা হইতে পারে। জাতিপুঞ্জের সনদ হইতে এই রকম আসা যায় যে, প্রাথমিক দায়িত্ব বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য—নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য—নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত।

এগারোটি সভ্য রাষ্ট্র লইয়া ইহা গঠিত। এগারোটির মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী—চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আর ছয়টি সভ্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়।—তিন বছরে একবার করিয়া দুই বছরের মেয়াদে। অস্থায়ী সভ্যদের মধ্যে ব্রেজিল (১৯৪৬), চিলি (১৯৫৬), গ্রীস (১৯৫৬), নেদারল্যাণ্ড (১৯৫৩), পাকিস্তান (১৯৫২) এবং তুর্কী (১৯৫৩) প্রভৃতির নাম আছে।

নিরাপত্তা পরিষদের সভ্যদের একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকার আছে। এগারো জনের মধ্যে অন্ততঃ সাতজনের ভোট লইয়া সভায় কি করা হইবে, তাহা ঠিক করা হয়। মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত হইবার জন্য সাতটি সভ্যরাষ্ট্রের ভোট লইবার প্রয়োজন। তার মধ্যে অবশ্য ঐ স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রের পাঁচটি ভোট আবশ্যক। এই পাঁচটির মধ্যে যে কোন রাষ্ট্র যে কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিতে পারেন। ইহাকে "ভিটো" বলে। নিরাপত্তা পরিষদের হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, সে পৃথিবীর সমস্ত রাজনৈতিক গোলমাল নিষ্পত্তি করিবে ও দেখিবে যাতে অবস্থাটা জগতের শান্তি ও নিরাপত্তাকে ভয়াবহ না করে।

এই রকম গোলমাল বা অবস্থা কোন সময় এই সভার কর্ণগোচর করিতে পারে। অথবা সাধারণ পরিষদ, Secretary-General, কিংবা যে রাষ্ট্র সভ্য নয়, সেও জানাইতে পারে।

অছি পরিষদ (Trusteeship Council) :

এই সভার দায়িত্ব আছে Trust territory-র তত্ত্বাবধান ও শাসন ব্যাপারে। আর্থিক, সামাজিক এবং শিক্ষার প্রসার ও স্বাধীনতার পথের উন্নতিই প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে দশটি Trust territories আছে। সেগুলি পূর্বেকার মাণ্ডেট শাসিত অঞ্চল—যে অঞ্চলগুলি পূর্বেকার শাসক রাষ্ট্র হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। সোমালিল্যাণ্ড যাহা আগে Italian Colony ছিল তাহা ইটালীর Provisional Trusteeship agreement দ্বারা শাসিত হয়। এই পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সভ্য আছেন। তাহা ছাড়া আরও কয়জন সভ্য আছেন।

আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ

আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ উন্নত জীবন যাপন করিতে এবং প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে সৃষ্টি হইয়াছিল। দেশের মধ্যে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিবে যাহাতে প্রত্যেক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সমস্যা-গুলির সমাধান হয়।

এই পরিষদ নিজের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্যার আলোচনা করে এবং ইহার সুপারিস সাধারণ পরিষদে কিংবা সভ্যরাষ্ট্রকে পাঠায়। মাঝে মাঝে এই পরিষদ আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভা আহ্বান করে।

চাকুরী ও ব্যবসা বিষয়ক, যানবাহন ও যাতায়াত, উন্নতর জীবনযাত্রা, আর্থিক উন্নয়ন, জনসাধারণের অবস্থা, সংখ্যা সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী, মানুষের অধিকার, স্ত্রীলোকের সামাজিক ব্যবস্থা-করণ, মাদক বা অসদাচরণ ঔষধ ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যাগুলি এই পরিষদ আলোচনা করে। এর শাখা আছে বিভিন্ন Commission নামে। Commissions—এর Sub-Commissions নামেও শাখা আছে। তিনটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক Commission আছে।—Asia and Far East, Europe ও America.

কতকগুলি আন্তর-রাষ্ট্র Agency আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (I.L.O) সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা স্থাপিত হইয়াছিল ১৯১৯ সালে। অন্যান্য সংঘের মধ্যে খাদ্য ও কৃষি সংঘ (F.A.O), জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংঘ (U.N.E.S.C.O.) : আন্তর্জাতিক সংঘ (I.C.-A.O.), পুনর্গঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাংক, আন্তর্জাতিক তহবিল, বিশ্বজনীন ডাক চলাচল সংঘ (U.P.U.), আন্তর্জাতিক তারবেতার মারফৎ সংবাদ আদান প্রদান সংঘ (I.T.U.), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘ (W.H.O) এবং বিশ্ব আবহ সংঘ (W.M.O)।

বছরে দুইবার সভা হয় এবং আঠারো জন প্রতিনিধি আঠারোটি সরকারের সাধারণ পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হয়। ছয়টি রাষ্ট্র বৎসরে নির্বাচিত হয় তিন বৎসরের মেয়াদে।

মহাকরণ (The Secretariat)

মহাকরণের আট বিভাগ লইয়া Secretary-General এর Executive Office তাহার Executive Assistant দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আটটি বিভাগের প্রত্যেকটি আবার Secretary-General সহকারী দ্বারা পরিচালিত হয়। Department গুলি এই : (১) নিরাপত্তা সভা ব্যাপার, (২) আর্থিক ব্যাপার (৩) সামাজিক ব্যাপার, (৪) অছি ভূমি ও সংবাদ সরবরাহ ব্যাপার (৫) জনসাধারণ ব্যাপার এবং (৬) আইন ব্যাপার,

(৭) আলোচনা ও সাহায্য ব্যাপারে এবং (৮) শাসন ও রাজস্ব ব্যাপারে। Secretary-General দাগ-হ্যাপ হ্যামারশুল্ড (Dag Hammarskjold) সুইডেনের প্রাক্তন উপবৈদেশিক মন্ত্রী। রাজস্ব ও আর্থিক ব্যাপারে Secretary-General প্রধান শাসক। সাধারণ পরিষদের মিটিং-এ Secretary-General কাজ করেন।

মহাকরণের কর্মচারীগণকে সভ্য রাষ্ট্র ও অ-সভ্য রাষ্ট্র হইতে সংগ্রহ করা হয়। শাসনকার্যের বিভিন্ন ব্যাপারে তাহারা এক। তাহারা নিজেদের দেশের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে না—তাহারা এইরূপ শপথ গ্রহণ করেন যে, কোন রাষ্ট্র বা, সরকারের নিকট হইতে কোন উপদেশ চাহিবেন না, বা নিবেন না। যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলে পাঁচটি ভাষায় (ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান এবং চৈনিক) তাহার অনুবাদ দেওয়ার যোগে প্রচার, দাপ্তরিক হিসাব রাখা এবং মহাকরণ চালাইতে যাহা কিছুর প্রয়োজন হয়, এই সকলই তাহাদের কাজ।

দরকারী দলিলপত্র সাধারণ পরিষদের মাত্র তিন ভাষায় প্রকাশ হয়—ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ্।

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি পার্লে ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : আশ্বিন, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ১৬১

শিশুশিক্ষা ১৬২

প্রকৃত শিক্ষাই গ্রামের কাজ— ১৬৫
শ্রীহারাধন রক্ষিত

শিক্ষার পরিবর্তন— ১৬৬
শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

খাদ্য ও শিক্ষা-সমস্যা— ১৬৯
শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

ম হি বল্যাণকৃৎ কস্তিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৬৬ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

বিজয়া সম্ভাষণ

বন্যার আলোড়নে প্রকৃতির ভ্রূকুটিকুটিল মুখের সামনে দাঁড়াইয়া, আসন্ন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার মধ্যেও দেবীর আগমনে বাঙালী তাহার বাৎসরিক পূজার কথা ভোলে নাই। বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহক সকলকে আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাই।

বন্যা ও শিক্ষা

এবারকার বন্যা বাংলা দেশকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে। কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলার সংযোগসূত্র দুই চার দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বড় সামান্য কথা নয়। চাষী তাহার পরিশ্রমের ফল ও ভবিষ্যতের সম্বল ধানের উপর ভরসা করিয়া ছিল, চোখের সামনে দুর্বার জলরাশি আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিল। শুধু তাহাই নয়, তাহার ঘরবাড়ি ডুবিয়া গেল, না হয় পড়িয়া গেল। কোনও প্রকারে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া ডাঙা জমিতে আসিয়া সে দাঁড়াইল। মাথার উপরে মুষলধারে বৃষ্টি, নিরাশ্রয়। দেশের সহানুভূতি ও সরকারি সাহায্য সে পাইবে। কিন্তু বস্তুত তাহাতে আবার মানুষের মত দাঁড়াইতে পারিবে কি?

শিক্ষার কথাটাই বিশেষভাবে মনে লাগিতেছে। সরকার খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন, শ্রমের বদলে খাদ্য, ঘরবাড়ি করিতেও সাহায্য করিবেন। কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা কি আগের মত চলিবে? যাহারা কোনও মতে ধান চাল বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন জোগাইত, তাহাদের কি হইবে? শিক্ষার জন্য ব্যয় যে ভবিষ্যতে আয়ের আশায় বর্তমানে ব্যয়—যাহাকে বলে investment! সুতরাং দুর্বৎসরে যেমন খাজনা মকুব করা হয় তেমনই এ সময়ে অন্তত: কৃষিজীবীদের শিক্ষাবেতন হইতে রেহাই দিবার কথা কর্তৃপক্ষকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমেরিকার অভিজ্ঞতা

আমাদের শিক্ষাগুরু আগে ছিল ইংলণ্ড, এখন আমেরিকা। কিন্তু আমেরিকার অবস্থা ও আমাদের অবস্থার পার্থক্য যে কতখানি, তাহা ভাবিতে হয়। যে সব ভারতীয় ছাত্র সেখানে অধ্যয়নার্থে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সে দেশের লোকদের ভারত সম্বন্ধে

কৌতূহল ও সহানুভূতির কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু একজন টেলিসি হইতে লিখিতেছেন, 'এদেশে প্রত্যেকেরই একাধিক মোটর গাড়ি আছে।' কথাটায় যাহা কিছু অত্যুক্তি আছে তাহা অর্থেক আরও স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছে। আর একজন কেন্টাকি হইতে লিখিতেছেন, এক ছাত্রাবাস হইতে—খরচ লাগে না, 'হোটেলটা বেশ বড় এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই ইহার সব কাজ করে। কলেজের bakery, dairy, electricity ও water-supply ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। এইসব ব্যবসায়ে কলেজের total investment 22 million dollars (প্রায় ১১ কোটি টাকা)। কলেজের বাৎসরিক খরচ one million dollars (প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা)। এখানে কলেজের ছাত্ররা রোজ দুই ঘন্টা কাজ করে। উহাদিগকে কলেজে বেতন দিতে হয় না। ছাত্রদের সস্তায় খাওয়ার জন্যও কলেজ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে।'

আমাদের দেশে অনুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব কি? যে দেশের দারিদ্র্য অপরিসীম এবং শিক্ষার তৃষ্ণাও যেখানে তীব্র, অজ্ঞানের অন্ধকারও ভীষণ, সেখানে এরূপ স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারা একদিকে যেমন সাধনা-সাপেক্ষ, অন্যদিকেও তেমনই যুগের প্রয়োজন, যৌলিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণ করিতে পারিলে জাতির যথার্থ উপকার। ইহা কি সম্ভব হইবে না? সম্ভব করিতে হইলে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন, পাঠ্যক্রমের কালের পরিবর্তন, অনেক কিছুই হয়তো দরকার হইবে। মহাত্মাজী বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে স্বাবলম্বীর প্রশ্ন উঠাইয়াছিলেন। আমাদের কর্তৃপক্ষেরা হয়তো আমেরিকামার্কা স্বাবলম্বনের কথা আরও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

শিশুশিক্ষা

শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

শিশুদের স্বাধীনতা শিখাইতে হইবে। শিক্ষা-দ্বারা তাহাদের উপর কোনও বিষয় জোর করিয়া চাপানো চলিবে না। তাহাদের মুক্ত বাহুদুটিকে তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশ হইতে দিতে হইবে। সকল ইন্দ্রিয়ের—মন, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। এ বিষয়ে এখন কোথাও মতভেদ নাই। কিন্তু শিশুদের কি করিয়া সামাজিক করিয়া তোলা যায় তাহার পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে থাকা চাই। প্রাচীনকালে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের শিশুদের অন্য দাসত্বের বাহুবন্ধনই স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা হইত। কৃতদাসের শিশুসন্তানদের ভৃত্যের উপযুক্ত শিক্ষাই দেওয়া হইত। আমাদের দেশে চাতুর্বর্ণ্যের শিক্ষা পৃথক্ পৃথক্ হইত। বর্ণে বর্ণে সংকর যদি না করিতে হয় তাহা হইলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংকরভাব সহ্য করা উচিত নয়। আজ আমরা বংশ, বর্ণ ও শ্রেণীর ভেদ নস্যাৎ করিতে চাই, সকলকে একই প্রকারের শিক্ষা—মানবতার শিক্ষা—দিতে চাই।

এরূপ শিক্ষা যদি সর্বাঙ্গীণ করিতে হয় তো ভোজনাদি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রালয় দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া উচিত। আজকার শিক্ষাসূত্র হইল এই যে—'শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ জীবনের জন্য। তাহা জীবনের দ্বারাই দেওয়া সম্ভব। জীবনই শিক্ষার মাধ্যম বা বাহক হইবে।'

এই সূত্রের সমগ্র অর্থ যদি আমরা বুঝিতে পারি ও গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদের ছাত্রালয়ে

সমস্ত জাতিধর্মের শিশুদের পানভোজন একত্র হওয়া উচিত। বন্ধনবিহীন সকলকে এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া উচিত। রান্নার কাজ ও পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার কাজ গরিব বড়লোক, সকল জাতি, সকল বর্ণ ও সকল ধর্মের লোক একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া করে, ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। আদিবাসী ও অনগ্রসর জাতিরা ইহাতে সহজে সম্মত হইবে। কিন্তু ইহা তখনই সম্ভব হইবে যখন যাহারা নিজেদের উচ্চ বলিয়া মনে করে তাহারা নিজেদের আচরণ দ্বারা বালকবালিকাদিগকে বুঝাইয়া দিবে।

আমরা জানি, ছোট শিশু সব সময় আমাদের আচরণ নিরীক্ষণ করে এবং নিরীক্ষণ দ্বারা সংস্কার গ্রহণ করে। তাই হরিজন, গিরিজন, ভূমিজন, পুরুষ ও স্ত্রী সকলের একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, একই ধরণের শিক্ষা পাওয়া—ইহাই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ। অনেক সংস্কার ধীরে ধীরে আসে না—একবারে গ্রহণ করিলেই তাহাদের স্বাভাবিকতা জীবনে দুরূহ হইয়া যায়।

শারীরিক শ্রমেও সকলের ভাগ একরূপ হওয়া উচিত। আর এরূপ শ্রমে সকল প্রকারের সর্বোচ্চ কৌশল আমরা যদি প্রয়োগ করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের শিক্ষাক্রম নিষ্ফল হইবে।

আর একটা কথা। আমরা গরিব বলিয়া নয়, কিন্তু আমাদের শিক্ষার অনিবার্য অঙ্গ বলিয়া, আমাদের শিক্ষার সকল উপকরণ শিক্ষক ও বিদ্যার্থী উভয়েরই সাহায্য আমরা প্রস্তুত করিব, আর তাহাও নিকটবর্তী প্রদেশে যে সব বস্তু সহজে পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই প্রস্তুত করিব।

এইরূপে আমরা ভূমি, সমাজ ও পরম্পরাগত বিদ্যা—তিনটির সহিত আমাদের সম্পর্ক অবাধ রাখিতে পারি। এই মর্যাদার দ্বারাই আমাদের শিক্ষা তেজস্বী হইতে পারে। গান্ধীজীর বর্ণিত এই ত্রিবিধ মর্যাদার নাম শ্রীমতী তারাবেন মোদক দিয়াছেন—লক্ষ্মণ রেখা।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর যদি আমাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহা হইল অনগ্রসর জাতিদের সম্বন্ধে। যদি আমরা এই সমস্যা সমাধান করিতে পারি তবে এক আত্মঘাতী বিপ্লব হইতে বাঁচিয়া যাইব। এইজন্য এই প্রশ্নকে যথোচিত গুরুত্ব মনে করিয়া ইহার সদুত্তররূপ প্রতিকার খুঁজিতে হইবে। আমরা সাহসিক পরিকল্পনা ও বড় বড় কলকারখানা যতই না বাড়াই, যতদিন এই সব কলকারখানার কর্মীরা পিছাইয়াই থাকিবে ততদিন ভারতীয় সমাজের লজ্জা দূর হইবার নয়।

ভারতে লোকশাহী অর্থাৎ ডিমোক্রেসী স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে আমরা ভোটাধিকার দ্বারা আমাদের রাজ্যকর্তাদের নির্বাচন করিতে পারি। ভারতের বিভিন্ন পক্ষ নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে।

শিক্ষাশাস্ত্রীরা প্রজার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করিবেন। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের নীতি ও কার্যক্রম প্রস্তুত করিয়া দেশকে তাহার মহত্ত্ব বুঝাইবেন, ইহা কাম্য। আর তাহার পর নির্বাচনের সময় তাঁহারাও যেন প্রচার করেন যে আমাদের নীতিও কার্যক্রম যাঁহারা গ্রহণ করিবেন বলিয়া কথা দিবেন, তাঁহারাই আমাদের ভোট পাইবেন। তাঁহাদের হাতেই আমরা আমাদের রথের পরিচালনদণ্ড বিশ্বাস করিয়া দিতে পারিব। এরূপ নীতি ও এরূপ কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষার স্থান হওয়া উচিত সর্বপ্রথমে। আর তাহার মধ্যেও গ্রামের শিক্ষা—অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষা ও তাহাদের শিশুদের শিক্ষা সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। গ্রামের কোটি কোটি লোক যে ভাষার কথা বলে আর যাহা তাহারা ভালো করিয়া বোঝে, সেই ভাষা রাজকার্যের বাহন হউক, ইহাও আমাদের

একটা দাবি হওয়া উচিত। পরে আসে রাষ্ট্রভাষার কথা, অখিল ভারতীয় রাজভাষার কথা। কাহারও ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, ভারতের রাজ্য-পুনর্গঠন ভাষার ভিত্তিতেই হইয়াছে। জনসাধারণের এই স্বাভাবিক দাবি সরকারকে মানিতেই হইয়াছে। একটা সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

এখন দেশের সম্মুখে দ্বিতীয় সমস্যা হইল এই।

বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিবেশীরা রাষ্ট্রীয় ঐক্য বাড়াইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে কি করিয়া সহযোগিতা করিবে। এ কাজ সমগ্র রাষ্ট্র, গুজরাত মহারাষ্ট্র পশ্চিমের লোকদের সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই সমস্যা তো রাজকর্মে অধিকারে নিযুক্ত লোকদেরই সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের মন এই কার্যে উদ্বুদ্ধ নয়। তাহারা তো নির্বাচন, প্রতিনিধিদের প্রমাণপত্র এবং বাজেটে দাম কত খরচ হইবে ও কিভাবে খরচ হইবে তাহার ভাপ বাটোয়ারা লইয়াই ব্যস্ত। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় সমস্যার কথা তাঁহাদের বক্তৃতার মধ্যে পাওয়া যায়। আচরণে তো উপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলির চিন্তা ও তাহাদের স্বীকার করিয়া লওয়াই দেখিতে পাই। নির্বাচনে কাহারা জয়ী হইবে, ভোট কি করিয়া পাওয়া যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও পক্ষের ভিতর অধিকার কি অনুপাতে ভাগ করা হইবে, দেশবিভাজনেও কাহারও স্বত্ব না মারা যায়। এই সব সরকারি কর্মচারী আমাদেরই লোক। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া করিবার কথা নয়। যে কাজ তাঁহাদের দিয়া হইবে না, তাহার ভার আমরা গ্রহণ করিব এবং মন্ত্র অথচ দৃঢ় ভাবে তাহা চালাইব।

স্বরাজের যুগে সরকারি বিভাগ সমর্থ ও দৃঢ় হইবে অবশ্য। কিন্তু যাহারা স্বাধীনভাবে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী, তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের পটুতা বাড়াইতে হইবে, এবং সরকারি বিভাগে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন সর্বাপেক্ষা দুর্বল। শিক্ষাদান কার্যে যাহারা লাগিয়া রহিয়াছে তাহারাও পুরাতন মনোভাব এ পর্যন্ত ছাড়িতে পারে নাই। গান্ধীজীর যুগে বিদেশীদের রাজ্য ছিল, তাঁহার নিকট আমরা অসহযোগ শিখিলাম। এই নূতন যুগে অসহযোগ প্রতিকার নয়। গান্ধীজীর কার্যক্রম আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়া আজকার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। আমাদের গঠনমূলক কর্মের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেইমত পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যক্ষ কার্যের দ্বারা ও প্রচারের দ্বারা লোকমতকে নিজেদের অনুকূলে আনিতে হইবে। লোকমত আমাদের দিকে হইলে সরকারের উপর তাহার প্রভাব না পড়িয়া পারে না।

গোড়ার কথা হইল এই যে, আমাদের কার্যক্রমকে অন্যতন অর্থাৎ আজকার মত করিয়া গড়িতে হইবে। আজ আমরা কি করিতে পারি, কতদূর যাইতে পারি, এসব কথা চিন্তা করিয়া নিজেদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করিতে হইবে। সেই অনুসারে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে। আর ঐ কার্যের বলে দেশের বিরাট প্রচার চালাইতে হইবে। সরকারি শিক্ষাতন্ত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গান্ধীজীর প্রভাবে কখনও পড়ে নাই। আজও তাহাদের দূরদর্শিতা নাই, বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির তো চিহ্ন মাত্রও নাই। তথাপি দিনের পর দিন তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বাড়িয়াই যাইতেছে। জনসাধারণ পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। আর যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চায়, সেগুলি তেজস্বিতার অভাবে হয় সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, নয় নিজেরা গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া আরও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

অবস্থা বুঝিয়া যদি আমরা নিজেদের পঞ্চবার্ষিকী যোজনা রচনা করি, আর তাহার পিছনে নিজেদের

সকল শক্তি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি হইয়া দুদিন আসিতে পারে।

আমার এক সিদ্ধান্ত পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রগঠনের জন্য ও তেজস্বী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে শিক্ষক আমাদের চাই তাহা যেন আমরা এখন শুভ্রবস্ত্রপরিহিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চ শ্রেণীর জাতিদের মধ্যে না খুঁজি বরং শ্রমজীবী, গ্রামোদ্যোগী অনগ্রসর জাতির মধ্যে পাইবার চেষ্টা করি।

আমাদের দেশে যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন স্বার্থ-ত্যাগী, খ্যাতিপরাঙ্মুখ, নম্র, তেজস্বী, তত্ত্বনিষ্ঠ। ধনদৌলত, অধিকার, সামাজিক প্রভাবের লোভ তাঁহাদের ছিল না। তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় যাহারা খ্রীষ্টান হইল, তাহাদের মধ্যে এসকল গুণ পাওয়া গেল না। ঠক্কর বাপা যাহাদের সেবা করিয়াছেন তাহাদের কতজনার মধ্যে ঠক্কর বাপার গুণ আছে তাহা দেখিতে হইবে। ইহা তো স্বাভাবিক যে অনগ্রসর জাতির মধ্যে শিক্ষা ও জাগরণের প্রবেশ ঘটিলেই তাহারা দুনিয়ার প্রগতির অনুসরণ করিবে। তাহাদের এই চেষ্টায় সাহায্য করা আমাদের সকলের ধর্ম। তথাপি যতদিন তাহাদের মধ্য হইতে এমন কিছু লোক প্রস্তুত না হয় যাহারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থ ভুলিয়া ত্যাগ, পরোপকার ও বলিদানের মহত্ত্ব বুঝিতে পারে, ততদিন তাহাদের জাতির ও রাষ্ট্রের উদ্ধার হইবে না।

সাধুসন্তেরা যখন এইসব জাতির মধ্যে কাজ শুরু করেন তখন অনগ্রসর জাতির মধ্য হইতে কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা সন্তের আবির্ভাব ঘটিল, যাহাদের যাহারা উচ্চবর্ণের লোকদেরও স্বীকার করিতে হইল। সেই শক্তি পুনরায় জাগ্রত করিতে হইবে।

কাকাসাহেব কালেলকরের অসমাপ্ত (২৬ আগস্ট ১৯৫৮) হইতে অনূদিত।

প্রকৃত শিক্ষাই গ্রামের কাজ

শ্রীহারাধন রক্ষিত

আমরা গ্রামীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের বিশালতা, এখানকার বিরাট জনসমষ্টি, পরিবেশ ও জলবায়ু সব মিলিয়ে এই দেশের সভ্যতা গ্রামীন সভ্যতা হতে বাধ্য। এই সভ্যতার ত্রুটিগুলি ভালোভাবেই জানা আছে, কিন্তু তার কোনোটিই প্রতিকারের অতীত নয়। নাগরিক সভ্যতার দ্বারা এইসব ত্রুটি দূর করা আমি অসম্ভব মনে করি, যদি না কোনো চরম উপায়ে লোকসংখ্যা কমিয়ে তিনকোটি থেকে তিনলক্ষ এমন কি তিরিশেও নিয়ে আসা যায়। গ্রামীন সভ্যতাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে নিলেই আমি প্রতিকারের কথা বলতে পারি এবং এর ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারে। দেশের যুবকেরা গ্রামে বাস করলেই শুধু তা সম্ভব। যদি তাঁরা তা করতে চান তবে তাঁদের জীবনের পুনর্গঠন দরকার এবং তাঁদের স্কুল-কলেজের কাছাকাছি গ্রামে গিয়ে তাঁদের অবকাশের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাবেন। যাঁরা অধ্যয়ন শেষ করেছেন বা যাঁরা আর অধ্যয়ন করছেন না তাঁদের গ্রামে গিয়ে বসবাসের কথা ভাবতে হবে। নিখিল ভারত চরকা সমিতি এর নানা শাখা ও নানা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ ছাত্রদের সেবার কাজ করার ও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন, অবশ্য তাঁদের (ছাত্রদের) সরল গ্রামীন জীবনকে সানন্দে গ্রহণ করে নিতে হবে। এই সমিতি প্রায় ১৫০০ যুবকের জীবিকার ভার নিয়েছেন এবং এঁদের আয় ১৫৲

টাকা থেকে ১৫০৲ টাকার মধ্যে। এই সমিতি আরও অসংখ্য আগ্রহশীল, সৎ ও শ্রমশীল যুবকের ভার নিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কায়িকশ্রমকে লজ্জাকর মনে করবেন না। এ ছাড়া এই উদ্দেশ্যেই আরো অনেক জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। অবশ্য সেখানে সুযোগ কম কারণ জাতীয় শিক্ষা এখনো ঠিক রূপ লাভ করেনি। যাঁরা বর্তমান পরিবেশ ও প্রতিষেশের প্রতি বিরক্ত আমি সেই সব আগ্রহশীল যুবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি—তাঁরা যেন এই দুই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। এই গুলিই নীরবে গঠনমূলক কাজের সহায়তা করছে। এবং এইগুলিকে অবলম্বন করেই দেশের যুবকেরা সেবাব্রতের সুযোগ পাবেন এবং সসম্মানে জীবিকার্জন করতে পারবেন। যাই হোক এই জাতিগঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ তাঁরা নিন বা নাই নিন—গ্রামের জীবন তাঁদের পক্ষে একান্তভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানে তাঁরা সেবা করার, গবেষণা করার ও জ্ঞান আহরণের প্রচুর সুযোগ পাবেন। অধ্যাপকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর গ্রন্থ অধ্যয়নের বোঝা না চাপিয়ে ছুটিতে তাঁদের গ্রাম-পরিক্রমায় নিয়ে গেলে তা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ হবে।

• • •

অবকাশের প্রতিটি মুহূর্ত গ্রামের সেবায় নিয়োগ করা ছাত্রদের কর্তব্য। এই অভিপ্রায়ে, পঙ্কিলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে নিজেদের স্কুল-কলেজের আশপাশের গ্রামসমূহে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের সম্পর্কে স্পষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করা ছাত্রদের কর্তব্য। এতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। তারপর ছাত্ররা যখন গ্রামে গিয়ে তাঁদের মধ্যে থাকেন তখন তাঁরা আগের পরিচয়ের সূত্রে এঁদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করেন। এঁদের প্রতি কোনো সন্দেহ তাঁদের থাকে না। দীর্ঘ অবকাশে ছাত্ররা গ্রামে থেকে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখাবেন, গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শেখাবেন এবং সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। ছাত্ররা তাঁদের সুতো কাটার শিক্ষাও দেবেন এবং তাঁদের অবসর সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে শেখাবেন। এই করতে হলে শিক্ষক ও ছাত্রদের ছুটির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পালটাতে হবে। বীর্যশক্তিহীন শিক্ষকের দল ছুটিতে ছাত্রদের কতকগুলি পাঠ্য নির্দিষ্ট করে দেন। আমার মনে হয় এটা একটা দারুণ বদভ্যাস। ছুটির দিনে ছাত্রদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ থাকবে না। তখন তাঁরা স্বাবলম্বন ও আত্মোন্নতির চর্চা করবেন। আমি আগেই বলেছি যে, গ্রামের কাজই বিশ্রামের মাধ্যমে জ্ঞানদানের সহজ উপায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধ্যয়ন শেষ করে গ্রাম-সেবায় আত্মনিয়োগের এটাই শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি।

গান্ধীজীর বক্তৃতা হইতে সংকলিত।

শিক্ষার পরিবর্তন

(শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য)

শিশুরবী রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, 'পাখীর ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষিমাতার কোলেই তার প্রথম শিক্ষা পায়। সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়।'

প্রকৃত পক্ষে গৃহে মাতার কোলে যদি শিশু তার প্রথম শিক্ষা শুরু করবার সুযোগ পেত তবে শিশুর পক্ষে তা সর্বাধিক আনন্দদায়ক হতো। এ বিষয়েও চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে

দূরে পাঠান উচিত নহে, একথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমন ঘর হয়।'

নানা কারণে ঐরূপ গৃহের অভাব আছে। তাই পাঠশালাতে শিশুকে যেতে হবে। আমরা যদি শিশুর কান্না অনুভব করতে শিখি তবেই পাঠশালায় গৃহের সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। এ দিক দিয়ে বিচার করলে প্রচলিত পাঠশালায় নতুন শিক্ষা-ধারা প্রবর্তন করা সকল শিক্ষাব্রতীর কর্তব্য।

বর্তমানে আমাদের অনেক বিদ্যালয় সাজসরঞ্জাম হীন। খেলার মাঠ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিদ্যালয়ে শিশুর স্থানাভাব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। জীর্ণ বিদ্যালয়গৃহের বহু নিদর্শন আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিক খরচের কার্পণ্য তো আছেই। দারিদ্র যখন শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন দৈহিক পরিশ্রমে ও সামান্য ব্যয়ে পাঠশালাকে শিশুর আকর্ষণীয় করে তোলা যায় কিনা তাই চিন্তা করা প্রয়োজন।

স্কুল বোর্ড প্রতি বিদ্যালয়ে কিছু মাসিক খরচ দেয়। বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে স্থানীয় অধিবাসী এবং ছাত্রদের দ্বারা অভিনয়, কথকতা পাঠ থেকে কিছু আয় বৃদ্ধি হতে পারে। লটারীর ব্যবস্থা করলে বোধ হয় মন্দ হয় না। বিদ্যোৎসাহীদের নিকট থেকে বার্ষিক কিছু কিছু দানও পাওয়া যেতে পারে।

এইজন্য চাই শিক্ষকের সহিত গ্রামের আত্মীয়তা বোধ। গ্রামের হৃদয় জয় করিতে পারলে অনেক কাজের সুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের উপর একটা প্রীতি ও মমতা এনে দিতে হলে শিক্ষকের, অভিভাবকের ও গৃহের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার শক্তি অর্জন করতে হয়। এই জন্য কঠিন ধৈর্য ও হৃদয়ের প্রসারতার দরকার হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকের সাধনা প্রয়োজন। শিক্ষকের মনে রাখা কর্তব্য যে তিনি একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি ছুটে চলেছেন। তা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তন।

শিক্ষার পরিবর্তনকল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা স্বচ্ছ আকাশ মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।'

বিশ্বপ্রকৃতির সাথে শিশুমনকে যুক্ত করে দিতে হলে গ্রামের লোকের সহায়তায় শিশু এবং শিক্ষকের পরিশ্রমে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ, উদ্যান রচনা এবং বেড়া দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাস্তবের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শিশুশিক্ষার প্রধান সহায়। তাই এই সঙ্গে ভ্রমণ, চড়িভাতি, ডাক টিকিট, পাথর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক বস্তু সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও পাখী, মাছ ও ছোট ছোট জীবজন্তু পালন, ফুলগাছ লাগান, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উদ্‌যাপন একটি প্রচলিত বিদ্যালয়ে অনায়াসে উপস্থাপনা করা যায়।

উদ্যান রচনা করতে গিয়ে শিশুর লালন ও জনন প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন হয়। কৌতূহলী মনের সৃষ্টি হয়ে উদ্ভিদ, ভূমি ও জল ফুলের পর্যবেক্ষণ দ্বারা বহু জ্ঞানের উন্মেষ সাধন হয়। সংগ্রহ শিশু-মনের সহজাত প্রবৃত্তি। এর দ্বারা শিশুর বাস্তবের সহিত পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন হয় ও বাস্তব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। পাখী মাছ ও ছোট জীবজন্তু পালনের সুযোগ পেলে শিশুর হৃদয়ের কোমল অনুভূতিগুলি যেমন জাগ্রত হয় তেমন আবার চড়িভাতিতে আনন্দ লাভ, দলগতভাবে কাজ করার শিক্ষা ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ ঘটে।

অভিনয়, আবৃত্তি ও কথকতা শিশুকে বাস্তবের সহিত অপ্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকে। এ ছাড়াও প্রার্থনা, দামগ্রিক খেলা, আলোচনা ও

বিতর্ক, বিভিন্ন মনীষীদের জন্মতিথি পালন এবং খেলা ধূলার ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয় আনন্দ নিকেতনে পরিণত হয়।

সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছি। প্রার্থনার ভিতর দিয়ে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ এবং পরধর্মে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়ে থাকে। হাতের কাজ ও বিতর্ক সভায় পর্যবেক্ষণ শক্তি, স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ সাধন এবং কথা বলায় জড়তা দূর হয়ে আত্মবিশ্বাস ও নানা জ্ঞানের সমাহারে সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। আবৃত্তি, অভিনয় ও কণ্ঠকতার মধ্য দিয়ে ভাষাজ্ঞানে পারদর্শিতা জন্মে ও ভাষার জড়তা বিদূরিত হয় এবং আত্মবিশ্বাস ও ছন্দবোধ জন্মে মনে আনন্দের শিহরণ এনে দেয়। বিভিন্ন উৎসবে মহাপুরুষদের জীবনের সহিত শিশু পরিচিত হয় এবং সত্য-পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার মানসিক শক্তি আয়ত্ত করে। শিশু মনীষীদের আদর্শনিষ্ঠা ও তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করবার প্রেরণা লাভ করে এবং বিদ্যার প্রতি ঘৃণা ও অসহযোগিতার সৃষ্টি হয়। খেলার কথা বিচার করলে, আমাদের স্বদেশীয় হাডুডু, চোর দেহতলী, সূর্য নমস্কার ও দলগত খেলাগুলি বিদ্যালয়ে আনয়ন করা যেতে পারে। খেলায় নেতৃত্ব স্বীকার করে নেবার অভ্যাস গঠন, সহযোগিতা ও স্বাস্থ্যের প্রতিযোগিতার সূচনা হয়ে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের শিক্ষা ও আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আমাদের প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিশুরা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়, ব্রতচারীর ব্রতে সমাজ সেবা প্রভৃতি সামাজিক গঠনমূলক কাজ করতে পারে। বিভিন্ন কর্মে দক্ষতা অর্জনের জন্য মাটির কাজ, সংগীত চর্চা, ছবি আঁকা, সাহিত্য রচনা এবং নিজস্ব পত্রিকা ও দেওয়াল সংবাদপত্র (Wall News paper) হাতে লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়।

পুস্তকানুবর্তিতা অভ্যাসগত ভাবে হয় এবং পুস্তকপাঠে চিন্তা শক্তির স্ফুরণ হয়। নিজের ভাণ্ডারেই জ্ঞানের মূল। যেটাতে শিশু পুঁথির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এদিক দিয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। ব্রতচারীর নানা গুণে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, সমাজ-সেবামূলক মানসিক শক্তির গঠন ও আত্মোন্নতি হয়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত মৃত্য, শিশুর মানস রাজ্যে স্বপ্নের জাল বোনে। এ সবের ভিতর দিয়ে সুরুচি বোধ ও আত্ম প্রকাশের সুযোগ আসে এবং দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়ে শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশ ঘটে থাকে। বিভিন্ন হাতের কাজে নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য, দায়িত্ব বোধ ইত্যাদি জেগে ওঠে।

অনেকেই ভাবতে পারেন একটি সাধারণ বিদ্যালয়ে এই সকল বিষয়ের প্রবর্তন করা অসম্ভব। কিন্তু অনেক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই জন্য চাই আন্তরিক অনুরাগ। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক হলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে গ্রামের বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী লোকদের এনে তাঁদের সাহায্য যদি শিক্ষক গ্রহণ করেন তবে খুব ভাল হয়। সর্বপ্রথম তাঁরা বিদ্যালয়কে আপন বলে ভাবতে শিখবেন, অধিকন্তু নতুন শিক্ষার ভাবধারা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্য রক্ষা, খেলা, সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা, গঠনমূলক কাজ ও কারু শিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, পরিবেশ পরিচিতি (ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইতিহাস), সঙ্গীত ও ছন্দ এবং নৈতিক শিক্ষার কথা আছে। আমাদের প্রচলিত বিদ্যালয়ে যতদূর সম্ভব সে সকল বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন। বিষয়গুলির অবতারণা হবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে শিশুর বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে এবং শিশুর প্রয়োজনকে স্বীকার করে। কিন্তু প্রায়ই পুথিগত শিক্ষা হিসাবে এগুলো প্রচলিত বিদ্যালয়ে আসে, এবং ফলে শিশুকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া হয়, শিক্ষার প্রতি সে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। শিশুকে সর্বদা আনন্দময় পদ্ধতি ও পরিবেশের মাধ্যমে গড়ে তোলা উচিত। আমরা যেন পুথির দিকে নজর দিতে গিয়ে আসল শিক্ষার কথা ভুলে না যাই।

———

খাদ্য ও শিক্ষা-সমস্যা

শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ

স্বাধীন ভারতে শিক্ষাবিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। তৃতীয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের সর্বত্র বিপুল ব্যয় করিয়া আবশ্যিক শিক্ষা বিস্তারের কথাও ভাবা হইতেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসীর পক্ষে নিরক্ষর থাকা অবাঞ্ছনীয়, রাষ্ট্রের পক্ষে সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারা দোষের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মতে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় খাদ্যসমস্যা, বস্তুত স্বাস্থ্যসমস্যা ও শিক্ষাসমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা গ্রহণ সম্ভব নয়। আবার যেখানে খাদ্যসেবী, অপরিমিত খাদ্যসেবী, স্বাস্থ্যহীনের পক্ষেও শিক্ষাদ্বারা নিজের জীবন উন্নত করার আকাঙ্ক্ষা আকাশ কুসুমের মত। দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতে পারে, শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়ান যাইতে পারে কিন্তু শিক্ষার্থীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য লাভের পথ উন্মুক্ত না করিলে আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রায় অর্থহীন হইবে। দেশের বর্তমান অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, যে সকল ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যাইতেছে, তাহারা খাদ্যের অভাব বশতঃ স্বাস্থ্যহীনতার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ফলে শিক্ষাবিস্তার যে খরচ হইতেছে, তাহাও বিফল হইতেছে। এ অবস্থার প্রতিকারের চিন্তা ও প্রচেষ্টা করা রাষ্ট্রপরিচালক, শিক্ষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। প্রতিকারের চিন্তা করিবার পূর্বে সমস্যাটির গুরুত্ব বুঝিতে হইবে। নিম্নে দুইটি রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"*Most school children 'defective' in health. Civic administration report revelation..* (Hindusthan standard, 26 Oct., 1957).

Thirty five thousand three hundred and twenty-six school children out of 42, 472, who were medically examined, were defective according to the note on the administration report of the Municipal commissioners for greater Bombay for the year 1956-57.

This figure included 22,813 boys and 19,660 girls. Of them 27·54 percent were suffering from general debility, 24·08 percent from dental defects, 15·27 percent from throat troubles, 13·95 per cent from enlarged lymphatic glands, 5·17 per cent from skin diseases, 3·39 percent from eye troubles and a small percentage from defective vision and defects in nose.

The medical examination also revealed that 14 children out of the 58 suspected cases of leprosy were found to be positive cases and hence were prevented from attending schools.

Over 86,870 weak and undernourished children were given a daily free milk feed of eight ounces of pasteurized toned milk in every school working day. Snacks in the form of chhikki and fruits were also given to supplement the milk diet.

The education department conducted a research in specified area which

disclosed that parental negligence, domestic work, frequent migration and lack of accommodation in nearby school were found to be mainly responsible for non-attendance of school children who had reached compulsory school going age."

বোম্বে ভারতের একটি সমৃদ্ধ নগর : সেখানকার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যভাব এইরূপ। কলিকাতা ভারতের একটি বৃহত্তম নগর। কলিকাতার করপোরেশন-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসংবাদ দেখা যাক।

"*About 59% Primary school children found defective.*" এই শিরোনামায় স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ২৪ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখের সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদটি বাহির হয়।

"Reports on medical inspection of the children of a large number of Calcutta Corporation's primary schools, conducted from January to March, 1959, and now under consideration of the Standing Education Committee, reveal appalling facts.

"Of 5,267 children examined (3,220 boys and 2,047 girls) 58·67% were found defective. Malnutrition cases were 37·25%

"Among those found 'defective' 1,937 were boys and 1,048 girls. The types of diseases and the number of defective cases, according to the report, were as follows : teeth and gums 1,644 ; throat 969 ; glands 585 , cardiovascular system 166 ; skin 153 ; eye 824 ; ear 94 ; nose 255.

"Besides these, there were 98 'special cases' which included deformities, stammering and anæmia.

"During the period under review, 1,322 cards were issued for treatment of the students in hospitals or dispensaries."

পশ্চীভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পরিসংখ্যা আমাদের সঠিক জানা নাই। কিন্তু UNএর রিপোর্ট হইতে জানা যায় (The UN Demographic Year book 1958) যে—"People born in Norway could expect the life—75 years for women and 71 for men. India still had the shortest expectancy—32 years—for both sexes." অর্থাৎ ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ু পৃথিবীর অন্য সকল দেশবাসী অপেক্ষা কম। গড়পড়তা মাত্র বত্রিশ।

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে খাদ্য সমস্যা বিষয়ে আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব। এখন আমাদের কর্তব্য কি, তাহা আলোচনার পূর্বে অনুরূপ সমস্যা অন্য দেশে কিভাবে সমাধান করা হইয়াছে জানিলে আমাদের করণীয় পথ নির্ণয় সহজতর হইবে। বিদ্যার্থীদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউরোপের একাধিক দেশের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করার ও জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। নরওয়েবাসীরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে, ইহা আকস্মিক ঘটনা নয়। সেজন্য প্রথমেই নরওয়ের শিক্ষাব্যবস্থার খাদ্য ও স্বাস্থ্যনীতির আলোচনা করা যাইতেছে।

ইউরোপের উত্তরে স্কানডিনেভিয়ার পশ্চিমে নরওয়ে অবস্থিত। ইহা প্রবল পর্বতময় দেশ। দেশের অধিকাংশ তরুগুল্মহীন পর্বত। দেশের মধ্যাংশে জনবসতি নিতান্ত নগণ্য। মাত্র ২,৪৯১,৬৮০ (প্রায় পঁচিশ লক্ষ) একর জমিতে চাষবাস হয়। ৪'৮ একরের খামার সংখ্যা ১৮০, ২৩৪। ৪'৮—১২ একরের খামার সংখ্যা—১৮,২৩৭। ১২—৪৮ একরের খামার—৬৩,৭৯৪। ৪৮—১২০

একরের খামার—৪,৪৩২। ১২০—২৪০ একরের খামারের সংখ্যা ৩৪১। তদূর্ধ্ব আয়তনের খামার মাত্র ২৪০। মোট কৃষি খামারের সংখ্যা—৩২৮,১৮১। উক্ত পরিসংখ্যা হইতে বুঝা যায় চাষীর সংখ্যা দেশে নগণ্য। সেজন্য চাষবাস হইতে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন বলিয়া চাষীদিগকে অন্য কাজও করিতে হয়। ১৮০১ সালে দেশের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৮০ জনই কৃষির উপর নির্ভর করিত। ১৯৩০ সালে কৃষিজীবির সংখ্যা শতকরা ২৯ জনে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কৃষির উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। মাছ নরওয়ের জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ উৎস। হাইড্রোইলেকট্রিসিটি বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের ইনডাস্ট্রিও বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯৪৯ সালের গণনানুযায়ী দেশের লোক সংখ্যা ৩,২৪০,০০০। দেশের আয়তন ১২৩৭১০ বর্গ মাইল। উত্তর দক্ষিণে (Northcape হইতে দক্ষিণে Naze পর্যন্ত) লম্বায় ১১০০ মাইল। পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ততম রেখার প্রস্থে ২১০ মাইল এবং ক্ষীণতম স্থানে প্রস্থে মাত্র ৪ মাইল। দেশের ২৪·৭৩ ভাগ জমি বনভূমি। বনও জাতীয় আয়ের একটি উৎস। দেশে নদীর সংখ্যা অনেক। সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত—'ফিয়োর্ড' স্থানে স্থানে তীর অতিক্রম করিয়া দেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়াছে—কোন স্থানে ৯০ মাইল পর্যন্ত। সকল ফিয়োর্ডগুলি লম্বায় ১০,৪০০ মাইল। দেশের এই ভৌগোলিক অবস্থান মনে রাখিয়াই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সমস্যার জন্য নরওয়েতে কি করা হইয়াছে জানা দরকার।

নরওয়ে দেশের ছেলেমেয়েরা সকালে বিদ্যালয়ে যাইয়া প্রথমে খাবার খায়। এই ব্যবস্থা "ওসলো প্রাতরাশ" (Oslo breakfast) বলিয়া খ্যাত। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুত 'ওসলো প্রাতরাশ' সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ। 'ওসলো' নরওয়ের প্রধান শহরের নাম। আমি ওসলো শহর ও অন্যান্য স্থানের প্রাতরাশ পরিবেশন ও পরিচালনা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেজন্য নিঃসন্দেহে এইটুকু বলিতে পারি যে এই ব্যবস্থার ফলেই সে দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও দেশবাসীর দীর্ঘায়ু লাভ সম্ভব হইয়াছে। ছাত্রছাত্রী সকালবেলা বিদ্যালয়ে যাইয়া স্বচ্ছন্দমনে আহার করে। পরে শান্ত সুস্থ মনে লেখাপড়া শিখে।

ওসলো শহরের মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে কয়েকটি কেন্দ্রীয় পাকশালা আছে। সেখান হইতে পাত্র ভর্তি করিয়া বিদ্যালয়সমূহে খাবার চালান দেওয়া হয়। একটি কেন্দ্রীয় পাকশালায় প্রাতরাশ ছাড়াও দুই হাজার লোকের উপযোগী পক্ক খাদ্যও প্রস্তুত করা হয়। শহরে যাহাদের আয় অল্প, বিশেষতঃ যাহারা বৃদ্ধ তাহারা নামমাত্র মূল্যে এই খাদ্য কিনিয়া খায়। এই পদ্ধতিতে পাকশালা বিদ্যালয়ের প্রাতরাশ ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগায়।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই খাবার খাইবার জন্য এক একটি হল আছে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ক্লাশ আরম্ভ করিবার ৪৫ মিনিট পূর্বে সেই হলে প্রাতরাশ পরিবেশন করা হয়। সাধারণতঃ খাওয়ার জন্য ৩০ মিনিট দেওয়া হয়। বাকী পনের মিনিট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দৌড়ঝাঁপ করে। প্রতি বিদ্যালয়ে দুইজন পরিবেশনকারিণী থাকেন এবং শিক্ষকদের মধ্যেও কেহ কেহ উপস্থিত থাকেন। কিন্তু প্রাতরাশ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একজন পৃথক শিক্ষক থাকেন, তিনি বিদ্যালয়েও পড়ান এবং সেই সঙ্গে সমাজসেবার কাজও করেন।

সাধারণ রুটি, চীজ, কডলিভার পেস্ট, শক্ত বিশেষ ধরনের রুটি (যাহা খাইতে দাঁতের ও চোয়ালের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন), ভিটামিনযুক্ত মারগারিন, বিশেষ চীজ (whey cheese), ঠ

পাইন্ট টাটকা খাঁটি দুধ (আর সের আন্দাজ) এই প্রাতরাশের প্রধান অঙ্গ। সর্বশেষে একটি কেরট, সুইডিশ টারনিপ অথবা কপি বা আপেল বা কলা খাইতে দেওয়া হয়।

ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণও এই প্রাতরাশ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে পছন্দ করে। একসঙ্গে বসিয়া খাইতে ছেলেমেয়েরা শেখে, ভাল করিয়া চিবাইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে শেখে এবং খাবার সময় অল্প ব্যবহার না করার অর্থও জানিতে পারে। এইভাবে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধভাবে খাদ্য গ্রহণে ও বিজ্ঞান সম্মত খাবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাল্যকাল হইতেই সকলে সচেতন হইয়া উঠে। আমি বহু সংখ্যক শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ডাক্তার ও সমাজসেবীর সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এই প্রাতরাশ ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে সকলেরই একমত।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর পিতামাতা বা অভিভাবক এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহসম্পন্ন। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ে প্রাতরাশ খাইতে হইলে পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হয়। ওসলো শহরে ১৯৫১-৫২ সালে ১৭,৩৪০টি বিদ্যার্থী অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৫৭ জন প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৫৩ সালে আমি নরওয়ের বিদ্যালয়ের খাদ্য ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম। সে বৎসর একমাত্র ওসলো শহরে ২০,০০০ ছাত্রছাত্রী প্রাতরাশ গ্রহণ করিত। ওসলো মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে ৪৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয় এবং সে বৎসর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৩,০০০।

এই প্রাতরাশ বাবত ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটিই বহন করেন। খাদ্য বাবত মাথা পিছু সে বৎসর ৬৯ ওরে (নরওয়ের অর্থের নাম ক্রাউন — krone, ১০০ ওরে ore ১ ক্রাউন, এক টাকারও কম) খাদ্যবস্তুর জন্য মাথাপিছু খরচ, ৪২ ওরে আর পরিচালক ও যানবাহনের জন্য মাথাপিছু ২৭ ওরে খরচ পড়িয়াছিল। সেপ্টেম্বর হইতে জুন অর্থাৎ নয় মাস বিদ্যালয়ে প্রাতরাশ পরিবেশন করা হয়।

নরওয়ের বিদ্যালয়ে এই খাদ্য ব্যবস্থা শিক্ষারই অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স হইতেই স্বাস্থ্যের পরিপোষক খাদ্য সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে। খাদ্যের অপচয়ও এইভাবে নিবারিত হয়। দেশবাসীর দীর্ঘায়ু হওয়ার ইহা এক কারণ।

নরওয়ের অধিবাসীদের উচ্চতা ও ওজন এই কারণে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার নিকট হইতে আমি ছেলেমেয়েদের উচ্চতা ও ওজনের পরিসংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই পরিসংখ্যা সতর্কতার অনুধাবন করিলে বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য শিক্ষার সুফল সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর, ৭ হইতে ১৫ বৎসর, এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর, ১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির পরিসংখ্যা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গড়পড়তা উচ্চতার হিসাব

ছাত্র—উচ্চতার গড়পড়তা মাপ

বয়স	১৯২০	১৯২৫	১৯৩০	১৯৩৫	১৯৪০	১৯৪৫	১৯৫৭	১৯৬০
৭						১২৩·৭	১২৫·২	১২১·৭
৮	১২১·৮	১২৫·৪	১২৫·৯	১২৭·২	১২৮·৩	১২৭·৪	১২৮·১	১২৮·১
৯	১২৬·১	১২৮·৬	১৩০·৬	১৩২·১	১৩৩·৩	১৩২·৫	১৩৩·৭	১৩৪·৫
১০	১৩০·৯	১৩২·৯	১৩৫·১	১৩৬·৮	১৩৮·৪	১৩৭·৩	১৩৮·৪	১৩৯·০
১১	১৩৫·০	১৩৭·৮	১৩৯·৮	১৪০·৯	১৪২·৪	১৪২·২	১৪৩·২	১৪৪·০
১২	১৩৯·২	১৪১·৩	১৪২·৯	১৪৪·৭	১৪৭·১	১৪৭·১	১৪৭·৯	১৪৯·০
১৩	১৪৩·৩	১৪৬·৮	১৪৭·৮	১৪০·৫	১৫২·৯	১৫২·৯	১৫৩·৪	১৫৪·৫
১৪	১৪৮·২	১৫০·৫	১৫৩·১	১৫৪·৫	১৫৭·৬	১৫৭·৮	১৫৮·১	১৬০·৭
১৫				১৬১·৩	১৬৩·৮	১৬৩·৬	১৬৩·৬	১৬১·৮

ছাত্র—ওজনের গড়পড়তা মাপ (কিলোগ্রাম)

	১৯২০	১৯২৫	১৯৩০	১৯৩৫	১৯৪০	১৯৪৫	১৯৫৭	১৯৬০
৭						২৩·৮ কি	২৪·৪ কি	২৫·২
৮	২৩·৪	২৪·৬	২৫·৬	২৫·৭	২৬·৪	২৫·২	২৬·১	২৬·১
৯	২৫·৩	২৬·২	২৭·২	২৮·১	২৮·১	২৭·১	২৯·৬	৩০·১
১০	২৭·৬	২৮·৪	২৯·১	৩০·৮	৩২·০	৩০·৪	৩২·৩	৩৩·১
১১	২৯·১	৩১·৪	৩২·৮	৩৩·৪	৩৪·৭	৩৩·১	৩৪·৫	৩৬·৩
১২	৩২·৮	৩৩·৬	৩৪·৮	৩৬ ৮	৩৭·৮	৩৬·২	৩৮·৬	৩৯·১
১৩	৩৫·১	৩৬·৬	৩৮·১	৪০·৪	৪২·৪	৪০·৮	৪২·৭	৪৪·৩
১৪	৩৮·৪	৪০·০	৪২·৬	৪৪·২	৪৬·২	৪৫·০	৪৭·৩	৪৯·৮
১৫				৪৯·৮	৫১·৪	৪৯·৫	৫২·৩	৫১·০

ছাত্রী—উচ্চতার গড়পড়তা মাপ

বয়স	১৯২০	১৯২১	১৯৩০	১৯৩১	১৯৪০	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৭	১৯৫০
৭							১২৩·১	১২৪·৪	১২৪·৪ cm
৮	১২০·৬	১২৪·৪	১২৪·৭	১২৬·৪	১২৭·৪	১২৬·৯	১২৬·৫	১২৮·০	১২৮·১
৯	১২৫·৩	১২৭·৮	১২৯·৭	১৩১·৩	১৩২·৬	১৩১·৭	১৩১·৪	১৩৩·২	১৩৩·৩
১০	১৩০·০	১৩২·৩	১৩৪·৬	১৩৬·৭	১৩৭·৭	১৩৬·৭	১৩৬·৮	১৩৭·৮	১৩৮·৯
১১	১৩৫·১	১৩৭·২	১৩৯·৫	১৪১·৪	১৪৩·২	১৪২·৪	১৪১·৮	১৪৩·২	১৪৪·৬
১২	১৪০·৪	১৪২·৪	১৪৪·৮	১৪৭·৫	১৪৯·১	১৪৮·৪	১৪৭·৬	১৪৯·৪	১৫০·৭
১৩	১৪৫·৬	১৪৭·৯	১৫০·৪	১৫৩·১	১৫৫·০	১৫৪·৬	১৫৪·৬	১৫৫·০	১৫৬·২
১৪	১৫০·৬	১৫২·৪	১৫৪·৯	১৫৭·৩	১৫৮·৬	১৫৮·৬	১৫৮·৪	১৫৮·৭	১৫৯·৮
১৫			১৬০·৩	১৬১·৬	১৬১·৬	১৬১·৯	১৬১·৭	১৬২·৪	

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গড়পড়তা উচ্চতা ও ওজনের হিসাব

ছাত্রী—গড় ওজন

বয়স	১৯২০	১৯২৫	১৯৩০	১৯৩১	১৯৪০	১৯৪৩	১৯৪৫	১৯৪৭	১৯৫০
৭							২৩·৪	২৫·৩	২৪·৮ kg.
৮	২২·৬	২৪·৩	২৪·৫	২৫·২	২৬·০	২৪·৮	২৪·৮	২৬·১	২৩·৮
৯	২৪·৬	২৫·৭	২৭·০	২৮·০	২৮·৮	২৭·৩	২৭·৫	২৯·৬	২৯·৬
১০	২৭·০	২৮·১	২৯·৮	৩১·১	৩১·৮	৩০·০	৩০·৩	৩২·৭	৩৩·২
১১	২৯·১	৩০·৯	৩২·৭	৪৩·২	৩৪·২	৩৩·৪	৩৩·২	৩৬·৫	৩৭·১
১২	৩৩·৩	৩৪·২	৩৬·২	৩৮·২	৩৯·৪	৩৭·৫	৩৭·৩	৪১·০	৪১·৯
১৩	৩৭·৪	৩৮·৪	৪০·৮	৪৩·২	৪৪·৮	৪৩·০	৪২·৮	৪৬·৩	৪৭·০
১৪	৪১·৮	৪২·৪	৪৫·৫	৪৭·৩	৪৮·৮	৪৭·২	৪৭·৪	৫০·৩	৫১·৭
১৫			৫২·০	৫২·৮	৫২·৩	৫১·৫	৫৩·৪	৫৫·১	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গড় উচ্চতা ও ওজন

ছাত্র—গড় উচ্চতা

বয়স	১৯২০	১৯২৫	১৯৩০	১৯৩৫	১৯৪০	১৯৪৩	১৯৪৫	১৯৪৭	১৯৫০
১৪	১৫৩·৫	১৫৫·১	১৫৭·৪	১৬২·৭	১৬৪·৩	১৬২·১	১৬২·৮	১৬৪·১	১৬৫·০ cm.
১৫	১৫১·৫	১৬২·৪	১৬৩·৮	১৬৬·৮	১৬৬·১	১৬৭·৩	১৬৮·২	১৬৮·৮	১৬১·৭
১৬	১৬৫·৭	১৬৭·৩	১৭০·২	১৭১·৩	১৭২·৪	১৭২·৪	১৭৩·২	১৭৩·১	১৭৪·২
১৭	১৭০·০	১৭১·০	১৭২·৮	১৭৪·১	১৭৫·৫	১৭৬·১	১৭৬·০	১৭৭·১	১৭৬·১
১৮	১৭৩·৩	১৭৪·১	১৭৬·১	১৭৬·৩	১৭৭·৪	১৭৬·১	১৭৭·৩	১৭৮·৫	১৭৮·৪

ছাত্র—গড়

১৪	৪২·৪	৪৩·৮	৪৫·৫	৫০·১	৫১·৪	৪৯·৩	৪৮·৪	৫১·৩	৫২·৪ kg.
১৫	৪৭·৩	৪৯·৬	৫১·১	৫৩·১	৫৩·১	৫৩·১	৫৩·৫	৫৬·৫	৫৭·২
১৬	৫৩·০	৫৪·২	৫১·৩	৫৮·১	৫৯·৮	৫৮·৫	৫৮·১	৬১·৬	৬২·০
১৭	৫৮·১	৫৯·২	৬০·৭	৬২·০	৬৩·৪	৬২·৩	৬১·৬	৬৫·২	৬৫·৭
১৮	৬২·৩	৬৩·১	৬৪·৩	৬৫·১	৬৫·১	৬৪·২	৬৪·৮	৭৬·৮	৮৬·৫

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গড় ওজন ও উচ্চতা।

ছাত্রী—গড় উচ্চতা।

বয়স	১৫২·০	১৫২·৫	১৫৩·০	১৫৩·৫	১৫৪·০	১৫৪·৩	১৫৪·৭	১৫৪·৭	১৫৫·০
১৪	১৫৪·১	১৫৫·১	১৫৮·৫	১৬১·২	১৬১·৫	১৬১·৮	১৬১·৬	১৬২·২ cm.	১৬২·৬
১৫	১৫৭·৮	১৫৮·৭	১৬০·৮	১৬২·৫	১৬০·৩	১৬৩·০	১৬৩·০	১৬৩·৩	১৬৪·১
১৬	১৫৯·১	১৬০·৭	১৬১·৬	১৬৩·২	১৬৪·৩	১৬৪·২	১৬৪·৮	১৬৪·৮	১৬৫·২
১৭	১৬১·০	১৬১·৭	১৬৩·০	১৬৪·২	১৬৫·৪	১৬৪·৫	১৬৭·০	১৬৭·৪	১৬৫·৪
১৮	১৬১·৬	১৬১·৪	১৬৪·৭	১৬৪·৬	১৬৫·৫	১৬৭·৪	১৬৭·১	১৬৬·৩	১৬৬·৩

ছাত্রী—গড় ওজন

১৪	৪৪·১	৪৫·১	৪৮·১	৫০·১	৫০·৮	৪৯·৫	৫০·৩	৫২·৮	৫৩·৩ kg.
১৫	৪৮·২	৪৯·৮	৫১·৫	৫২·৪	৫৩·৭	৫২·৮	৫৩·১	৫৪·৮	৫৭·৬
১৬	৫১·৩	৫১·১	৫৩·৭	৫৪·৫	৫৬·৩	৫৫·৩	৫৬·৩	৫৭·৩	৫৮·১
১৭	৫৩·৬	৫৩·৮	৫৪·৮	৫৬·৩	৫৮·০	৫৭·৪	৫৭·৬	৫৯·১	৫১·১
১৮	৫২·১	৫১·১	৫৬·১	৫৭·৩	৫৯·০	৫৮·১	৫৮·৭	৬০·৬	৫৯·১

প্রতি বৎসর মার্চ মাসে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওজন, উচ্চতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ড শিক্ষাবিভাগের পরিসংখ্যা দপ্তরে যায়। গড়পড়তা ওজন ও উচ্চতা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রকাশ করা হয়। ১৯২০ সাল হইতে এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলিয়া আসিতেছে।

১৯৪০ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের সময় নয়বারেও আক্রান্ত হয়। উপরে ওজন ও উচ্চতার যে পরিসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভালভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে তখন গড়পড়তা ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় নাই, বরং কমিয়া যাইতেছিল। যুদ্ধের পর আবার ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিদ্যালয়ে প্রাতরাশ ব্যবস্থাই দীর্ঘজীবন লাভের একমাত্র কারণ নয়। স্বাস্থ্যবিদ্যার চর্চা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অন্যবিধ সামাজিক ব্যবস্থা অন্যতম কারণ।

বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন প্রথার ইতিহাস

সুইডেন হইতে নরওয়ে ও সুইডেন দুই দেশ ১৯০৫ সালে এক হয়। ১৮৪২ সালে সেই দেশে আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন প্রায় সে সময়েই আরম্ভ হয়;—স্থানীয় সমাজকর্মিদের উদ্যোগেই তাহা হইয়াছিল।

১৮৮৪ সালে নরওয়ের ওসলো শহরে নিয়মমত খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত এই প্রাতরাশের ব্যয় ওসলো শহরবাসীরাই বহন করিত। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাই তাহা খাইত। ১৯১৭ সালে মিউনিসিপ্যালিটি খাদ্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তখন বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ে পেটভরা টিফিন পাইত। দুধ, মাছ-মাংস ও শুষ্ক খাদ্য ছিল টিফিনের অঙ্গ। কারণ সকলেই মনে করিত যে এগুলিতে খাদ্যের গুণে পুষ্টিকর।

ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল সইটস্ (Prof. Carl Schoutz), স্বাস্থ্যবিদ্যার ছিলেন; তিনিই প্রথম "ওসলো প্রাতরাশ" প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে দুধ, ফল, তরকারি, রুটি অধিকতর স্বাস্থ্যের পরিপোষক। এই বিষয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেন। একই মানের অর্থনৈতিক পরিবারের ছেলেমেয়েদিগকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একদলকে শুষ্ক টিফিন ও অন্য দলকে দুধ, ফল, তরকারি, শুষ্ক রুটি ও মাখন খাইতে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয় যে শেষোক্ত খাদ্য নিশ্চিতভাবে স্বাস্থ্যের অধিকতর উপযোগী; কারণ, শেষোক্ত খাদ্যগ্রহণকারীদের ওজন ও উচ্চতা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজের প্রবর্তিত খাদ্যনীতি গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি ছিল এইরূপ :—

এক—বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত খাদ্য স্বাস্থ্যের পরিপোষক হওয়া একান্ত কাম্য। একজনের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাতে তাহা হয় না।

দুই :—প্রত্যেক খাদ্যে এমন খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকে। বিদ্যালয়ের টিফিনে ভিটামিন থাকে না।

তিন :—এমন খাদ্য দিতে হইবে যে দাঁতও চোয়ালের ব্যবহার প্রয়োজন হয়। উত্তম পক্ক খাদ্যে চিবাইবার মত কিছু থাকে না।

তাঁহার গবেষণার ফলে জানা যায় যে একবার বাড়ীতে—আর একবার বিদ্যালয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার গরম খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এই গবেষণার ফলে আরও জানা যায় যে শতকরা ৪০ জন বালকবালিকা বাড়ীতে দুধ খাইত না এবং ফল ও তরকারিও সামান্যই খাইত। অধ্যাপকের মত ছিল যে, খাদ্যে ভিটামিনের অভাব অধিকাংশের জীবনকে স্থায়ীভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আর তিনি প্রস্তাব করেন যে বাজারকরা খাদ্য একেবারে বাদ দিয়া বিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রাতরাশ দিতে হইবে।

তাঁহার এই প্রস্তাব দেশবাসী গ্রহণ করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যালয়সমূহে নির্ধারিত মানে বিদ্যালয়ে প্রাতরাশ প্রথা প্রবর্তন করা হয়। ওসলো শহরেই প্রথম ইহা প্রবর্তিত হয় এবং সেজন্য এই প্রথাকে "ওসলো" প্রাতরাশ বলা হইয়া থাকে।

লিলি ব্রাণ্ড বালি পার্ল ও পাউডার

শিশু ও রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য

পথ্য ও পানীয়

লিলি বালি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকাতা—৪

শিক্ষা : কার্ত্তিক, ১৩৬৬

সূচী

আলোচনা ১৭৭

খাদ্য ও শিক্ষা-সমস্যা— ১৭৯
শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

দীক্ষান্ত ভাষণ— ১৮৩

শিশুশিক্ষার দু'চার কথা ১৯০
শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক সমালোচনা— ১৯২
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিহলের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৭শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৬৬ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

বিদ্যালয়ের বিপত্তি

এতদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রনিরপেক্ষ থাকিয়া, অবশ্য রাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া, নিজের কাজ পরিচালনা করিবে, এইরূপই ছিল দাবি। রাষ্ট্রের কর্তব্য উচ্চশিক্ষাকে সাহায্য করা, কিন্তু কিভাবে সেই সাহায্য দেওয়া হইবে, সে বিষয়ে কেন তাহারা কর্তৃত্ব করিবে এই কথা নিয়াই না স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও স্যার্প সাহেবের কলহ? বাস্তবিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি নির্ভর করে বিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক ও ছাত্রদের উপর। কেহ কেহ অভিভাবকদিগকেও চতুর্থ পক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে অভিভাবকেরা কোথায়?

তবে, এখন সংঘাত বাধিয়াছে অন্য দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের সঙ্গে সংঘাত বাধিয়াছে অধ্যাপকদিগের। উত্তর ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইতে শিক্ষক পর্যন্ত ছাত্রদের অনুশাসনহীনতা বা অবিনয়ের জন্য পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। এরূপ যেখানে অবস্থা সেখানে সমস্তই তো বিপর্যস্ত। সরকার হইতে ফতোয়া জারি হইতেছে, এরপর আর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

কিন্তু এলাহাবাদ, লখ্‌নৌ, মহীশূর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সুর কি সমান তারে বাঁধা? অবশ্যই প্রত্যেকের অবস্থা স্বতন্ত্ররূপে বুঝিতে হইবে। বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা চাই। আর শুধু বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা নয়, ব্যবস্থাবত কাজ করার কর্মীরও প্রয়োজন। নতুবা ব্যবস্থা শুধু দলিল দস্তাবেজের মধ্যে বন্ধ থাকিলে লাভ কি?

বিদায়ের সম্ভাষণ

বৎসরান্তে একবার বিদায় লইলে তাহা অসঙ্গত হয় না। যেমন বর্ষারম্ভে নববর্ষের আবাহন। কিন্তু সপ্তদশ বর্ষের শিক্ষার কার্তিক সংখ্যা বাহির করিবার সময় এ কথা আর একটু বিশেষ ভাবে বলিতেছি। 'শিক্ষা'র গ্রাহক পাঠক ও অনুগ্রাহক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের নিকটে নিবেদন, আমরা পরবর্তী বর্ষে চালাইতে পারিব কি না সন্দেহ। প্রথমে যখন

এ কাজের ভার নই তখন ব্যক্তিগতভাবেই লইয়াছিলাম। সুতরাং গোটার কল্যাণহস্তের স্পর্শে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য ছিল, নূতন লেখকদের সুযোগ দেওয়া, বুনিয়াদি শিক্ষার স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার তত্ত্ব ও তথ্যের দিক আলোচনা করা। কিন্তু আমাদের দেশে যাহারা শিক্ষাব্রতে ব্রতী তাঁহাদের লিখিবার সময় অতি কম, অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া তাই সুকঠিন। এদিকে কাগজ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। জেলা স্কুলবোর্ডগুলির মধ্যে মাত্র দুটিরই কার্যত উৎসাহ পাইয়াছি। এরূপ পত্রিকা কেহ লাভের আশায় করে না, সত্য; কিন্তু চলতি খরচ ওঠা উচিত। বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহপ্রসারে অনিচ্ছুক। পত্রিকা স্বাবলম্বী না হইলে চালানো কতদূর সম্ভব বিবেচ্য। এ বৎসর পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশে তাহারই পরিচয়।

সত্যই কি 'শিক্ষা'র প্রকাশ পাঠকেরাও চান? তাহাও ভাবিতেছি।

এসপারেন্তো ও যামেনহফ্ শতবার্ষিকী

বর্তমান বৎসরে পৃথিবীর সকল দেশেই আন্তর্জাতিক ভাষার উদ্ভাবক ডক্টর যামেনহফের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইউনেস্কোও এই উৎসবে যোগ দিয়াছেন। "ইউনেস্কো কুরিয়ের" পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহুপ্রবন্ধে ডক্টর যামেনহফের জীবনী ও বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাজিল রাষ্ট্রের সভাপতিত্বে পৃথিবীর বহুদেশের রাষ্ট্রনেতা মন্ত্রী, মনীষি ও নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিকে লইয়া একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হইয়াছে। সুখের বিষয় কমিটিতে একজন বাঙালীও আছেন, এসপারেন্তো ভাষায় পারদর্শী।

বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির গত গ্রীষ্ম সংখ্যায় ডক্টর এডমণ্ড প্রিভা (Edmond Privat) "A World Language" শীর্ষক প্রবন্ধে এই ভাষার আলোচনা করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য কাগজেও যামেনহফ শতবার্ষিকী সংবাদ অল্পবিস্তর বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি "দক্ষিণ এশিয়া এসপারেন্তো ফেডারেশন" স্থাপিত হইয়াছে। মহীশূর হইতে একখানা এসপারেন্তো কাগজও বাহির হইতেছে। দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে এসপারেন্তো এসোসিয়েশনও স্থাপিত হইয়াছে এবং এই ভাষার প্রচার এদেশে হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার কিছু অনুবাদও এই ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে আরও প্রকাশিত হইবে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের পূর্ব প্রান্তে বিয়ালিস্টক্ নামক সহরে ডক্টর যামেনহফের জন্ম হয় ১৮৫৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর। পৃথিবীর মানব সমাজ বিভিন্ন ভাষার প্রাচীরে ঘেরা ও বিচ্ছিন্ন। সহজ সরল অথচ প্রাঞ্জল আন্তর্জাতিক এক ভাষার মাধ্যমে মানুষের সহজ মিলনের পথকে সুগম করিবার জন্য যামেনহফ্ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে প্রচুর দুঃখও পাইতে হইয়াছিল। ১৮৮৭ সালে তাঁহার প্রথম এসপারেন্তো ভাষা শিক্ষার পুস্তক প্রকাশিত হয়। বর্তমানে দশ হইতে পনের হাজার লোক এই ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করেন। এই ভাষা প্রচারের ফলে একটি আন্তর্জাতিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে।

যামেনহফকে সম্মানিত করার জন্য ইউরোপের বহু নগরের রাস্তাঘাটে যামেনহফের নামে পরিচিত হইয়াছে। বহু রাষ্ট্রের ডাকটিকেটে যামেনহফের চিত্র ব্যবহার করা হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক রেডিও স্টেশনে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়।

১৯৪৪ সালের ইউনেস্কো সমিতির অধিবেশনে —আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে এসপারেন্তো ভাষার প্রচলন হয় এবং এই ভাষা যে ইউনেস্কোর আদর্শের পরিপূরক তাহা ঘোষণা করা হয়।

(প্রাপ্ত)

খাদ্য ও শিক্ষা সমস্যা

শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাস্থ্য ও খাদ্য বিশারদ অধ্যাপক কার্ল সইট্‌স্ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য কেন প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা জানা প্রয়োজন। সকালে বেলা বিছানা ত্যাগ করিয়া বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য অস্থির হয় এবং উদ্বিগ্ন মনে তাহারা যাহা খায়, তাহা সহজে পরিপাক হয় না এবং তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল হয় না। কারণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সুখাসনে বসিয়া না খাইলে শরীর খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে বহু ছেলেমেয়ে অভুক্ত থাকিয়াই বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত এবং তাহা প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা ছিল না। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক সইট্‌স্ বিদ্যালয়ে প্রাতরাশ পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। দেশবাসীর সমর্থন পাওয়ায় এই প্রাতরাশ প্রথা ক্রমে ক্রমে দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইতে থাকে এবং ১৯৪০ সালে শিক্ষানীতির অঙ্গরূপে ইহা সর্বত্র প্রবর্তিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নরওয়েতেও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে প্রাতরাশ ব্যবস্থাও ঠিকমত পরিচালিত হইতে পারে নাই। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হইতেছিল, তাহাও ব্যাহত হইতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পূর্ব ব্যবস্থা আবার বাহাল করা হয়। শিক্ষার পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান দেখিলেই ইহা সহজে বোঝা যাইবে।

খাদ্য সম্পর্কে আজ সকল দেশই সচেতন এবং সেজন্য প্রচুর গবেষণাও হইতেছে। ফলে খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কেও বহু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। নরওয়ের খাদ্য গবেষণা সংস্থা খাদ্যসম্পর্কে বহু সচিত্র পুস্তক ছাপাইয়া দেশের সর্বত্র বিতরণ করিয়াছেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সমাজবিদ ও স্বাস্থ্যবিদ সকলে একযোগে বিদ্যালয়ের খাদ্য ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারেন, সকলই যাহাতে পরস্পরের সহযোগী হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা।

প্রতিবৎসর সময়ে সকল ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষাকালে একটি ছাত্র বা ছাত্রীও বাদ পড়ে না। যে সকল ছেলেমেয়ে স্বভাবত স্বাস্থ্যহীন অথচ ঠিক রোগী নয়, তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পৃথক "শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিবাসে" পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয় এবং ইহার ব্যয়ভারও জাতীয় সরকার বহন করেন। যাহাদের সর্দি কাশি লাগিয়া থাকে, যাহাদের ক্ষয়রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দাঁতের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় সকল বিদ্যালয়েই থাকে।

সুইডেন

সুইডেনের বিদ্যালয়ের খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাও নরওয়ের মতই প্রাচীন; কারণ দুইটি দেশ ১৯০৫ পর্যন্ত একই রাষ্ট্র ছিল। আমি ১৯৩০ সাল ও পরে ১৯৩৩-৩৬ সালে সমগ্র দেশটি ঘুরিয়াছি। ১৯৫৩ সালেও আবার পরিদর্শন করিয়াছি। তখন বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে প্রায় বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আহার করিতাম। পূর্বে বিদ্যালয়ের খাদ্য ব্যবস্থা জাতীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত

দিল না, শিক্ষা ও সমাজসেবীগণ তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ১৯০৬ সালের মে মাসে সুইডেনের রিক্সডাগ (পার্লামেন্ট) বিশেষ বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের বলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অন্যান্য শিক্ষা সংস্থায় দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে সকল ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই আইনের শর্তগুলি মোটামুটি এইরূপ :—

এক—যে কোন অর্থাৎ সকল বিদ্যার্থীই বিদ্যালয়ে খাবার পাইবার অধিকারী।

দুই—এই খাদ্য পরিবেশন বিনামূল্যে করিতে হইবে।

তিন—খাদ্যবস্তুর অন্ত হইবে দুধ, মাখন, রুটি, তরকারি, ফল ও এক প্লেট পক্ক খাদ্য।

চার—ভোজনশালা ও পরিবেশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতির অনুবর্তী হইতে হইবে।

পাঁচ—ভোজনশালার কর্মী নিয়োগের পূর্বে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

সুদূর পল্লী অঞ্চলে যেখানে উপরোক্ত ব্যবস্থা সর্বতোভাবে অবলম্বন করা সম্ভব নয়, সেখানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা থাকিবে।

এক—যে সকল ছেলেমেয়ে দূর হইতে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে তাহাদিগকে বিনামূল্যে খাদ্য পরিবেশন করিতে হইবে।

দুই—যে সকল ছাত্রছাত্রী সবল নয় তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে খাওয়াইতে হইবে।

তিন—যে সকল পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয় সেই সকল পরিবারের ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে খাদ্য দিতে হইবে।

চার—যে সকল ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া খাবার পায় না, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে খাদ্য দিতে হইবে।

যে সকল মিউনিসিপালিটি বিদ্যালয়ের খাদ্যের ভার বহন করিতে অসমর্থ, সেই স্থানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকোষ হইতে সাহায্য দিতে হইবে।

সুইডেনের বিদ্যালয়গৃহ ও ভোজনশালা প্রভৃতির জন্য প্রচুর ব্যয় করা হয়, সেজন্য বিদ্যালয়গুলি দেখিতে রাজপ্রাসাদের আকার ধারণ করিয়াছে। জনস্বাস্থ্যের উপর দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও দেশবাসীর কর্মক্ষমতা নির্ভর করে, এই তথ্যটিকে স্মরণ করিয়া সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছে ও হইতেছে।

বড় বড় বিদ্যালয়ে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে বসিয়া আধুনিকতম ব্যবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করে। আবার অতি ক্ষুদ্র পল্লীবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও আধুনিকতম। আমি ইচ্ছাপূর্বক একটি অতি ক্ষুদ্র পল্লীবিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই বিদ্যালয়ে ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা মাত্র ১৪জন ছিল। সেখানে একজন শিক্ষক ও একজন পাচিকা।

বিদ্যালয়ে খাদ্যদানের নিয়ম এইরূপ : প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে দিনের প্রয়োজনীয় ক্যালরির এক তৃতীয়াংশ, প্রয়োজনীয় আলবুমেন অর্ধেক ও প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারলস্ বিদ্যালয়ে পরিবেশন করিতে হইবে।

ডেনমার্ক

নরওয়ে সুইডেনের ন্যায় ডেনমার্কের বিদ্যালয়েও খাদ্য পরিবেশন প্রথা প্রাচীন। ইহা শিক্ষানীতির অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত। ডেনমার্কে বিদ্যালয়ের খাদ্য সম্পর্কে প্রথম আইন করা হয় ১৯০২ সালে। ১৯৩৩ সালে সেই আইন পরিবর্তন করিয়া খাদ্য ব্যবস্থা আরো পাকা করা হয়।

বিদ্যালয়ে, বিশেষ করিয়া শীতকালে, খাদ্যের সঙ্গে কডলিভার অয়েল বা ঐ জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিপোষক ঔষধও খাওয়ান হয়।

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য পরিবেশন প্রথার ইতিহাস বিচিত্র। দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যালয়ের খাদ্যব্যবস্থা সময় সময় পরিবর্তিত হইয়াছে ও ক্রমশ উন্নতির পথে চলিয়াছে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ডেভনশায়ারের কোন কোন বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন করা হইত বলিয়া জানা যায়। ১৮৬৪ সালে Destitute Children's Dinner Society স্থাপিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পর সমাজসেবা সংস্থাগুলির উদ্যোগে লণ্ডন নগরীতে ৫৮টি ভোজনশালা স্থাপিত হয়। পরে London Dinner Association ও স্কুলবোর্ড একযোগে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য কতকগুলি ভোজনশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ বাধিলে সৈন্য সংগ্রহের প্রশ্ন ওঠে। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দেশের তরুণ-তরুণীর স্বাস্থ্যের অবনতির বিষয় তখন প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। প্রথম মহাসমরের সময় অর্থাৎ ১৯১৪—১৮ সালে বিদ্যালয়ের খাদ্য পরিবেশন প্রথা উন্নত হয়। পরে ১৯২২ ও ১৯২৬ সালে ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। তখন বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদিগকে খাদ্য পরিবেশন করিতে হয় এবং ব্যবস্থাদিও উন্নত হয়। ১৯৪০ সালে ছাত্রছাত্রী-দিগকে দুগ্ধ দান ও বিনামূল্যে পক্ব খাদ্য দিবার প্রথা সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। ১৯৪৬ সালের ২৮শে মার্চ শিক্ষামন্ত্রী বিনামূল্যে সকল বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন করার প্রস্তাব করেন এবং আশ্বাসও দেন যাহাতে ইহা কার্যকরী করা সম্ভব হয়। ইহারও পূর্বে ১৯৩৪ সালে Milk marketing Board অর্থাৎ দুগ্ধ বোর্ড একযোগে স্বাস্থ্যহীন বালক বালিকাদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ দানের ব্যবস্থা করেন। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে খাদ্যদানের ব্যবস্থাও ক্রমশ উন্নত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডেভনশায়ারে (Devonshire) বিদ্যালয়ে খাদ্য ও দুগ্ধ দানের ব্যবস্থা কিরূপ এখানে তাহা দেখান হইতেছে এবং ইহা হইতে সমগ্র রাষ্ট্রের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাইবে।

		প্রাথমিক	মাধ্যমিক
		১৯. ২. ৫৩.	১৬. ৬. ৫৩
(ক)	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৫৬৪	৫৬৮
(খ)	খাদ্যার ছাত্রের সংখ্যা	৫৯,১৭৩	৬০,৮৫০
(গ)	উপস্থিত ছাত্রের সংখ্যা	৪৯,১৭৫	৫০,৮০২
(ঘ)	বিদ্যালয়ে খাদ্যসেবীর সংখ্যা :		
	(১) অর্থের বিনিময়ে	২৯,৪৬১	২৭,১৯৭
	(২) অর্ধেক মূল্যে	×	১,১৪২
	(৩) বিনামূল্যে	২,৭৬৪	৪,২৭৪
(ঙ)	খাদ্যগ্রহণকারীর হার শতকরা	৬৫·৫৩	
		শতকরা	৫৯·৫২
(চ)	বিদ্যালয়ে দুগ্ধসেবীর সংখ্যা		
		৩৮,১০৪	৪৩,৯৬৯
(ছ)	দুগ্ধগ্রহণকারীর সংখ্যা শতকরা	৭৮·৩০	
		শতকরা	৭৮·৭৯

Balanced Menus for school-children ও Canteen Dinner সম্পর্কে সাহিত্যও প্রচুর বাহির হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন সম্পর্কে শিক্ষা ও খাদ্য বিশারদ বলেন—"It must affect the structure of our schools. It may in time affect many of our educational ideas." Ref : Social History of School Meal Services : Published by the National Council of Social Services.

আমাদের করণীয়

ইউরোপের বিভিন্নদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ ঐক্যতানে বিবর্তিত হইতেছে। স্বাস্থ্যহীনের পক্ষে শিক্ষালাভ কঠিন, আবার স্বাস্থ্য নির্ভর করে উপযুক্ত খাদ্যের উপর।

আমাদের দেশে আবশ্যিক শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য সমস্যার সমাধানের উপায় না করিলে

এবং খাদ্য গ্রহণ বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত না করিলে দেশ গঠনের কাজে সার্থক হইয়া উঠিবে, এরূপ ভরসা করা যায় না। যে দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু মাত্র ৩২ বৎসর, সে দেশের সাধারণ অধিবাসীদের পক্ষে কর্মে, চিন্তায় ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য রচনায় মহান কিছু গড়িয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন দেশের অধিবাসীকে স্বাস্থ্য দান করা সম্ভব নয়; স্বাস্থ্য আহরণ করিতে হয়। বলা যাইতে পারে, আমাদের রাষ্ট্রের আয় বিদ্যালয়ে খাদ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট সচ্ছল নয়। কিন্তু এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে :—

এক—খাদ্যাভাবে কত বালকবালিকা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ?

দুই—অসতর্কতা কত শিশু অখাদ্য বা কুখাদ্য খাইবার ফলে স্বাস্থ্যহীন?

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যে বয়সে বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে যোগ দেয় সেই বয়সে শারীরিক বৃদ্ধির গতি প্রবল থাকে। সাত বৎসর হইতে পনের বৎসর বয়সের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের ওজন প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং উচ্চতাও অন্তত ২৫ ভাগ বেশী হয়। বিদ্যালয়ে লেখাপড়া, হাতের কাজ শিক্ষা ও সেই বয়সের উপযোগী খেলাধূলার শক্তি তাহাদের থাকা চাই। এই বয়সে তাহারা যাহা খায়, তাহার উপরই তাহাদের পরবর্তী কালের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এই বয়সে যা তা খাইয়া পেট ভরাইলেই শুধু চলে না। শরীর বৃদ্ধির সহায়ক খাদ্য তাহাদের পাওয়া চাই। শরীরের হাড়ের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম (Calcium), পেশীর জন্য প্রোটিন, রক্তের জন্য প্রয়োজনীয় খাতববস্তু ও উপযুক্ত ভিটামিন নিতান্তই দরকার। রোগ-প্রতিষেধক খাদ্যেরও প্রয়োজন। যে শিশু উপযুক্ত খাদ্য খায়, যাহার স্বাস্থ্য ভাল, সে সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। এমন কি শরীরের অভাব জানিয়া খাদ্য নির্বাচন করিয়া খাইলে বহু ব্যাধির কবল হইতেও মুক্ত থাকা যায়। খাদ্যাভ্যাস সকলের একরূপ নয় কিন্তু স্বাস্থ্যের পরিপোষণকারী খাদ্যবিজ্ঞান আজ মানুষের জানা আছে। শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু খাদ্যবিজ্ঞান পড়াইলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব হইবে না। জাতীয় স্বাস্থ্যকে সবল করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্য উৎপাদনের জ্ঞানও বিদ্যালয়ে দিতে হইবে।

যুনিয়াদি শিক্ষানীতিতে 'খাদ্য'-উৎপাদনকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দেওয়ার কথা আছে। শিক্ষাদান চরম উদ্দেশ্য হইলেও খাদ্যনিরপেক্ষ নয়; সেজন্য আজ আমাদের পক্ষে প্রয়োজন :—

এক—খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যবিজ্ঞানের চর্চা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া। তাহা নিছক পঠন ও বক্তৃতার বিষয় না হইয়া হাতেকলমে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। পল্লীবিদ্যালয়ে শাকসবজি, ফলমূল ফলাইবার ব্যবস্থা প্রয়োজন, গো-পালনও একই সঙ্গে শিখাইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ে এই দুইটিই প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

দুই—বিদ্যালয়ে উৎপন্ন তরিতরকারি, ফল ও দুধ বিদ্যার্থীরা ভোগ করিবে। শিক্ষাবিভাগের আর্থিক সহায়তা পাইলে সকল বিদ্যার্থীকে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অন্তত এক তৃতীয়াংশ খাইতে দেওয়া উচিত। এই পথে খাদ্যের অপচয়ও রোধ হইবে। খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সকলকে (ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক) সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

তিন—যে যে ফল যে অঞ্চলে সহজে হয়, তাহা পল্লী বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে ফলাইতে হইবে।

চার—পল্লীবিদ্যালয়ে গো-পালন শিক্ষা দেওয়া মোটেই কঠিন বলিয়া মনে হয় না। গো-পরিচর্যা শিক্ষার বড় উপকারিতা এই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা

শেষ হওয়ার পর সকলেই খাটে বসিয়া, যার যার পাই হইবে, প্রয়োজনীয় দুধ পাইতে পারে এবং বিদ্যালয়ের বাগানের প্রয়োজনীয় গোবর সহজে পাওয়া যাইবে।

দুধ একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, যাহাতে সকল বিদ্যার্থী মাথাপিছু অন্তত এক পোয়া দুধ পায়, সেই হিসাবে গাইয়ের সংখ্যা স্থির করিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যমে এই পথে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সচেতন করিয়া সর্বসাধারণের খাদ্য-সমস্যা সমাধানকে সহজতর করিতে পারি। সুখাদ্য ও সুস্বাস্থ্য, পরিপূর্ণ জীবন লাভের প্রধান ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে দৃঢ় না করিলে জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইতে পারা যায় না।

খাদ্য ও বিজ্ঞান

গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যেখাদ্য-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে; ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল জানা গিয়াছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগের প্রতিকার সম্পর্কে অনেক তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা গিয়াছে। যে সকল দেশে এই বিজ্ঞানজাত জ্ঞান প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই সকল দেশেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও দীর্ঘতর জীবনলাভ সম্ভব হইতেছে, দেশবাসীর কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান যথাযথভাবে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আজ আমাদের প্রধান কাজ। ভারতবাসীকে দীর্ঘায়ু হইতে হইলে অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় খাদ্যশস্য ও দুধ উৎপাদন—এককথায় খাদ্য বিজ্ঞানকে শিক্ষার সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত করিলেই তাহা সম্ভব। স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশের লোক-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিদেশ হইতে খাদ্যবস্তু আমদানি করিয়া খাদ্যাভাব দূর করিতে পারিলেও তাহা জাতিকে শক্তিমান করিবে না।

দীক্ষান্ত ভাষণ

[ইংরাজি বর্ষের শেষের দিকে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব হয়, এবং সেই সকল উৎসবে নানাপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা চিন্তাশীল মনীষিরা ব্যক্ত করেন। কথাগুলি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, সাধারণ বিদ্যালয়ের কর্মীরাও ভাবিয়া দেখিতে পারেন। আমরা সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংকলন করিয়া দিতেছি।—সম্পাদক]

খড়্গপুরে

সোমবার সকালে খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব টেকনোলজির পঞ্চম সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় গণ-তন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি দেশের স্বার্থকে ব্যক্তি-স্বার্থের উপর স্থান দিতে এবং প্রয়োজন হইলে জাতীয় স্বার্থে দেশবাসীকে আত্মত্যাগে প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান।

দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, গণতন্ত্র ব্যক্তিকে যেমন কতকগুলি মৌলিক অধিকার দিয়াছে তেমনি গণতন্ত্র ব্যক্তির নিকট হইতেও সমতুল দায়িত্ব পালনের দাবি রাখে।

উক্ত অধিকার ও দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ প্রসাদ নূতন স্নাতক এবং ইঞ্জিনীয়ারদের দেশগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে ভারতে কর্তব্যপালন অপেক্ষা অধিকার আদায়ের উপর

জোর দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। সাধারণভাবে ছাত্রসম্প্রদায়ও আজ অধিকার আদায়ের উপর এই ভুল গুরুত্ব আরোপের দোষে দোষী এবং তাঁহারা দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্ব আরোপে অবহেলা করিতেছেন। সমাজের আরও কয়েকটি শ্রেণী সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। অধিকার দাবি ও কর্তব্য পালনের মধ্যে নাগরিকসাধারণ কর্তৃক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উপরই দেশ পর্যন্ত গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে বলিয়া ডাঃ প্রসাদ মন্তব্য করেন।

ভারতের অগ্রগতির উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ প্রসাদ বলেন যে, যে অগ্রগতি ও সাফল্য তাঁহারা অর্জন করিয়াছেন তাহাতে কাহারও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ইহা কেবল সূচনা। ভবিষ্যতে আরও ভাল ফল ফলিবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। পুনর্গঠন এবং বিশেষ করিয়া শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক উদ্দেশ্য সাধনে প্রণোদিত দেশবাসী যদি সহযোগিতা দেয় তাহা হইলে এই শুভ সূচনাকে মহান রূপদানে তাঁহারা সফলকাম হইবেন এবং পরিণামে দেশ সত্যকারের কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন যে, সমৃদ্ধির পথ আকর্ষণীয়, প্রেরণাপ্রদ হইলেও উহার পথ অবর্ণনীয় অসুবিধা ও দুঃখকষ্টে সমাকীর্ণ। ঐ পথে অগ্রগমনের জন্য কঠোর শ্রম ও অধিপ্রাণ চেষ্টা এবং অতীতের অভিজ্ঞতা ও নিজের ভুলভ্রান্তি হইতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা চাই।

ভারতে গণতন্ত্রের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়া ডাঃ প্রসাদ বলেন যে, ভারত ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়া ও ভেদাভেদ না করিয়া সকলের প্রতি সমব্যবহারের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং গণতন্ত্রসম্মত জীবনপ্রণালী অনুসরণ করা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন গতি নাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলের প্রতি ন্যায়বিচারের স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং উহা ভারতীয় জনসাধারণের বিভিন্ন দিকের সুষ্ঠু উন্নয়ন সম্ভব হইবার প্রচেষ্টা এবং ধনসম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। উহা সমস্ত প্রকার পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের বিরোধী। তাঁহাদের আদর্শে পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করিতে চাহেন না। কোন প্রকার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপেরও তাঁহারা বিরোধী।

ডাঃ প্রসাদ আরও বলেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রসম্মত জীবনযাপনের দুইটি দিক আছে—প্রথমত, নাগরিকরূপে তাহার অধিকারসমূহ এবং দ্বিতীয়ত, নাগরিকরূপে তাহার কর্তব্যসমূহ। অধিকার দাবি ও কর্তব্য পালনের মধ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। অধিকারের উপর বেশী জোর দিলে গণতান্ত্রিক যন্ত্র বিকল হইবে। সেইরূপ অধিকার সমূহের স্বীকৃতি না দিয়া কর্তব্যসমূহের উপর বেশী জোর দিলে জাতি যন্ত্রে পরিণত হইবে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার দ্বারা গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হইবে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা এক ছাঁচে ঢালাই হইয়া যাইবে। সুতরাং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

সমাবর্তন উৎসবের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছাত্রদের মধ্যে বিদেশী ডিগ্রি লইয়া ভারতের বাহিরে যাইবার যে প্রবণতা দেখা দিয়াছে অনেকক্ষেত্রে পরিণামে উহা ক্ষতিকর হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করেন। স্বদেশের সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং সমস্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হইয়া বিদেশে শিক্ষার জন্য যাওয়ার পরিণাম ক্ষতিকর হইতে পারে বলিয়া ডাঃ রায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডাঃ রায় ইনষ্টিটিউটের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতের সকল অঞ্চলের ছাত্রই এখানে

শিক্ষা লাভ করিতেছে। ভৌগোলিক বিভেদ তাহাদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যায়তনের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সর্বদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। এই যোগাযোগ শুধু যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে এমন নহে, খেলাধূলার ক্ষেত্রেও যোগাযোগ রহিয়াছে।

ডাঃ রায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, শিক্ষাদানই শিক্ষকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। ছাত্রদের অন্তরে জাতীয় মনোভাব এবং আদর্শবাদ জাগাইয়া তোলা শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশের খাদ্যসমস্যার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা হইতেছে দেশোন্নয়নের মূল কথা। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ভারত কৃষিপ্রধান দেশই থাকিবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কৃষি-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন এই দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁহাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের দায়িত্ব পালন করিয়া ঐসব ছাত্র জাতির প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য পালনে ব্রতী হইবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

বাসস্থানের অভাবের উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই ইনস্টিটিউটে নগর পরিকল্পনা শিক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণ বাসস্থানের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিবে।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট জমি বা বনসম্পদ না থাকিলেও প্রচুর খনিজসম্পদ রহিয়াছে। এই খনিজ সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই সঙ্গে এই রাজ্যের উন্নতিও সাধিত হইবে। এই বহুৎ প্রচেষ্টায় ভূতত্ত্ববিদ্যা তাঁহাদের সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

বিদেশে বৃত্তি লইয়া যাইবার যে প্রবণতা ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়াছে উহার প্রসঙ্গে ডাঃ রায় আরও বলেন যে, দেশের সমস্ত সমস্যার সহিত সুপরিচিত না হইয়া বিদেশে শিক্ষা লাভের জন্য যাওয়া ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। বিদেশে গিয়া শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এবং দীর্ঘকালের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কারখানায় কাজ করিবার সুযোগ পান সত্য কিন্তু তাঁহারা যখন ভারতে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে আসেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের অধিগত বিদ্যার যথোচিত প্রয়োগে ব্যর্থকাম হন এবং ফলে অনেকখানি নিরাশ হন।

ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ সেনগুপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাভবন ও অন্যান্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য ৩ কোটি টাকার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ঐ সব সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের সমন্বয় কোর্সটি পরবর্তী সেসন হইতে শুরু হইতেছে বলিয়াও ডাঃ সেনগুপ্ত জানান।

ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে পত্রপুষ্পশোভিত মঞ্চের উপর হইতে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সমাবর্তন ভাষণ দেন। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ এস কে সেনগুপ্ত নূতন স্নাতকদের মধ্যে উপাধি বিতরণ করেন।

শ্রীসত্যকাম গুপ্ত ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই বৎসর সকল বিষয়ে মোট ৩২০ জন স্নাতক এবং ১২৩ জন স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। ২০ জন ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিতদের বেকার সমস্যার উল্লেখ

রবিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপক বেকারসমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন, তাঁহার মনে হয় উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাবের দরুণই চাকুরি ও বেকারি সহাবস্থান করিতেছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, যখন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটিতেছে তখন কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার অভাব ঘটিবে, ইহা চিন্তা করা যায় না। তাঁহার বিশ্বাস, বিভিন্ন পদ যত দ্রুত পূরণ হওয়া উচিত ততটা দ্রুত পূরণ হইতেছে না। তিনি ছাত্রসমাজের উদ্দেশে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানান।

বর্তমানে ছাত্রসমাজের মধ্যে "সর্বাধিক উদ্বেগজনক" লক্ষণরূপে যে অসন্তোষের প্রবাহ লক্ষিত হইতেছে তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন যে এই ব্যাপার গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। ভারতীয় ছাত্র মানসিক দিক হইতে সচেতন, তাহার আত্মবিশ্বাস এবং দেশপ্রেম প্রবল। কিন্তু কতকগুলি কারণে তাহার মধ্যে এমন একটি নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটিয়াছে যাহার ফলে সামাজিক ভারসাম্য-হীনতার উদ্ভব হইয়াছে।

ভারত এবং বিশ্বের পরিবর্তমান ঘটনাসমূহের পটভূমিকায় রাষ্ট্রপতি এক দিকে লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন এবং অপরদিকে সামর্থ্য ও উহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের অনুসন্ধিৎসাকে সহায়তা করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত নিম্নতর স্তরের উন্নতি সম্পর্কে প্রায়ই নানা ধরণের সমালোচনা করা হইতেছে। এইরূপ বলা হয় যে, গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে ভারত অপেক্ষা আয়তনে ছোট অনেক দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এই দেশের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব দেশের সহিত ভারতের মত বিপুল দেশের কোন তুলনা হয় না। ভারতে জনসংখ্যা বিপুল এবং বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মমতের অস্তিত্ব এমন সব সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে যাহা ঐসব দেশে নাই।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যার সন্তুষ্টই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানও জড়িত আছে। যেমন ১। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা; ২। ভাষার সমস্যা; ৩। অতীত ঐতিহ্য; ৪। আশু প্রয়োজন; ৫। বেকার সমস্যা প্রভৃতি। এই সকল প্রশ্ন সম্মুখে না রাখিয়া শিক্ষা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। আমাদের এইজন্যই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

কলা-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রবল। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব ভাল, কিন্তু এই নির্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্রছাত্রীরাই যে চাকুরি পাইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

ছাত্রসমাজের মধ্যে অসন্তোষের উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন, অনেকে মনে করেন যে, উহা পরিবর্তনের সময়ের লক্ষণ। সময়ে অবস্থা বদ্ধ খিতাইয়া আসিবে ততই 'আপনা আপনিই' পরিস্থিতির উন্নতি হইবে। ততদিন পর্যন্ত এখানে সেখানে ধর্মঘট বা বিক্ষোভ ঘটিবেই। কিন্তু তাঁহার মনে হয়, ছাত্রদের মধ্যে উল্লিখিত উপদ্রব সম্পর্কে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। ছাত্রদের মধ্যে বর্তমানে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটিয়াছে তাহা দূর করিয়া যুবসমাজ এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উপযুক্ত সঙ্গতি বিধানের জন্য

আমরা যদি কিছু ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে বর্তমান অবস্থার উন্নতির আশা করা যায় না।

ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আবার বলেন, ভারত এক্ষণে নূতন নূতন সুযোগের সম্মুখীন হইয়াছে। ছাত্রসমাজ যদি এই সময়ে সেবাব্রত এবং সহযোগিতার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন না করে তাহা হইলে জাতি গঠনের কাজ ব্যাহত হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম যে জাতির জাগরণের সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা ছাত্রদের স্মরণ করাইয়া দেন এবং তাহাদের ঐ আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু তাঁহার ভাষণে পুরাতন রীতি-নীতি ও নূতন যুগধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, রক্ষণশীলতা, গতানুগতিক জীবন-যাত্রা ও আচার-আচরণ জনগণকে ধরিয়া রাখে, সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে। সমাজ ও অর্থনীতি যদি অনড় হইয়া থাকে, তবে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আণবিক অস্ত্রের যুগে আমরা তীর-ধনুক লইয়া থাকিতে পারি না।

তিনি বলেন, আমরা বর্তমানে বিশ্ব ইতিহাসের এবং আমাদেরও জাতীয় উন্নয়নের এক উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের ভিতর দিয়া যাইতেছি। এই সময়ে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের চিন্তাসূত্র ধরিয়া চলিলে হইবে না। এখন ঐক্যবদ্ধ ও একলক্ষ্যমুখী চিন্তার প্রয়োজন—তীক্ষ্ণ মেধা ও শক্তিসমর্থ দেহের প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমাদের এখন এমন সব লোকের দরকার যাহাদের চরিত্রে আছে দুঃসাহসিকতা, দেশের প্রতি ও নিজের প্রতি আছে বিশ্বাস। এইসব লোকই দেশকে প্রগতির পথে লইয়া যাইবে। শ্রী নেহরু বলেন যে, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহার গভীর আস্থা রহিয়াছে। কখনও কখনও পতিতদের ব্যক্তিদের মধ্যে এই আস্থা শিথিল হইলেও অগণিত জনসাধারণ কখনও আস্থা হারায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, ভারতীয় জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তিই যুগ যুগ ধরিয়া দেশকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রী নেহরু বলেন, কখনও কখনও আমাদের পতন হইলেও আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে বরোপারী হই নাই বা আত্মসমর্পণ করি নাই। ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহার পূর্ণ আস্থা আছে। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি দেশবাসীর নিকট হইতে কঠোর শ্রম, আত্মত্যাগ ও বিপদের সম্মুখীন হইবার মত সাহস দাবী করিতে পারি। কোন দেশ যদি বিপদের মুখোমুখি হইবার সাহস না রাখে তবে সেই দেশ আত্মতুষ্টির বিলাসে নিমগ্ন হইবে।

শ্রী নেহরু বলেন, দেশ আজ বর্তমান জীবন-যাত্রার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছে। এই অবস্থায় তাঁহারা বিজ্ঞান ও কারিগরী জগতের আধুনিকতম অবদানগুলির প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। ভারত এক প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ভিতর দিয়া যাইতেছে। মানুষের মনকে ইহা মাতাইয়া তুলিতেছে। বর্তমান যুগে যাহারা এই পরিবর্তনের সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে না পারিবে, তাহারা অন্যান্য লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ফলেই এই সব লোকের বৃদ্ধি ঘটিবে না, কারণ সমষ্টিগত জাতীয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি ও জাতির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হয়।

শ্রীনেহরু বলেন যে, দেশ আজ এমন এক হরবতর ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, যাহা অন্য কোন দেশে দেখা যায় নাই। এই ব্রত হইতেছে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্রত। মূল অসুবিধা যে অর্থের অভাব হইতেছে তাহা নয়, গতানুগতিক জীবনযাত্রার লোকের সংস্কার এত বদ্ধমূল যে পরিবর্তনকে তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা ভুলিয়া যায় মানুষই যন্ত্র তৈয়ার

করিয়াছে, যন্ত্র মানুষ তৈয়ার করে নাই। কাজেই সচল মনের দরকার—যা নূতন নূতন পরিবর্তনকে নূতন নূতন ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে পারে। কৃষকদের যত রক্ষণশীল বলিয়া ধারণা করা হয়, তাহারা তত্টুকু রক্ষণশীল নয় বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। কথা হইতেছে ব্যাপারটি কি ভাবে তাহাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে। কৃষকদের নিকট কৃষকদের মত মন ও সহানুভূতিবোধ লইয়াই যাইতে হইবে—উচ্চতর মানুষ হিসাবে নয়। তবেই তাহারা আমাদের কথা শুনিবে ও বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তথাকথিত উচ্চ-নীচ জাতিভেদ না ঘুচাইলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না।

শ্রীনেহরু বলেন, বিশ্বভারতীর একটি বিশেষ সার্থকতা আছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে সাধারণ উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায় না। যদি পৃথক করিয়া লওয়া যায় তবে জাতীয় জীবন-ধারা হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, আবার সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজের সত্তা মিশাইয়া দিলে ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে না।

শ্রীনেহরু সকলকে গুরুদেবের আদর্শ স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে স্বদেশের মাটি অথবা জাতীয়-জীবনের ধারা হইতে কোন সমাজের মূল ছিন্ন হওয়ার মত বড় বিপদ আর কিছু নাই। কাজেই গুরুদেবের আদর্শ জনসাধারণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার আদর্শে সঙ্কীর্ণতার বা অচল মতবাদের স্থান নাই। তাহাদের আরও মনে রাখা উচিত যে চলমান জীবনধারার সহিত তাহাদিগকে চলিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, চিরন্তন গতিশীলতার কথা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, জাতীয় জীবনের ধারাকে স্বদেশের মাটিতে দৃঢ়মূল রাখিয়াও সদা-পরিবর্তনশীল জগতের সহিত কিভাবে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইতে পারে? ইহা একটি বড় প্রশ্ন।

কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এই পরিবর্তনের স্রোত যতই দ্রুততর হইবে, বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হইয়া লাভ নাই। কোন বিদ্যাভবনে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের যদি অবনতি ঘটে তবে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই বানচাল হইয়া যায়। শুধু ক্লাসে নহে ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারা শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তোলা সম্ভব। তিনি মনে করেন যে সুযোগের অভাবেই এই যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে না, কোন শুভেচ্ছার যে অভাব আছে তাহা নয়। গুরু-শিষ্যের এই ব্যক্তিগত সম্পর্কই শিক্ষার প্রকৃত বনিয়াদ।

ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তোলার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু গতকল্য এলাহাবাদে বলেন, দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তোলার জন্য বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ভারতে তিনটি নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কথা তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন। এই সকল কারখানা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ ভারতীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে চাহেন। ইঞ্জিনীয়ারদের উপরই এই সকল বৃহৎ কার্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

শ্রীনেহরু বলেন, শুধু যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যেই ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তাহা নহে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অনেক সময় দ্রুত ফল পাওয়া যায় এবং ইহা জনসাধারণের মনে প্রেরণার সঞ্চার করিতে পারে। ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ারসের উত্তর প্রদেশ কেন্দ্র কর্তৃক শ্রীনেহরুর সম্মানার্থে রাজভবনে

আয়োজিত এক ভোজসভায় শ্রীনেহরু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আমরা বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল এক বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিতেছি। গত কয়েক পুরুষের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ফলে পৃথিবীতে মানবজীবন সম্পর্কে ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা উৎপাদনপ্রচেষ্টায় এতদূর সহায়তা করিয়াছে যে, মানুষের পক্ষে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে মোচনের কথা চিন্তা করা সম্ভব হইয়াছে। বহু পাশ্চাত্য দেশে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর মধ্যে চেতনার সঞ্চার করিয়া শিক্ষা, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের নিযুক্ত করিতে হইবে। একটি সমাজকে চিরাগত সংস্কারের পটভূমিকা হইতে টানিয়া তোলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ইঞ্জিনীয়ারদের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সহজ, আইনজীবীদের পক্ষে নহে।

গণতান্ত্রিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজের জন্য শিক্ষা

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ৩৫তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দানকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মন্তব্য করিয়া বলেন যে, এমনভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে, যাহাতে শিশুরা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, পরিবার সমাজ ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের কর্তব্যের কথা বুঝিতে পারে।

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বলেন, আমাদের দেশের বৃহৎ শিল্প পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই শিল্পসংঘের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজ কর্তব্য পালনের জন্য ব্যক্তিকেও প্রস্তুত করিতে হইবে। হাত ও মাথা চালাইতে পারিলেই চলিবে না। বেশিমও চালাইতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার সময়ই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুশিক্ষক রাখা এবং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বাঙ্গলা ভাষার রচনাশৈলী

ভারতীয় হিন্দী শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, ঐশ্বর্যশালী ও অতি উন্নত শব্দভাণ্ডার শব্দ, বাক্যরীতি ও শৈলী হিন্দী ভাষায় গ্রহণ করা উচিত। তিনি অবশ্য বলেন, ভারতের অধিকাংশ লোক হিন্দী ভাষা বুঝিতে পারে বলিয়াই উহাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরিষদের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রশংসা করেন। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এইদিন অনুষ্ঠানে হিন্দী ভাষার বিভিন্ন পরীক্ষায় ৩৩০ জন ছাত্রছাত্রী অভিজ্ঞানপত্র লাভ করেন। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন চীনাও আছেন।

শিশুশিক্ষার দু'চার কথা

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনি হয়তো সপরিবারে গেছেন অন্যদিনে নিমন্ত্রিত হয়ে। সংগে আপনার সাত বছরের পুত্র শ্রীমান্ বন্টুকে নিয়েছেন। সেখানে আমোদ-আহ্লাদে-হুল্লোড়ে কিছুটা সময় সংসারের ন্যাকাশ যন্ত্রণার মাঝে খানিকটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পেলেন। পেলেন নতুন পুরোনো অনেক মুখের সাক্ষাৎ আলাপের মাধ্যমে। আলাপ আলোচনায় হাসি তামাসায় কখন যে পুরো দু'ঘন্টায় এসে আপনার ঘড়ির কাঁটাটা লেগেছে, তা বুঝতেই পারলেন না। ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বন্ধুবান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লেন।

এদিকে শিশুপুত্র শ্রীমান বন্টুর দিকে কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার ও আপনার স্ত্রীর লক্ষ্য নিশ্চয়ই পড়েছে। সে যেন কিছু অপরাধ করেছে বলে মনে হচ্ছে! আদর করে চিবুকটা তুলে ধরে বললেন কিরে বন্টু! শরীর টরীর খারাপ নাকি? মুখে জোর করে হাসি এনে বন্টু জবাব দেয় তার কিছু হয়নি। আপনি নিশ্চিন্ত হলেন। আপনার স্ত্রী কিন্তু এটুকু শুনে চুপ করে থাকলেন না। তিনি জবাবদিহ কপালে বুকে পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন—কেন সে এমনি করে বসে আছে? জ্বালায় তার বুকে হাত দিতে উঁহু মত কি যেন মনে হল।

তিনি কোটের বোতাম খুলে সোফেটারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বুক পকেট থেকে আবিষ্কার করলেন একটা পার্কার পেন! নিমেষে শিহরিতা হয়ে উঠলেন তিনি এবং সাতবছরের শিশুপুত্র বন্টুর কর্মকাণ্ডটা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন।

আপনি তখন চোখে সাপলা দেখলেন। বুঝতে বাকী থাকলো না যে—এই কলমটাই কোন একটা প্রবাসী বন্ধুর ঠিকানা লিখে নিতে গৃহস্বামী বন্ধুর স্ত্রীর কাছ থেকে একবার নিয়েছিলেন এবং তখুনিই উহা ফার্স সমাধা করে ফেরৎ দিয়েছিলেন তার হাতে। বলা বাহুল্য তিনি হয়তো 'পেন'টা বন্ধুর জামার পকেটে না তুলে টেবিলেই রেখেছিলেন। তখন সাত বৎসরের পুত্রের কর্ম দেখে তিনি অবাক! শুধু অবাক নয়, খানিকটা বিস্ময়ও বোধ করলেন। কেন এমন হল? আপনার পুত্র চুরি বিদ্যা শিখলো!

মনে অনেকটা কষ্ট লাগলো! সবারই তাই লাগে! কেন? পরের জিনিসে না বলে হাত দেয়া? এর চেয়ে বড় দোষ আর কী হতে পারে? আপনার স্ত্রী হয়তো বললেন: চল ফেরৎ দিয়ে আসা যাক। পুত্রের হাত দিয়েই কলমটি তাদের হাতে দেয়া যাবে। ট্যাক্সি ফেরাতে বল। আপনি তখন চিন্তা করে দেখলেন—কতদূর এসে পড়েছেন। এখন ঐ কলম ফেরৎ দিতে গেলে বাড়ী ফিরতে বেশ খানিকটা রাত হবে। উপরন্তু ট্যাক্সি ভাড়াও যে বেশ কিছু বেড়ে যাবে, তা বলাই বাহুল্য মাত্র। আরোও একটা দিক আছে—আমার পুত্র যে কলম চুরি করেছে তা' বন্ধুর কাছে প্রকাশ করতেও কেমন আত্মসম্মানে বাধে। তাই স্ত্রীর অতিমতকে সানুনয়ে চাপা দিতে থাকেন এবং আপনারই জয় হয়।

এই যে পরের জিনিসে না বলে হাত দিল আপনার ছেলে, একটু ভেবে দেখেছেন কী কেন এ কাজ আপনার ছেলে করলো? সারাদিন যদি আপনারা ছোটদের দোষ ত্রুটিগুলো বিচার করে দেখেন, তখন আমরা যারা ছোটদের শিক্ষা-জ্ঞান এবং সৎপরামর্শ দিই, সকাল সন্ধ্যে তাদের শিষ্টাচার শেখাতে শেখাতে কাটাই, আমাদের নিজেদের ভুল

চোখে পড়বে আগে। বলা বাহুল্য, যদি সেটা আমরা চিন্তা করে দেখি।

আজ যারা আমাদের মাঝে ছোট, তাদের স্বাভাবিক সাধ বেড়ে ওঠা। অনুকরণপ্রিয় শিশুদের স্বভাব দেখে শেখা। এটাই যুগ যুগ চলে আসছে। তা যুগধর্মই বলুন আর যাই বলুন।

উপদেশে তারা অর্থাৎ শিশুরা কান দেবেই না। তার কারণ, তারা মনে করে—আমরাও বড় হলে, অফিস যাবো, আমরা কাকা মাষ্টার মশাইর মত আমরাও বিয়ে করবো, সিগারেট খাবো, ছোটদের ধমকাবো, যা ইচ্ছে কিনবো, বেড়াবো ইত্যাদি। তাই ছোটদের মাঝে আমরা যারা শিক্ষক অভিভাবক অভিভাবিকা শিশুকে উত্তম প্রদান করে গড়ে তুলতে চাই, আমাদের ভুললে চলবে না যে—শিশুদের মাঝে আর আমাদের মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান থাকতে পারে না, কি আচরণে, কি চলনে. কি বলনে।

আমরা যদি ঘরে ভিখারী আসলে তাদের 'কিছু নেই' 'মাপ করো' বলে তাড়াই, শিশুরা যদি দেখে সবই আছে অথচ 'নেই' বলে তাড়ানো হলো, তবে এখানেই শিশু শিখলো 'মিথ্যে' বলতে। আমরা বড়রা যদি এই ভাবে চলি—শিশুদের দোষ দেবো কোন মুখে? আমরা চলবো অন্যায় পথে—আর শিশুদের শেখাবো ভাল পথে চলতে? তা' তারা চলবে কেন? কারণ প্রথমেই বলেছি ছোটরা সব সময়ই দেখে শেখে। তাই আজ আমাদের কর্তব্য নিজেদের নিজেদের কাছে করজোড়ে বিনতি জানানো যে—তোমরা অর্থাৎ বড়রা আগে সামলে ওঠো, সুপথ ধরে চলো। ভুল পথে আর চলো না! আর উপদেশবাণী যথা যেন ছোটদের ঘাড়ে না চড়াই। ঠিক পথে যদি আমরা চলি, দেখাদেখি ছোটরাও ঠিক পথে চলবে। এর মাঝে আর কিন্তু আসবার কথাই ওঠে না। তা হলে ছোটদের আমরা প্রকৃত শিক্ষা দিতে সক্ষম হব। আর তার জন্যে আমাদের শান্তি আসবে ঘরে বাইরে।

তাই বলি আপনার সাত বছরের শিশুপুত্র—যে একাজ করেছে, তার মূলেও এই দেখে শেখার ব্যাপার আছে। সে আপনার কাছ থেকেই হোক, আর অন্য যে কোনও বড়দের কাছ থেকে হোক, এ কাজটি করতে দেখেছে নিশ্চয়ই। সচেৎ ভাল জিনিস যে আমার না হলেও আর চাইলে না পাওয়া গেলেও সেটা চুরি করে নিজের করে নেয়া যায়—এ বিদ্যা কোথা থেকে শিশু পাবে? আর আপনাকেও বলি বৃথা আত্মসম্মানের জন্যে পুত্রের এই জঘন্য চুরি বিদ্যাটি চেপে যাওয়া, বেশি কিছু খরচের আর বাড়ী ফেরার হাত হবে যুক্তি কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ক্ষুদ্র বট বীজইত অত বড় মহীরুহ রূপে পরিণত হয়। তাই বলি :—

বাস্তব পথে সত্য একথা, বিশ্ব ইহাতে মিথ্যা নাই
নিজেদের দোষ দেখো আগে বুঝে, ত্যাগ
করো যাহা হয় তাই
জ্ঞানপাপী যারা সত্য এ জানি—
ছাড়ো মুটা ওই উপদেশ বাণী :
নিজে পালি যেন সুনীতি ধর্ম ছোটদের শেখাতে চাই।

আজ এই ভবে আমাদের মূল যত্ন শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে। বিস্তারিত আলোচনার সময় ও স্থান দু'য়েরই বড় অভাব। এ বিষয়ে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা পরে করবার চেষ্টা করবো।

———

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বুনিয়াদী শিক্ষা

শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৫৮। ২০ পৃঃ।

'বুনিয়াদী বিদ্যালয়' কথাটা আমাদের এখন আর নিতান্ত অপরিচিত নয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে কি বোঝায় সে বিষয়ে খুব কম লোকেরই ধারণা পরিষ্কার আছে। ত্রিপুরাতে মাত্র ১৯৫৪ সালে বুনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই পুস্তিকাটিতে ক্ষুদ্র পরিসরে ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা হইয়াছে। সুখের বিষয়, লেখক এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন। ভাল টাইপ ভাল ছাপা, পড়িতে কষ্ট হয় না, সহজ-ভাবে মোটামুটি কথা সবই বলা হইয়াছে। শেষের একটি কথা এত দরকারি যে তাহা মূল হইতে উদ্ধৃত করি :—

"বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতীদের কাছে একটি বড় সত্য হচ্ছে এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতি-সমূহকে একটি সন্ধানী এবং পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব একটি শাশ্বত অপরিবর্তনীয় মত নয়। এর মধ্যে কোন রক্ষণশীলতা নেই। একটি গতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থার যা বৈশিষ্ট্য বুনিয়াদী শিক্ষারও তাই। জীবন ও শিক্ষার মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন গতিশীল। যুগে যুগে তার নূতন জয়যাত্রা নূতনরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে। কাজেই শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্যও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। এই সত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে কাজ না করলে বুনিয়াদী শিক্ষার সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

পুস্তিকার মূল্য কোথাও লিখিত নাই ; অনুমান করি, প্রচারার্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আমরা এই পুস্তিকার সুপ্রচার কামনা করি।

Factual English

I. G. Brutton প্রণীত। Orient Longmans Private Ltd. ১৭ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১৩—প্রকাশক। মূল্য ১৷৷০। সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

পুস্তকখানি এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত। যাহাদের ইংরাজি শিক্ষা কিছু অগ্রসর হইয়াছে, অথচ ইংরাজি সাহিত্যের দিকে যাহাদের বিশেষ ঝোঁক নাই, তাহাদের জন্য কিছু কিছু বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ আছে। এইরূপ আলোচনা পাঠের সংখ্যা সতেরো। আজকালকার দিনে এমন বহু বয়স্ক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিশেষ অভাব থাকিলেও কৌতূহলের অন্ত নাই। এরূপ পাঠক পুস্তকখানিতে অনেক কিছু জানিবার বিষয় পাইবেন। অবশ্য তাঁহাদের জন্য ইহা লেখা নয়। ছাত্রদের জন্যই ইহার রচনা এবং প্রত্যেক পাঠের সঙ্গে উপযুক্ত অনুশীলনীও দেওয়া আছে। বিদ্যালয়ে ইহার প্রচলন দেখিলে সুখী হইব।

Drills and Exercises in English

C. S. Bhandari, V. A. Hinkley, S. K. Ram প্রণীত। প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণ ও প্রয়োগবিজ্ঞান ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য এই দুইভাগ পুস্তক রচিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের মূল্য ১৲ একটাকা, দ্বিতীয়ভাগের মূল্য ১৷৷০—পাঠ্যপুস্তক নিরপেক্ষ হইয়া মুখে মুখে বা লিখিয়া ইংরাজি রচনা বা বাক্যগঠন শিখাইবার এই প্রয়াস। প্রত্যেক ভাগেই শিক্ষকের প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ বা সঙ্কেত দেওয়া আছে। শিক্ষকগণ উদ্যোগী হইয়া চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়েদের ইংরাজীর জ্ঞান অগ্রসর হইবে, আশা করা যায়।

কিন্তু এই সমস্ত drill বা ব্যায়াম কসরতের মতই নয় কি? যদি ইহাদের পিছনে শিক্ষকের জাগ্রত দৃষ্টি না থাকে বা ছাত্রদের প্রাণে সাড়া জাগাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে সমস্তই বৃথা। আজ তো শিক্ষকজগতে সেই প্রাণের সাড়া যাহাতে পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং এরূপ চেষ্টা খানিকটা বিপরীতমুখী নয় কি?

শিক্ষা

১৭শ বর্ষ
২য় সংখ্যা।

শিক্ষা

১৩৬৪
পৌষ

১৭শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা।

শিক্ষা

১৩৬৫
মাঘ

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

CENTRAL
RSITY

১৭শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা।

শিক্ষা

১৩৬৫
ফাল্গুন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১৭শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

শিক্ষা

১৩৬৫
চৈত্র

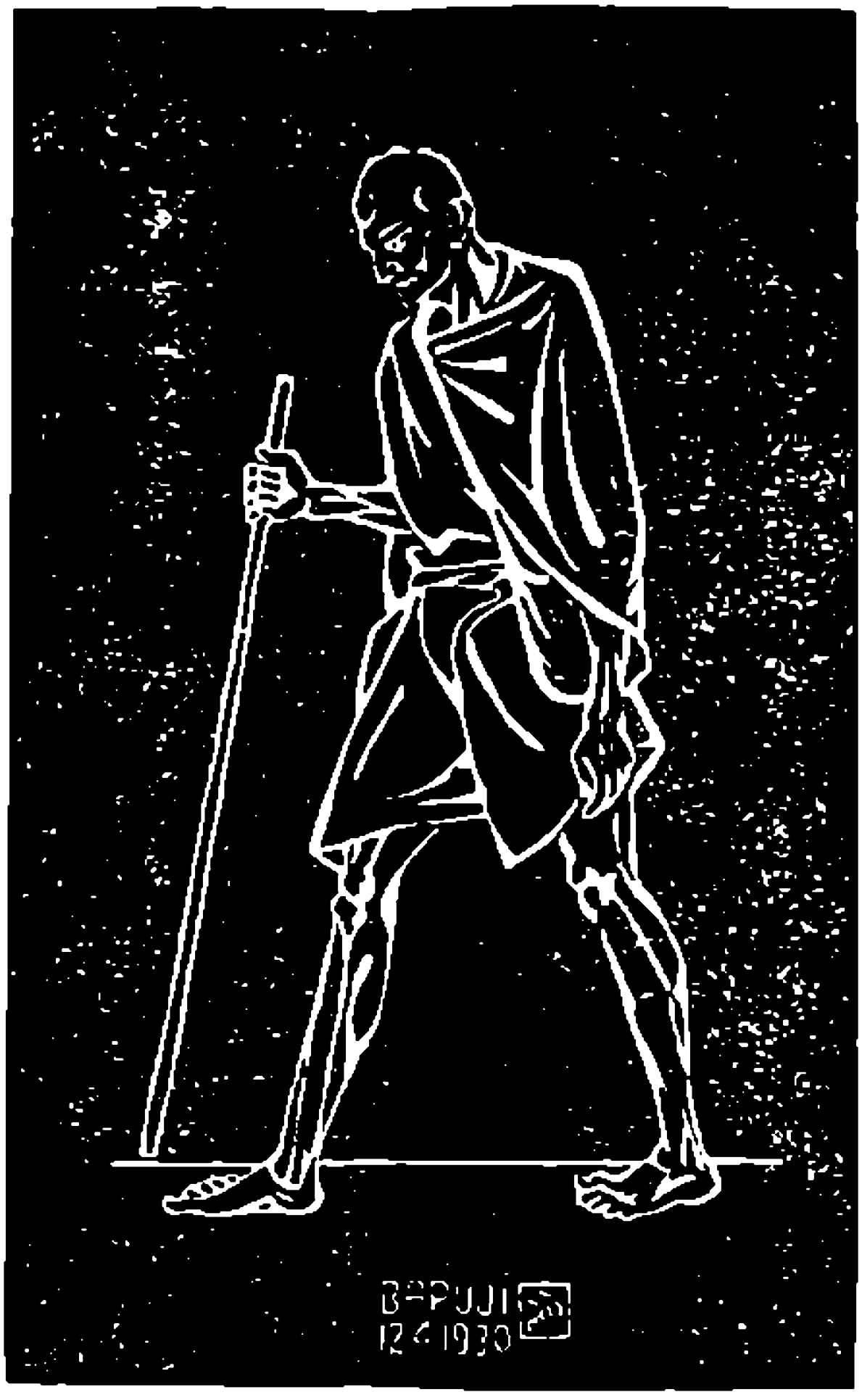

১৭শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শিক্ষা

১৩৬৬
বৈশাখ

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY.

BAPUJI
2419

১৭শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা।

শিক্ষা

১৩৬৬
জ্যৈষ্ঠ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

১৭শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা।

শিক্ষা

১৩৬৬
আষাঢ়

১৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

শিক্ষা

১৩৬৬
শ্রাবণ

১৭শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

শিক্ষা

১৩৬৬
ভাদ্র

১৭শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

শিক্ষা

১৩৬৬
আশ্বিন

১৭শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

শিক্ষা

১৩৬৬
কার্ত্তিক

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY